হুমায়ূন আহমেদ
মধ্যাহ্ন ২

মধ্যাহ্ন রচনায় যারা নানান তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ইন্টারনেট নামক আধুনিক প্রযুক্তিকে। অনেক তথ্য সেখান থেকে পেয়েছি। তবে আমি ঐতিহাসিক না, একজন গল্পকার। আমার প্রথম ঝোঁক গল্প বলার দিকে। দ্বিতীয় ঝোঁকও গল্পে। ইতিহাস যেটুকু না আনলেই নয় ততটুকু এনেছি।

উপন্যাসের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখার অতি বিরক্তিকর কাজটি শাওন করেছে। তাকে ধন্যবাদ। পুত্র নিষাদ কয়েকবারই পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে আমাকে রাগানোর চেষ্টা করেছে। রাগ করতে পারি নি। তাকেও ধন্যবাদ লেখার সময় আশেপাশে থাকার জন্যে।

ধন্যবাদ পাঠকদের, যারা আগ্রহ নিয়ে মধ্যাহ্নের প্রথম খণ্ড পড়েছেন। তাদের আগ্রহের কারণেই দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে শুরু করেছিলাম।

হুমায়ূন আহমেদ
দখিন হাওয়া, ধানমণ্ডি

বোবায় ধরা নামের একটি জটিল ব্যাধি আমার আছে। ঘুমের মধ্যে হঠাৎ মনে হয় বিকট দর্শন জন্তুর মতো কয়েকটি অতিপ্রাকৃত প্রাণী আমার বুকে বসেছে। গলা চেপে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। আতংকে অস্থির হয়ে আমি চিৎকার করতে থাকি। তখন একটা কোমল স্পর্শ আমার কপালে পৌঁছে। গভীর মমতায় একজন বলে, 'এই তো আমি আছি।' আমার ঘুম ভাঙে, আমি স্বাভাবিক হই।

মমতাময়ী শাওনকে।

প্রকাশকের কথা

'দিন যায়, ক্ষণ যায়,/সময় কাহারো নয়,/বেগে ধায়, নাহি রহে স্থির'— সময় সম্পর্কে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবেই বলেছেন কবিতায়। পাশাপাশি এটাও সত্যি যে, সময়ের একটি চিহ্ন রয়েছে; রূপ রয়েছে। এক-একটি যুগে, শতাব্দীতে সময়ের নানা চেহারা আমরা দেখতে পাই। যে শতাব্দীটি আমরা পেছনে ফেলে এসেছি, সেই সময়ের সঙ্গে এই সময়ের কি ফারাক নেই? অবশ্যই রয়েছে। মানুষের যাপিত জীবন, চারপাশের প্রকৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভিন্নতার মধ্যেই সময়ের ফারাকটি টের পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে ছিল ইংরেজ শাসিত অখণ্ড ভারতবর্ষ, হিন্দু-মুসলমানের তীব্র দ্বন্দ্ব, কংগ্রেস-মুসলিম লীগের লড়াই। আবার এরই মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, দেশভাগ— কত কিছুই না সংঘটিত হয়েছে! সেই সময়কে উপজীব্য করে এই সময়ে এই উপন্যাসটি লিখেছেন নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। তবে একটি কথা, বিশাল ক্যানভাসের এই উপন্যাসে সময়ের ছাপ পাওয়া গেলেও, ইতিহাসের রেখাপাত ঘটলেও, ঔপন্যাসিকের মূল উদ্দেশ্য ছিল— গল্প বলা; সেই সময়ের মানুষের কথা বলা।

'মধ্যাহ্ন'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর অসংখ্য পাঠকের কাছ থেকে আমরা চিঠি ও ইমেইল পেয়েছি। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ও টেলিফোনে তাদের অনুভূতির কথা জানিয়েছেন। উপন্যাসটির দ্বিতীয় খণ্ড কবে প্রকাশিত হবে সে-বিষয়ে সবার গভীর আগ্রহ লক্ষ করেছি। 'মধ্যাহ্ন'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের মাধ্যমে পাঠকদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

মাজহারুল ইসলাম

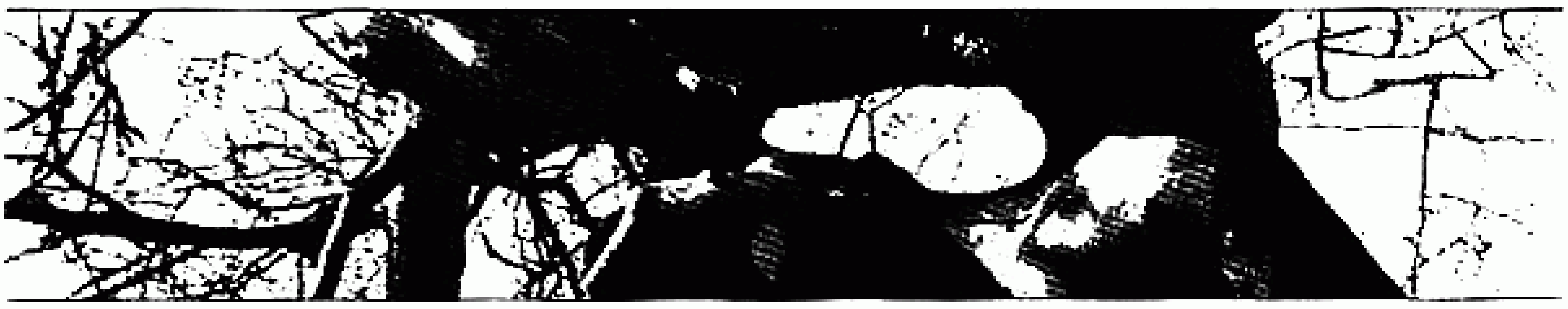

কলিকাতা সমাচার পত্রিকায় মৎস্যকন্যা বিষয়ে একটা খবর ছাপা হয়েছে। প্রথম পাতায় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা সংবাদ। পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি অরুণাভ বিশ্বাস জানাচ্ছেন—

জীবিত মৎস্যকন্যা ধৃত

(অরুণাভ বিশ্বাস প্রেরিত)

> কালীগঞ্জে গঙ্গার মোহনায় একটি মৎস্যকন্যা জীবিত অবস্থায় ধীবরদের জালে ধৃত হয়। মৎস্যকন্যাকে এক নজর দেখিবার জন্যে শত শত লোক কালীগঞ্জে জমায়েত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর জবানিতে জানা যায়, মৎস্যকন্যার চুল সোনালি, চক্ষের রঙও সোনালি। গাত্রবর্ণ নীলাভ। ধৃত হইবার পর হইতেই সে ক্রমাগত তাহার বাম হস্ত নাড়িতেছিল এবং দুর্বোধ্য ভাষায় বিলাপের মতো ধ্বনি করিতেছিল। তাহার চোখ হইতে ঈষৎ বাদামি বর্ণের অশ্রু নির্গত হইতেছিল। ধৃত হইবার দুই ঘণ্টার মধ্যে অঞ্চলের কিছু বিশিষ্টজনের প্ররোচনায় তাহাকে হত্যা করা হয়। অসমর্থিত এক সংবাদে জানা যায় যে, মৎস্যকন্যার মাংস আহার করিলে চিরযৌবন লাভ হয় এই বিশ্বাসে মৎস্যকন্যাকে কাটিয়া তাহার মাংস অতি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। এই বিষয়ে পুলিশি মামলা হইয়াছে। পুলিশের উচ্চপর্যায়ে বিষয়টি নিয়া পর্যালোচনা করা হইয়াছে এবং তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহারা এই বর্বর কর্ম করিয়াছেন, তাহারা বর্তমানে পলাতক।

কলিকাতা সমাচার বান্ধবপুরে আসে না। সুলতান মিয়া নামে একলোক পত্রিকা নিয়ে উপস্থিত হলো। শুধু পত্রিকা না, সে মৎস্যকন্যার দুই পিস মাংসও

না-কি এনেছে, এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ল। সুলতান মিয়া নতুন লঞ্চ কোম্পানি লক্ষ্মী নেভিগেশনে বাবুর্চির কাজ করে। সোহাগগঞ্জ বাজারের হোটেলে মাঝেমধ্যে রাত কাটায়। তার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। ধূর্ত চোখ। হাত-পা সরু। হাঁটে কুঁজো হয়ে। তার থুতনিতে এক গোছা দাড়ির কারণে তাকে দেখায় আলাদিনের চল্লিশ চোরের এক চোরের মতো। লঞ্চ-স্টিমারের বাবুর্চিরা বিনয়ী হয়, সে উদ্ধত প্রকৃতির।

সুলতান মিয়া মৎস্যকন্যার মাংস নিয়ে এসেছে শুনে শশাংক পাল তাকে ডেকে পাঠালেন। একজীবনে তিনি নানান ধরনের মাংস খেয়েছেন। মৎস্যকন্যার মাংস খাওয়া হয় নি।

শশাংক পালের এখন শেষ সময়। সারা শরীর ফুলে উঠেছে। শরীরে সার্বক্ষণিক ব্যথা। সেই ব্যথা ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করে। কালো পিঁপড়ায় কামড়ালে ব্যথা খানিকটা কমে। শশাংক পালের নিজের লোক সুলেমানের প্রধান কাজ হচ্ছে, কালো পিঁপড়া ধরে এনে শশাংক পালের গায়ে ছেড়ে দেয়া। পিঁপড়া ছাড়ার পর পর শশাংক পাল কাতর গলায় বলেন, কামড় দে বাবারা। কামড় দে। তোদের পায়ে ধরি। জমিদার শশাংক পাল তোদের পায়ে ধরছে। ঘটনা সহজ না। ঠিকমতো কামড় দে, পিরিচে মধু ঢেলে তোদের খেতে দিব। আরাম করে মধু খাবি।

পিঁপড়াদের খাবারের জন্যে পিরিচে সত্যি সত্যি মধু ঢেলে রাখা হয়। বিচিত্র কারণে পিঁপড়ারা মধু খাওয়ার কোনো আগ্রহ দেখায় না। শশাংক পাল নিজের গায়ে মধু মেখে দেখেছেন। পিঁপড়ারা তাঁর সারা শরীরে হাঁটে, মধু মাখা অংশের ধারেকাছে যায় না।

কালো পিঁপড়া কামড়ালে ব্যথা কমে, এই তথ্য তিনি আবিষ্কার করেছেন গাছ-চিকিৎসা করতে গিয়ে। গাছ-চিকিৎসায় পুরুষ্টু কোনো একটা গাছকে জড়িয়ে ধরে থাকতে হয় এবং মনে মনে বলতে হয়— 'হে বৃক্ষ! তুমি আমার রোগ তোমার শরীরে ধারণ করে আমাকে রোগমুক্ত কর।' রোগমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত গাছ জড়িয়ে থাকার নিয়ম। প্রবল বৃষ্টি এবং গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ার কারণে আট ঘণ্টার মধ্যেই শশাংক পাল বিশেষ এই চিকিৎসার ইতি ঘোষণা করেন। লাভের মধ্যে কালো পিঁপড়ায় কামড়ালে ব্যথা কমে এই তথ্য আবিষ্কার করেন।

সুলতান মিয়া খবর পেয়ে শশাংক পালের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সে সরাসরি তাকাতে পারছে না, কারণ শশাংক পাল সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় পাটিতে শুয়ে আছেন। শীতলপাটির উপর কলাপাতা বিছানো। একজন নিমগাছের ডাল

দিয়ে তাকে বাতাস দিচ্ছে। নিমপাতার হাওয়া শরীরের জন্যে উপকারী। শশাংক পাল কিছুক্ষণ আগে বমি করেছেন। মুখ ধোয়া হয় নি। বেশ কিছু পুরুষ্টু নীল রঙের মাছি মুখের চারপাশে উড়াউড়ি করছে। নিমপাতার হাওয়ার কারণে মুখে বসতে পারছে না। তারা হতোদ্যম হয়ে চলেও যাচ্ছে না। রবার্ট ব্রুসের ধৈর্য নিয়ে চেষ্টা করেই যাচ্ছে।

শশাংক পাল বললেন, শরীরে কাপড় রাখতে পারি না। শরীর জ্বালা করে। এই জন্যে ন্যাংটা হয়ে আছি। বুঝেছ?

সুলতান মিয়া হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

শশাংক পাল বললেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বিদেশী মানুষ। তুমি কি আমাকে চেনো?

সুলতান মিয়া আবারো হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আমার সম্বন্ধে কী জানো অল্পকথায় বলো। সারমর্ম বলবা, ইতিহাস শুরু করবা না। ইতিহাস শোনার সময় আমার নাই। জীবনের শেষপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছি। এখন ঝটপট বলো, আমি কে?

আপনি জমিদার শশাংক পাল।

একসময় জমিদার ছিলাম। আমার রক্ষিতা ছিল চারজন। এখন আমি ফালতু। শশাংক পাল, বালস্য বাল। হা হা হা।

শশাংক পাল হেঁচকি না ওঠা পর্যন্ত হাসলেন। অতি কষ্টে বললেন, লোকমুখে শুনেছি তুমি না-কি মৎস্যকন্যার মাংস নিয়ে এসেছ?

সুলতান মিয়া হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। শশাংক পাল বললেন, মাথা নাড়ানাড়ি বন্ধ। হ্যাঁ বলবা কিংবা না বলবা। মৎস্যকন্যার মাংস এনেছ?

হ্যাঁ।

কতখানি এনেছ?

দুই পিস। এক পিস বিক্রি করে দিয়েছি। আরেক পিস আছে।

মৎস্যকন্যার মাংস খেলে চিরযৌবন লাভ হয়, এটা কি সত্য?

জানি না। লোকে বলে।

তুমি নিজে খেয়েছ?

না।

এক পিস মাংস যে বিক্রি করেছ, কার কাছে বিক্রি করেছ? তার নাম ঠিকানা বলো।

গোয়ালন্দে এক লোকের কাছে বিক্রি করেছি। কাপড়ের ব্যবসা করে। নাম জানি না।

কত টাকায় বিক্রি করেছ?

কত টাকায় বিক্রি করেছি সেটা আপনারে বলব না।

কেন বলবা না?

সুলতান মিয়া চুপ করে রইল। শশাংক পাল বললেন, আমার আগের দিন থাকলে বেয়াদবির জন্যে তোমাকে ন্যাংটা করে মাটিতে পুঁতে ফেলতাম। যাই হোক, এখন বলো মাংস কোথায় পেয়েছ?

কালিগঞ্জ থেকে এনেছি। যেখানে মৎস্যকন্যা ধরা পড়েছে সেখান থেকে এনেছি।

তার অর্থ কি এই যে, তুমি নিজ চোখে মৎস্যকন্যা দেখেছ?

হুঁ।

শশাংক পাল ধমক দিয়ে বললেন, হুঁ আবার কী? আদবের সঙ্গে বলো—দেখেছ কি দেখ নাই।

দেখেছি।

আমরা ছবিতে যেরকম দেখি সেরকম?

সুলতান মিয়া অস্পষ্ট গলায় বলল, সেরকমই, তবে মুখ ছোট।

গাত্রবর্ণ কী?

নীল।

তার বুকের সাইজ কী? বাঙালি মেয়েদের মতো, না-কি বুকও মুখের মতো ছোট?

খিয়াল নাই।

খিয়াল নাই মানে? বুক দেখো নাই? লজ্জা পেয়েছিলা? মৎস্যকন্যা উদাম গায়ে পানিতে ঘুরে। সে তো শাড়ি দিয়া শরীর ঢাকে না। তারে নগ্ন দেখাই স্বাভাবিক।

সুলতান মিয়া বলল, আমি যখন দেখেছি তখন উড়না দিয়া তার বুক ঢাকা ছিল।

উড়না দিয়া বুক ঢাকার প্রয়োজন পড়ল কেন?

সুলতান মিয়া বলল, অনেক ছোট ছোট পুলাপান ছিল, এইজন্যে ঢাকা হয়েছিল। মাতব্বররা ঢাকতে বললেন।

শশাংক পাল বললেন, তুমি বিরাট মিথ্যুক, এইটা তুমি জানো ? তুমি কিছুই দেখ নাই। সব বানায়ে বলতেছ। তুমি আছ টাকা কামানোর ধান্দায়। দুই পিস মাংস কোনখান থেকে যোগাড় করে সেটা বিক্রির ধান্দায় আছ। যে মাংস তুমি এনেছ আমার মন বলতেছে সেটা কুকুরের মাংস। তুমি এক ধান্দাবাজ, আমি তোমার চেয়ে বড় ধান্দাবাজ।

সুলতান মিয়া বলল, আপনার সঙ্গে কথা পাল্টাপাল্টি করব না। অনুমতি দেন আমি যাই।

শশাংক পাল বললেন, অনুমতি দিলাম না। তুমি যে ধান্দাবাজ এটা স্বীকার করে তারপর বিদায় হও।

সুলতান মিয়া স্বাভাবিক গলায় হাই তুলতে তুলতে বলল, আচ্ছা স্বীকার করলাম। এখন বিদায় দেন। আপনার সঙ্গে আমি বাহাস করব না। আপনি যেটা বলেন সেটাই সত্য।

আমার সঙ্গে বাহাস করবা না কেন ?

আমি কারোর সাথেই বাহাস করি না। আমার কাছে এক টুকরা মাংস আছে। দশ হাজার টাকা দাম। আপনে ইচ্ছা করলে খরিদ করতে পারেন।

শশাংক পাল বিস্মিত গলায় বললেন, দশ হাজার টাকা দাম ? তুই কস কী ? দশ হাজার টাকায় একজোড়া জীবন্ত মৎস্যকন্যা পাওয়া যায়। তাদের সঙ্গে যৌনকর্ম করা যায়।

সুলতান নির্বিকার গলায় বলল, পাওয়া গেলে খরিদ করেন। যৌনকর্ম করতে চাইলে করেন। আপনার বড় পুসকুনি আছে। পুসকুনিতে ছাড়েন। আমারে তুই তুকারি করবেন না, আমি আপনার কর্মচারী না।

শশাংক পাল নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলেন। এই বদের বাচ্চার সঙ্গে কথা চালাচালির অর্থ হয় না। মূল প্রসঙ্গে যাওয়াই ভালো। তিনি হাই তুলতে তুলতে বললেন, মাংস খাইতে হয় কীভাবে ? রান্না কইরা খাইতে হয়, না-কি কাঁচা খাইতে হয় ?

জানি না।

এক হাজার টাকা নগদ দিতে পারি। যদি পোষায় দিয়া যা। টাকা নিয়া যা।

সুলতান স্পষ্ট গলায় বলল, না। বলেই বের হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্যেও দাঁড়াল না।

শশাংক পাল ধাঁধায় পড়ে গেলেন। সত্যি কি এর কাছে আসল বস্তু আছে ? চিরযৌবন সহজ ব্যাপার না। এর জন্যে রাজত্ব দিয়ে দেয়া যায়। রাজত্বের কাছে

দশ হাজার টাকা কোনো টাকাই না। তাছাড়া টাকা দিয়ে তিনি করবেনইবা কী ? মৃত্যু মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি মাথা ঘুরাতে পারেন না বলে দেখতে পারেন না। এক পিস মৎস্যকন্যার মাংস খেলে চিরযৌবন না পাওয়া গেলেও রোগটা তো সারতে পারে।

বিষয়টা নিয়ে তিনি কি কারো সঙ্গে আলাপ করবেন ? আলাপ-আলোচনা করার লোকও নাই। সব ধান্দাবাজ। সবাই আছে নিজের ধান্দায়। কাউকে বিশ্বাসও করা যায় না। মাওলানা ইদরিসকে খবর দিয়ে আনা যায়। সেও গাধা। গাধা মাওলানা। হাদিস-কোরানের বাইরে কিছুই জানে না। শশাংক পাল বিরক্ত গলায় ডাকলেন, সুলেমান! সুলেমান!

সুলেমান ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করে। দূর-দূরান্তে চলে যায়। সে এইসব বিষয় জানতে পারে। সুলেমানকে পাওয়া গেল না। জানা গেল কিছুক্ষণ আগে সে ঘোড়া নিয়ে বের হয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তির প্রধান সমস্যা হচ্ছে, দিনের মধ্যে কিছুক্ষণ ভিক্ষা না করলে পেটের ভাত হজম হয় না।

শশাংক পালের মুখে মাছি বসেছে। নিমপাতা দিয়ে হাওয়া করে মাছি তাড়াবার কেউ নেই। তিনি নিজে হাত দিয়ে তাড়াতে পারেন। তাতে লাভ কী ? আবার এসে বসবে।

পুকুরঘাটে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে। শুকনা পাতার ওপর হাঁটার শব্দ কানে আসছে। শরীর পুরোপুরি নষ্ট হওয়ায় একটা লাভ হয়েছে, কান পরিষ্কার হয়েছে। অনেক দূরের শব্দও শুনতে পান।

শশাংক পাল বললেন, হাঁটে কে ? কাছে আস।

কেউ একজন এসে মাথার পেছনে দাঁড়াল। এমনভাবে সে দাঁড়িয়েছে যে তাকে দেখা যাচ্ছে না।

শশাংক পাল বললেন, গাধার মতো মাথার পিছনে দাঁড়ায়েছ কেন ? সামনে আস তোমারে দেখি।

সারা গায়ে চাদর জড়ানো একজন শশাংক পালের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

তুমি কে ?

আমার নাম লাবুস।

সুলেমানের পুলা না ?

জি।

শরীরে চাদর কেন ? দরবেশ হয়েছ ? এইখানে কী চাও ?

বাপজানের খোঁজে আসছি।

সে গেছে ভিক্ষায়। তুমি একটা কাজ কর, আরেকটা ঘোড়া জোগাড় কর। বাপ-বেটায় একসঙ্গে ঘোড়ায় চইড়া ভিক্ষা করবা। মনোহর দৃশ্য। হা হা হা।

লাবুস তাকিয়ে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না একটি নগ্ন মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকতে সে কোনোরকম লজ্জা পাচ্ছে। শশাংক পাল বললেন, নিমের ডাল হাতে নাও। আমারে বাতাস কর। ঘণ্টা হিসাবে পয়সা পাইবা। ঘণ্টায় দুই পয়সা। রাজি আছ ?

লাবুস জবাব না দিয়ে নিমের ডাল দিয়ে বাতাস শুরু করল। ঘণ্টায় দুই পয়সা তার জন্যে যথেষ্ট। আজ সকাল থেকে সে কিছু খায় নি। সে বাবার কাছে এসেছিল দুপুরের খাবারের কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি-না সেই খোঁজে।

নিমের ডালের হাওয়ায় আরাম লাগছে। মাছিগুলি যে তাড়া খাচ্ছে এই দৃশ্য দেখেও ভালো লাগছে। শশাংক পাল বললেন, মৎস্যকন্যার মাংস নিয়ে একজন যে বান্ধবপুর বাজারে এসেছে এই খবর জানো ?

লাবুস বলল, না।

হারামজাদা এক পিস মাংসের দাম চায় দশ হাজার টাকা। থাপড়ায়ে এর দাঁত ফেলা দরকার। তাকে থাপড়াতে পারবা ?

লাবুস জবাব দিল না। একমনে বাতাস করতে লাগল। শশাংক পাল বললেন, বাজারে তারে খুঁইজ্যা বাহির কর। তারপর তার দুই গালে দুই চড় দেও। প্রতি চড় এক টেকা হিসেবে দুই টেকা পাইবা। রাজি ?

লাবুস জবাব দিল না।

শশাংক পাল বললেন, কত বড় ধান্দাবাজ, কুকুরের মাংস নিয়ে এসে বলে মৎস্যকন্যার মাংস! আমার কাছে বেচতে চায়। ভাবছে কী ? এই মাংস খাওয়ার চেয়ে গু খাওয়া ভালো। ঠিক না ?

লাবুস বলল, ঠিক।

শশাংক পাল পরদিন দুপুর দু'টার সময় মৎস্যকন্যার মাংস খেলেন। কাঁচাই খেলেন। রান্না করলে যদি গুনাগুণ নষ্ট হয়ে যায় ! মাংস খাবার সময় সুলতান সামনে বসে রইল। লবণভর্তি মাংস— খাওয়ার সময় শরীর উল্টে যাবার মতো হলো। শশাংক পাল হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, নুনা ইলিশের মতো স্বাদ। এর কারণ কী ?

সুলতান বলল, মাংস যাতে নষ্ট হয়ে না যায় এর জন্যে নুন দিয়ে জারানো। চাবায়ে খাওয়ার দরকার কী! ওষুধের ট্যাবলেটের মতো গিলে ফেলেন। এটা তো ওষুধই।

অনেক কষ্টে শশাংক পাল মাংস গিললেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীরে জ্বলুনি শুরু হলো। যেন কেউ নাগা মরিচ বেটে শরীরে মাখিয়ে দিয়েছে। এমন ভয়ঙ্কর জ্বলুনি যে শশাংক পালের ইচ্ছা করছে নিজেই টান দিয়ে তার গায়ের চামড়া খুলে ফেলেন। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমাকে ধরাধরি করে পুসকুনির পানিতে ডুবায়ে রাখ। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে গো। সর্বাঙ্গ কেউ যেন আগুন দিয়ে পুড়াচ্ছে। হায় ভগবান, এ-কী শাস্তি!

তাঁকে পুকুরের পানিতে ডুবানো হলো। দুইজন দুই দিক থেকে হাত ধরে আছে। তিনি মাথা ভাসিয়ে আছেন। মাঝে মাঝে মুখে পানির ছিটা দেয়া হচ্ছে। বান্ধবপুরের মানুষ পুকুরের চারদিকে জড়ো হলো। তাদের কৌতূহলের সীমা নাই। শশাংক পাল বললেন, দেখ মিনি মাগনার মজা। মৎস্যকন্যার মাংস খেয়ে আমি হয়েছি মৎস্যপুরুষ। পানিতে বাস করা শুরু করেছি। এমন মজা দেখবা না। কোনো সার্কাস পার্টিতেও এই মজা নাই।

সন্ধ্যাবেলা তিনি মাওলানা ইদরিসকে খবর দিলেন। ক্ষীণ গলায় বললেন, সবাই মজা দেখতে এসেছে, আপনি নাই, এটা কেমন কথা? মজা ভালো লাগে না?

মাওলানা বললেন, আপনি বিরাট যন্ত্রণার মধ্যে আছেন। মানুষের যন্ত্রণা দেখতে ইচ্ছা করে না।

এটা কী বললেন মাওলানা? যন্ত্রণা দেখার মধ্যেই আনন্দ। অন্যের যন্ত্রণা হচ্ছে, আমার হচ্ছে না— আনন্দ না?

মাওলানা জবাব দিলেন না। শশাংক পাল বললেন, আপনাকে ডেকেছি একটা অতি জরুরি এবং অতি গোপন কথা বলার জন্যে। খোশগল্প করার জন্যে ডাকি নাই।

মাওলানা বললেন, বলেন কথা। আমি আছি।

শশাংক পাল ক্ষীণ গলায় বললেন, কথাটা শুধু আপনারে বলব। দুইজন আমার হাত ধরে আছে। এখন বললে তারাও শুনবে। আমি চাই না তারা শুনুক। এই তোরা দুইজন আমাকে শুকনায় তোল। কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় হ। মাওলানার সঙ্গে কথা শেষ হবার পর আবার পানিতে নামাবি।

শশাংক পাল তার অতি জরুরি গোপন কথা মাওলানাকে বলে শেষ করলেন। তাকে আবারো পানিতে নামানো হলো। মধ্যরাত থেকে তিনি বিকারগ্রস্তের প্রলাপ শুরু করলেন। অতি উচ্চকণ্ঠে বলতে শুরু করলেন—

তোমরা যারা আমার আশেপাশে আছ তারা শোন। মন দিয়ে শোন। স্বর্গ নরক সবই আছে। আমি অবিশ্বাসী নাস্তিক ছিলাম। এখন আস্তিক। আমি ডান চোখে স্বর্গ দেখছি। একই সঙ্গে বাম চোখে নরক দেখছি। স্বর্গ সম্পর্কে এতদিন যা শুনেছি সবই ভুল। স্বর্গ তোমাদের সবার কল্পনার চেয়েও মনোহর। স্বর্গে যারা বাস করেন, তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভাসতে ভাসতে যান। নরকের কথা কিছু বলব না। নরক তোমাদের সবার কল্পনার চেয়েও ভয়ঙ্কর। ভগবান, আমাকে ক্ষমা কর। ভয়ঙ্কর নরকের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।

বিকারগ্রস্তের মতো চিৎকার করতে করতেই শশাংক পালের মৃত্যু হলো।

বড়গাঙের পাশে নিমাই শ্মশান ঘাটে তার চিতার আয়োজন হলো। মুখাগ্নি করার কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। পুরোহিত বললেন, নিকট আত্মীয়ের অভাবে তাকে পিতৃসম জ্ঞান করতেন এমন কেউ মুখাগ্নি করতে পারেন।

মড়া পোড়ানো দেখতে প্রচুর জনসমাগম হয়েছে। পুরোহিতের কথাতে তাদের মধ্য থেকে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না।

পুরোহিত বললেন, স্বধর্মের স্ববর্ণের যে-কেউ হলেই হবে। প্রয়োজনে নিম্নবর্ণের যে-কেউ আসতে পারেন। শাস্ত্রে এই বিধান রাখা হয়েছে।

কেউ এগিয়ে আসছে না। এদিকে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। চৈত্র বৈশাখে ঝড়-বৃষ্টি হয়। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, আজ বড় ধরনের ঝড় আসবে। বাতাস থমথমে।

পুরোহিত বললেন, কেউ কি আসবেন?

ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন বলল, অন্য ধর্মের কেউ কি এই কাজটা করতে পারেন?

আপনি কে?

আমি হাফেজ ইদরিস।

হ্যাঁ পারবেন।

সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় শশাংক পালকে উপুড় করে শোয়ানো হয়েছে। তার মাথা উত্তরমুখী।

মাওলানা ইদরিস আগুন হাতে নিয়ে পুরোহিতের সঙ্গে মন্ত্র পাঠ করছেন—

'ওঁ দেবাশ্চাগ্নিমুখা এনং দহন্তু!'

মন্ত্র পাঠের শেষে চিতা প্রদক্ষিণ শুরু হলো। পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন, মাওলানা ইদরিস বিড়বিড় করে সেই মন্ত্র বলছেন—

'ওঁ কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম।
ধর্ম্মাধর্ম্মসিমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রানি দিব্যান লোকান ম গচ্ছাতি।'

'তিনি জ্ঞানত বা অজ্ঞানতাবশত অনেক দুষ্কৃত কাজ করেছেন। মানুষের মৃত্যু প্রাপ্য, প্রকৃতির এই বিধানে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এই ব্যক্তির ধর্ম অধর্ম লোভ-মোহ সমাবৃত হয়েই মৃত্যু হয়েছে। এখন হে অগ্নিদেব, আপনি তাকে দহন করে দেবলোকে নিয়ে যান।'

মুখে আগুন দেয়ামাত্রই ঝড় শুরু হলো। বাতাস পেয়ে আগুন তেজি হলো। নামল বৃষ্টি, সেই বৃষ্টিতেও আগুন নিভল না। লোকজন সবাই বিদায় নিয়েছে। পুরোহিত এবং মাওলানা ইদরিস বসে আছেন। আধা টিন কেরোসিন বেচে গেছে। এই কেরোসিন পুরোহিতের প্রাপ্য। মাওলানার সামনে এই টিন নিয়ে যেতে তাঁর লজ্জা লাগছে। বিধর্মী মানুষ। নিশ্চয়ই জানে না বেঁচে যাওয়া সবকিছুই পুরোহিতের প্রাপ্য। সে হয়তো ভেবে বসবে লোভী পুরোহিত।

এককালের অতি প্রতাপশালী জমিদার শশাংক পালের মৃত্যু হলো ১২ই চৈত্র ১৩৪৭ সনে।

ইংরেজি ২৩ মার্চ ১৯৪০ সন। বিশেষ একটা দিন। ওই দিন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক 'লাহোর প্রস্তাব' ঘোষণা করেন। লাহোর প্রস্তাবে উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ওঠে। লাহোর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহম্মদ আলী জিন্নাহ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। জার্মান আর্মি গ্রুপ সি বেলজিয়ামের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে নেদারল্যান্ড আক্রমণ করেছে। অতি অল্প সময়ে তারা ফ্রান্সের গভীরে ঢুকে যায়। দুর্ভেদ্য মাজিনো লাইন কোনো কাজেই আসে না।

লন্ডনে চলতে থাকে টানা বিমান আক্রমণ। ব্রিটিশ সিংহ থমকে দাঁড়ায়। কারণ বোমা পড়ছে বাকিংহাম প্রাসাদে। যেখানে বাস করেন রানি এলিজাবেথ। রানিকে প্রাসাদ থেকে গোপন আবাসে সরিয়ে নেয়া হলো। কেউ জানে না কোথায় রানি। হঠাৎ হঠাৎ গোপন আবাস থেকে বের হন। ইংরেজের প্রিয় খেলা শিয়াল শিকারে বের হন। ঘোড়ায় চড়ে শিয়াল তাড়া করেন। আনন্দময় এই খেলাতেও তাঁর মনে বসে না। বড় অস্থির সময় কাটে।

ভারতবাসীরা যুদ্ধে কোন পক্ষ সমর্থন করবে ঠিক বুঝতে পারে না। হিন্দু-মুসলমান দুই পক্ষে ভাগ হয়েছে। এক পক্ষ ব্রিটিশ রাজকে সমর্থন করলে অন্য পক্ষ তা করতে পারে না। কোলকাতার মুসলমানদের কেউ কেউ অদ্ভুত স্লোগানও দিতে শুরু করেছে—

কানমে বিড়ি
মু মে পান
লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

এই লড়াই কার বিরুদ্ধে? ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে, না-কি হিন্দুদের বিরুদ্ধে?

রাতে মাওলানা খেতে বসেছেন। তাঁর স্ত্রী জুলেখা সন্তানসম্ভবা। পিঁড়িতে বসতে কষ্ট হয় বলে স্বামীর খাবার সময় সে পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। খাবার সময় গল্পগুজব মাওলানা পছন্দ করেন না। খাওয়া হচ্ছে ইবাদত। ইবাদতের সময় গল্পগুজব চলে না। তারপরেও মাঝেমধ্যে মনের ভুলে জুলেখা দু'একটা প্রশ্ন করে ফেলে। আজ যেমন করল। কৌতূহলী গলায় বলল, জমিদার শশাংক বাবু আপনাকে যে গোপন কথাটা বলেছে সেটা কী?

ইদরিস বললেন, গোপন কথা তোমাকে কেন বলব?

জুলেখা বলল, আমি আপনার স্ত্রী এইজন্যে বলবেন।

ইদরিস বললেন, তুমি আমার স্বভাব জানো। এই কাজ আমি কখনো করব না।

জুলেখা বলল, গোপন কথা কি জমিজমার বিলি ব্যবস্থা নিয়ে?

মাওলানা বললেন, না। এই বিষয়ে তুমি আমাকে আর কোনো প্রশ্ন করবা না।

অন্য কোনো বিষয়ে কি কিছু বলব?

বলো।

আপনি নামাজ কালাম ছেড়ে দিয়েছেন কেন? লোকমুখে শুনলাম শশাংক পালের মুখাগ্নি করেছেন। আপনি তাঁর কে?

মাওলানা জবাব দিলেন না। তার কপালে কুঞ্চন রেখা দেখা দিল।

জুলেখা নিচু গলায় বলল, আমি আপনার সঙ্গে বাস করতে আসার পরই আপনি নামাজ কালাম ছেড়েছেন। নিজেকে আমার দোষী মনে হয়।

ইদরিস বললেন, কে দোষী কে নির্দোষী সেই বিচার আল্লাহপাক করবেন। এইসব নিয়া চিন্তা করবা না।

লোকে বলে আপনার মাথা না-কি পুরাপুরি খারাপ হয়েছে। এটা কি সত্যি?

ইদরিস বললেন, আমি বাস করি তোমার সাথে। আমার মাথা খারাপ হলে সবের আগে তুমি বুঝবা।

জুলেখা বলল, রাতে আপনি ঘুমান না। উঠানে মোড়ার উপর বসে থাকেন।

চিন্তা করি। এইজন্যে ঘুমাই না। মানুষ ঘুমের মধ্যে চিন্তা করতে পারে না। চিন্তা করতে হয় জাগ্রত অবস্থায়।

কী নিয়া চিন্তা করেন?

সেটা তোমারে বলব না।

কেন বলবেন না? কেউ তো আপনারে বলে নাই— চিন্তার বিষয় নিয়া তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করবা না। কেউ তো আপনারে নিষেধ করে নাই।

ইদরিস চাপা গলায় বললেন, নিষেধ করেছে।

জুলেখা আগ্রহ নিয়ে বলল, কে নিষেধ করেছে?

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মাওলানা খাওয়া শেষ করে হাত ধোয়ার জন্যে বারান্দায় চলে গেলেন। বারান্দায় কলসিভর্তি পানি এবং লোটা রাখা আছে। মাওলানা বারান্দায় এসেই ডান পায়ে মেঝেতে কয়েকবার বাড়ি দিলেন। মাস চারেক হলো বাড়িতে একটা সাপ দেখা যাচ্ছে। বিশাল শঙ্খচূড়। বাস্তুসাপের বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায় না। বাস্তুসাপ গৃহস্থের জন্যে মঙ্গল এবং কল্যাণ নিয়ে আসে। তাছাড়া জুলেখার সন্তান হবে। এই সময়ে কোনো জীবজন্তুকে কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। জুলেখা পিতলের একটা বাটিতে প্রতিদিন সাপের জন্যে দুধ রেখে দিচ্ছে। সাপকে কখনো দুধ খেতে দেখা যায় নি। তবে বাটির দুধ থাকছে না। কেউ একজন খেয়ে নিচ্ছে। সাপের কারণে খরচ বেড়েছে। সারারাত খাটের নিচে হারিকেন জ্বালিয়ে রাখতে হয়। যুদ্ধের কারণে কেরোসিনের দাম প্রতিদিনই বাড়ছে। বাজারে বলাবলি হচ্ছে কয়েকদিন পর এক ফোঁটা কেরোসিনও পাওয়া যাবে না। সব কেরোসিন চলে যাচ্ছে ফৌজিদের কাছে। তারা সারাগায়ে কেরোসিন মেখে বনেজঙ্গলে যুদ্ধ করে। কেরোসিন মাখার কারণে সাপখোপ পোকামাকড় তাদের কাছে আসে না।

মাওলানা উঠানে তার নির্দিষ্ট জায়গায় মোড়ার ওপর পা তুলে বসেছেন। চিন্তা এখনো শুরু করেন নি। জুলেখা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে পান নিয়ে তাঁর কাছে আসবে। তিনি পান চিবাতে চিবাতে চিন্তা শুরু করবেন। তাঁর আজ রাতের চিন্তার বিষয় ঠিক করা আছে। শশাংক পালের যন্ত্রণা দেখে চিন্তাটা মাথায় এসেছে। তিনি অতি সাধারণ একজন মানুষ হয়েও অন্যের যন্ত্রণা সহ্য করতে

পারেন না। পরম করুণাময় আল্লাহপাক কীভাবে তাঁর সৃষ্ট জগতের যন্ত্রণায় নির্বিকার থাকেন! অনন্ত নরকে তাঁর সৃষ্ট প্রাণী মানুষ জ্বলতে পুড়তে থাকবে, আর তিনি থাকবেন নির্বিকার? তাহলে কি তিনি এমন একজন যিনি যন্ত্রণাবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত? তাই যদি হয়, তাহলে তো তিনি আনন্দবোধ থেকেও মুক্ত। সেরকমই কিছু হবে। সূরা এখলাসে তিনি বলেছেন, 'ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফু আন আহাদ।' যার অর্থ আমার সমকক্ষ কেহই না। মাওলানা মনে করেন— এই অনুবাদ ঠিক না। অনুবাদটা হবে— 'আমি অন্য কাহারো মতো নই'।

পান নেন।

ইদরিস পান নিলেন। জুলেখা হাতে করে পিঁড়ি নিয়ে এসেছে। সে মাওলানার পাশে পিঁড়ি রেখে পিঁড়িতে বসতে বসতে বলল, আজ রাতে আমিও আপনার মতো চিন্তা করব।

মাওলানা আগ্রহ নিয়ে বললেন, কী নিয়া চিন্তা করবা?

আমার মেয়েটারে নিয়া চিন্তা করব।

তোমার যে মেয়ে হবে এটা তুমি ক্যামনে জানো? ছেলেও তো হইতে পারে। পেটের সন্তান ছেলে না মেয়ে এই রহস্য আল্লাহপাক ভেদ করেন না। জন্মের পরে তিনি রহস্য ভেদ করেন।

জুলেখা বলল, আমার যে মেয়ে হবে এইটা আমি জানি। তাকায়া দেখেন, আমার চেহারা অনেক সুন্দর হয়েছে। এর অর্থ জানেন?

না।

এর অর্থ আমার মেয়ে হবে। মেয়ের মা সুন্দরী, ছেলের মা বান্দরী।

মাওলানা জবাব দিলেন না। ঝড়বৃষ্টির শেষে চৈত্র মাসের মেঘশূন্য আকাশ। এত বড় চাঁদ উঠেছে। নিশ্চয়ই পূর্ণিমা। গাছপালার ফাঁক দিয়ে জোছনা গলে গলে পড়ছে। কী অপূর্ব দৃশ্য! শশাংক পাল এই দৃশ্য আজ দেখতে পারছেন না। কিংবা কে জানে, এরচে'ও অনেক সুন্দর দৃশ্য তিনি এখন দেখছেন। আল্লাহপাক তাকে ক্ষমা করেছেন। হয়তো তিনি তাকে বলেছেন— পৃথিবীতে শেষ দিনগুলি তোর অনেক কষ্টে গেছে। এখন আয় আরাম কর। তোকে দিলাম চিরযৌবন।

জুলেখা মিষ্টি করে ডাকল, মীরার বাপ!

মাওলানা চমকে উঠে বললেন, কী বললা?

জুলেখা চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলল, আপনারে মীরার বাপ বলে ডাকলাম। আমি আমার মেয়ের নাম রাখব মীরা।

হিন্দু নাম?

নামের কোনো হিন্দু মুসলমান নাই। নাম নামাজ রোজা করে না, পূজা করে না। নাম মানুষের একটা পোশাক। পোশাকের কি কোনো ধর্ম থাকে ?

ইদরিস বিস্মিত হয়ে বললেন, তোমার ভালো বুদ্ধি।

জুলেখা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানি আমার ভালো বুদ্ধি। মানুষ আমার রূপটা শুধু দেখে, বুদ্ধি দেখে না। আপনি দেখেছেন, আমার ভালো লাগল।

ইদরিস বললেন, আরেকটা পান খাব।

জুলেখা বলল, পান দিতেছি। তার আগে একটা কথা বলি, মন দিয়া শুনেন। শশাংক পাল আপনারে একটা গোপন কথা বলেছে, আপনি যেটা আমারে বলেন নাই। আমার একটা গোপন কথা আছে, সেটা আপনারে এখন বলব।

বলো।

আমার মেয়েটার জন্মের পর আমি আপনারে ছেড়ে চলে যাব।

মাওলানা অবাক হয়ে বললেন, কেন ?

জুলেখা স্বাভাবিক গলায় বলল, আমার কারণে আপনি বিরাট বিপদে পড়েছেন। সমাজে পতিত হয়েছেন। নামাজ কালাম ছেড়েছেন। মাথা খারাপের দিকে যাইতেছেন। আমি আপনারে মুক্তি দিব।

মেয়েটাকে কি নিয়ে যাবে ?

না। তাকে আপনার কাছে দিয়া যাব। আপনি মেয়েটারে ভালো মানুষ হওয়া শিখাইবেন। আমি চাই আমার মেয়ে আপনার মতো ভালো মানুষ হোক।

জুলেখার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। গাল ভেজা। ভেজা গালে চাঁদের আলো চকচক করছে। মাওলানা বিস্মিত হয়ে বললেন, কাঁদতেছ কেন ?

জুলেখা সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুছে বলল, আর কাঁদব না। বলেই সে ফিক করে হাসল। মাওলানা মুগ্ধ হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর স্ত্রী যে পৃথিবীর অতি রূপবতীদের একজন এটা তাঁর মনেই থাকে না। হঠাৎ হঠাৎ বুঝতে পারেন। তখন তাঁর বড় বিস্ময় লাগে। পবিত্র কোরান শরিফে বেহেশতের আয়তচক্ষু হুরদের বর্ণনা আছে। তারা কি জুলেখা নামের এই মেয়ের চেয়েও সুন্দর ? আল্লাহপাক যখন বলেছেন তখন অবশ্যই সুন্দর। কিন্তু সেই সৌন্দর্য কী রকম ? কাকে আমরা সৌন্দর্য বলি ? ফুল সুন্দর লাগে কেন ? পাতাকে ফুলের মতো সুন্দর লাগে না, অথচ ফুলকে লাগে। ফুলের গন্ধ আছে এইজন্যে কি ? গন্ধ ছাড়াও তো ফুল আছে। সেই ফুলও তো সুন্দর।

জুলেখা বলল, কী চিন্তা করেন ?

মাওলানা জবাব না দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। সেই চন্দ্রও সুন্দর লাগছে। সুন্দর তাহলে কী ?

জুলেখা বলল, গান শুনবেন ?

মাওলানা বললেন, না। গানবাজনা নিষেধ আছে।

নিষেধ থাকলেও শুনেন। আপনারে গান শুনাইতে ইচ্ছা করতেছে। বেহেশতে হুরদের গান শুনবেন। দুনিয়াতে আমি শুনাব। তখন তুলনা করবেন।

জুলেখা, গান শুনব না।

আপনে চন্দ্র দেখতেছেন। আমি চন্দ্র নিয়া গান করব।

বলেই জুলেখা গান শুরু করল।

ও আমার চন্দ্রসখারে
তোর কারণে হইলাম দিওয়ানা
ও আমার চন্দ্রসখারে
মিছামিছি হইছি দিওয়ানা।

আকাশের চাঁদের দিকে আরো একজন তাকিয়ে আছে। তার নাম লাবুস। সে বসে আছে লঞ্চঘাটায়। মাঝরাতে ভেঁপু বাজিয়ে লক্ষ্মী নেভিগেশন কোম্পানির শেষ লঞ্চ গোয়ালন্দ থেকে আসে। দূরের লঞ্চটাকে মনে হয় ঝাড়বাতি। ঝাড়বাতিটা আস্তে আস্তে লঞ্চের আকৃতি নেয়। দেখতে ভালো লাগে।

আজকের দিনটা লাবুসের ভালো কেটেছে। দুপুরে খাওয়া না হলেও সন্ধ্যায় ভরপেট খেয়েছে। খাওয়ার আয়োজন শশাংক পালের বাড়িতে। শ্মশানযাত্রীদের জন্যে খিচুড়ির আয়োজন ছিল। খিচুড়ি খেতে কেউ আসে নি।

লাবুস কলাপাতা নিয়ে বসেছে। বাবুর্চি কলাপাতায় খিচুড়ি ঢালতে ঢালতে বলল, শ্মশানযাত্রীর খাওয়া খায় মুসলমানে! এর নাম কলিকাল।

লাবুস বলল, অভাবের কোনো হিন্দু মুসলমান নাই।

বাবুর্চি বলল, কথা কইস না। মুখ বন্ধ কইরা খা। যত পারস খা। পাঁচ সের চাউলের খিচুড়ি। সব নষ্ট।

লাবুস মুখ বন্ধ করেই খেয়ে গেল। তিন-চারদিনের খাবার একসঙ্গে খেয়ে ফেলার ব্যবস্থা নেই। ব্যবস্থা থাকলে সে খেত। তাহলে আগামী কয়েকদিন তাকে আর খাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হতো না। মানুষ হবার প্রধান সমস্যা, সে জরুরি

কোনো জিনিসই জমা করে রাখতে পারে না। দিনের খাবার দিনে খেতে হয়। দিনের ঘুম দিনে ঘুমাতে হয়। খাওয়া এবং ঘুম কোনোটিই জমা রাখা যায় না।

লঞ্চ ভোঁ দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁকের ভেতর থেকে তাকে দেখা যাবে। আজ আকাশে থালার মতো চাঁদ। চাঁদের আলো এবং লঞ্চের আলো মিলেমিশে কী সুন্দর দৃশ্যই না হবে! সুন্দর দৃশ্য দেখার আকুলতা লাবুসকে ব্যাকুল করল।

তার মতো আরো একজন ব্যাকুল হলেন। তিনি বহুদূর দেশ আমেরিকায় বাস করেন। তাঁকে বলা হয় 'জঙ্গলের কবি'। নাম রবার্ট ফ্রস্ট। তিনি জঙ্গলের আলোছায়ায় হেঁটে বেড়ান। এবং প্রায়ই বলেন, অদ্ভুত সুন্দর এই পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর প্রেমিকের কলহের মতো কলহ।

I had a lover's quarrel with the world.
And were an epitaph to be my story
I'd have a short one ready for my own.
I would have written of me on my stone;
I had a lover's quarrel with the world.

বান্ধবপুর বাজারে এককড়ি সাহার চালের আড়ত। তিনি সামান্য পুঁজি দিয়ে শুরু করেছিলেন। যুদ্ধের কারণে এখন রমরমা অবস্থা। ধান-চালের দাম প্রতিদিনই বাড়ছে। আরো বাড়বে— এরকম গুজব বাতাসে ভাসছে। সব চাল না-কি মিলিটারিরা কিনে নিবে। পাউরুটি খেয়ে যুদ্ধ করা যায় না। ভাত খেয়েও যুদ্ধ হয় না। ভাতে ঘুম পায়। তারপরেও মিলিটারিদের জন্যে রাতে ভাতের ব্যবস্থা। রাতে ভাত খেয়ে তারা আরামে ঘুমায়। দিনে যুদ্ধ শুরু হয়। দেশের চাল সব সরকার কিনছে। এদিকে আবার বার্মা মুলুক থেকে চাল আসা বন্ধ। জাপানিরা বার্মা দিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকবে। নাক-চ্যাপটা মগগুলিকে শায়েস্তা করবে। এটা একটা আশার কথা।

এককড়ি সারাদিন ক্যাশবাক্স নিয়ে আড়তে বসে থাকেন। তাঁর মন প্রফুল্ল থাকলেও চোখেমুখে গভীর বিষণ্নতা ফুটিয়ে রাখেন। ব্যবসা ভয়ঙ্কর খারাপ যাচ্ছে। যুদ্ধের কারণে তিনি ধনে-প্রাণে মারা পড়বেন— এই ধরনের কথা বলতে পছন্দ করেন। কথা বলার জন্যে সবসময় লোক পাওয়া যায় না। সন্ধ্যার দিকে অনেকেই আসে। যুদ্ধের খবর শুনতে আসে। এককড়ির নামে প্রতিদিন *কলিকাতা সমাচার* পত্রিকা আসে। দিনেরটা দিনে আসে না, দু'দিন পরে আসে। তাতে সমস্যা কী ? খাবার দু'দিনে বাসি হয়, খবর কখনো বাসি হয় না। সবাইকে সেই পত্রিকা পড়ে শোনানো হয়। পড়ানোর দায়িত্ব পালন করেন গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী। তাঁর গলা উঁচু এবং সুরেলা। বিভিন্ন পূজা পার্বণে তিনি সুরেলা গলায় মাথা দুলিয়ে যখন ব্রতকথা পাঠ করেন, তখন ভক্তিমতি হিন্দু নারীদের চোখে আবেগে পানি আসে।

'বিদেশে গেল পতি,
সে হতে সাবিত্রী সতী
দিবা রাতি করিছে রোদন
পতির বিরহে তার
দেহ হলো চর্ম্মসার,
ছয় জায়ে করিছে গঞ্জন।'

কলিকাতা সমাচার এককড়ি প্রথম পড়েন। যে কাগজটা খরচপাতি করে আনায় সে-ই প্রথম পড়বে এটাই নিয়ম। এককড়ি সময় নিয়ে পড়েন। খবরের কাগজ পাঠ যারা শুনতে এসেছে তাদের আগ্রহ এবং কৌতূহল বাড়ানোর জন্যে দু'একটা মন্তব্য করেন। দু'একটা শিরোনাম গলা খাঁকারি দিয়ে নিজেই পড়েন।

ইংল্যান্ডে বৃষ্টির মতো বোমাবর্ষণ
ব্রিটিশ সিংহ কম্পমান

ফ্রান্সের গভীরে অপ্রতিরোধ্য হিটলার

অপেক্ষমাণ জনতার একজন বলে বসল, হিটলার বাবাজি দেহি ফ্রান্সের গুয়া মাইরা দিছে।

এককড়ি চোখের চশমা ঠিক করতে করতে বললেন, অশ্লীল কথা বলবা না দীননাথ।

দীননাথ বিস্মিত হয়ে বলল, 'অশ্লীষ' কথা কোনটা বলছি! সত্য কথা বলছি। হিটলার সবেরেই গুয়া মারতাছে— এটা সত্য কথা, 'অশ্লীষ' না।

গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীর কাছে মূল কাগজ চলে এসেছে। তিনি কয়েকবার কেশে, পানি খেয়ে আয়োজন করে পাঠ শুরু করেছেন। শ্রোতাদের চোখ আগ্রহ এবং উত্তেজনায় চকচক করছে। দূরদেশের যুদ্ধ তাদের স্পর্শ করছে না। হিটলার নামে দুর্ধর্ষ একজন সবাইকে নাস্তানাবুদ করছে, ভাবতেই আনন্দ।

গৌরাঙ্গ পড়ছেন— 'একদিনে ৭০ বার বোমা হামলা। চার্চিলের মাথায় হাত।' পড়তে পড়তে গৌরাঙ্গ নিজেও মাথায় হাত দেন। হতাশ ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকান, যেন তিনি নিজে চার্চিল। মাথায় বোমা বর্ষণ চোখের সামনে দেখছেন। শ্রোতারা বড়ই আমোদ পায়।

বান্ধবপুরের লোকজন আগে কখনো হিটলারের নাম শোনে নি। এখন এই নাম চলে আসছে নিত্যদিনের আলোচনায়। যাদের ছেলেসন্তান হচ্ছে, তারা সন্তানের নাম রাখছে— হিটলু কিংবা হিটু। হিটলারের সঙ্গে মিল রেখে নাম।

খবরের কাগজ পড়া শেষ হয়েছে। শ্রোতারা যে যার বাড়িতে চলে গেছে। এককড়ি হারিকেন নিভিয়ে দিয়েছেন। কেরোসিনের সাশ্রয় করতে হবে। দাম যেভাবে বাড়ছে, কিছুদিন পর এই বস্তু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। বাইরে চাঁদের আলো আছে। হারিকেন না জ্বালালেও চলে। আধো অন্ধকারে এককড়ি দোকানের কর্মচারীদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। গলা নামিয়ে বললেন, চাল কিনা শুরু কর। দাম কিছু বেশি হলেও কিনবা। বড় নৌকা নিয়ে ভাটি অঞ্চলের দিকে যাও। সেখানে ধান চাল দুইই সস্তা।

কর্মচারীদের একজন বলল, কর্তা, কিনা শুরু করব কবে ? পঞ্জিকাতে শুভ দিন দেখে শুরু করা উচিত না ?

এককড়ির জন্যে তামাক সাজানো হয়েছে। তিনি তামাক টানতে টানতে বললেন, শ্রীগণেশের জন্যে সব দিনই শুভ। তারপরেও চৈত্র সংক্রান্তিতে পূজার পরে শুরু কর। এককড়ি তামাক টানতে লাগলেন।

বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের সূচনা শুরু হলো। ভয়াবহ এই মন্বন্তরে বঙ্গদেশে ত্রিশ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা যায়। বিশ্বযুদ্ধের পাওনা এভাবেই তাদের শোধ করতে হয়। মহান ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ লেখেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'অশনি সংকেত'।

বঙ্গদেশের মানুষ এই ধরনের বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে এর আগেও একবার গিয়েছিল। ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল তখন লর্ড ক্লাইভ। তার সময়ের মন্বন্তরে (ছিয়াত্তুরের মনন্তর) বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী মৃত্যুবরণ করে। তাদের মৃত্যু কখনোই শ্যাম সমান ছিল না।

জুমা মসজিদের বর্তমান ইমাম মাওলানা করিম এশার নামাজ শেষ করে ঘরে ফিরছেন। পাকা পুলের কাছে এসে মাওলানা থমকে দাঁড়ালেন। পাকা পুলের রেলিংয়ের ওপর লম্বা কে একজন দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে সাদা চাদর। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষ হলে মূর্তির হাত-পা নড়ত। বাতাসে গায়ের চাদর নড়ত। সেরকম কিছুই হচ্ছে না, মূর্তি পাথরের মতো স্থির।

করিম আয়াতুল কুরশি পড়ে বুকে ফুঁ দিলেন। পাকা পুল জায়গাটা খারাপ। পুলের কাছেই বিরাট যে তেঁতুলগাছ সেখানে ছায়ামূর্তিরা থাকে। অনেকেই দেখেছে। তিনি আজ প্রথম দেখলেন। তাঁর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এলো। একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে ? শেষ পর্যন্ত করলেন না। জিন-ভূতদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করা বিপদজনক। তখন তারা পিছু নেয়।

মাওলানা করিম দ্বিতীয়বার আয়াতুল কুরশি পড়ে হাততালি দিলেন। হাততালির শব্দ যতদূর যাবে জিন-ভূতদের তারচে'ও দূরে যাবার কথা। ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল না। হাততালির শব্দে ফিরে তাকাল। করিম নিজের অজান্তেই ভীত গলায় বলে ফেললেন, তুই কে ?

আমি লাবুস।

এখানে কী করিস ?

কিছু করি না।

পুলের উপরে দাঁড়ায়ে আছস কী জন্যে ? মানুষরে ভয় দেখানোর জন্যে ? আমি যদি আজ থাবড়ায়া তোর দাঁত না ফেলছি। বদমাইশ! পুলের উপর থেকে নাম বললাম।

লাবুস জবাব দিল না। যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, সেভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে শীতল গলায় বলল, আপনি মাওলানা ইদরিসকে গত জুম্মাবারে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। কেন দিলেন ?

করিম বললেন, তোর কাছে জবাবদিহি করব না-কি হারামজাদা ? সে কাফেরের কাজ করেছে বলে কাফের ফতোয়া দিয়েছি। হিন্দুর মুখাগ্নি করেছে। খবর রাখস না ?

লাবুস বলল, লাশের মুখে আগুন দিয়েছে। লাশের আবার হিন্দু-মুসলমান কী ? লাশ নামাজ কালাম পড়ে না। মন্দিরে ঘণ্টাও বাজায় না।

বাপরে বাপ! জ্ঞান ফলায়। দেওবন্দের প্রিন্সিপাল স্যার আসছেন। হারামজাদা, তুই জানস না ইদরিস এক বেশ্যামাগির সাথে সংসার করতেছে ? মাগির পেটও বাঁধায়ে ফেলেছে।

জুলেখা লাবুসের মা। করিমের কঠিন কথাতে লাবুসের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সে আগের মতোই শান্ত গলায় বলল, মাওলানা ইদরিসকে কাফের বলার কারণে আজ আমি আপনাকে শাস্তি দিব। এমন শাস্তি যে জনমে ভুলবেন না। যতদিন বাঁচবেন ইয়াদ থাকবে।

করিম থমকে গেলেন। বদমাইশটার কথা বলার ধরন ভালো না। ছুরি চাক্কু চালাবে কি-না কে জানে ! লাবুসের হাতে অবশ্যি ছুরি চাক্কু কিছু দেখা যাচ্ছে না। বদমাইশটা চাদরের নিচে লুকিয়ে রাখতে পারে। মনে হয় তাই করেছে। চৈত্র মাসের গরমে গায়ে চাদর থাকার কথা না।

করিম বললেন, কী শাস্তি দিবি ?

লাবুস বলল, আমি আপনেরে ন্যাংটা করে ছেড়ে দিব। ন্যাংটা অবস্থায় দৌড়াতে দৌড়াতে আপনি ঘরে যাবেন। আপনার স্ত্রী দরজা খুলে দেখবে ন্যাংটা ইমাম।

এই হারামজাদা! তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

লাবুস রেলিং থেকে নামতে নামতে বলল, মাথা খারাপ হয় নাই।

করিম উল্টাদিকে দৌড় দেবেন কি-না বুঝতে পারছেন না। এই হারামজাদা তাকে ভয় দেখাচ্ছে। এর বেশি কিছু না। এইসব ক্ষেত্রে ভয় পেতে নাই। ভয় পেলেই হারামজাদা বুঝতে পারবে, আরো লাই পাবে।

লাবুস করিমের দিকে এগুচ্ছে। ছোট ছোট পা ফেলে এগুচ্ছে। তার চোখের দৃষ্টি তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। করিম দ্রুত ভাবছেন, এখনো দৌড় দেয়ার সময় আছে। তবে দৌড় দেয়াটা হবে বিরাট বোকামি।

লাবুস বলল, পাঞ্জাবিটা খুলে আমার হাতে দেন।

করিম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। পাঞ্জাবির ওপর দিয়ে যাচ্ছে। উদম গায়ে বাজারের ভেতর দিয়ে যাওয়াও লজ্জার ব্যাপার। তারপরেও কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবেন— অতিরিক্ত গরমের কারণে পাঞ্জাবি খুলে রেখেছেন। কথা মিথ্যাও হবে না। আজ অতিরিক্ত গরম পড়েছে। পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে যাচ্ছে।

করিম পাঞ্জাবি খুলে লাবুসের হাতে দিতে দিতে বললেন, পাঞ্জাবি নিয়ে বাড়িত যা। অপরাধ যা করেছিস তার ক্ষমা নাই। তবে আজ আর কিছু বলব না। কোনো একদিন ফয়সালা হবে।

লাবুস বলল, এখন লুঙ্গি খুলে আমার হাতে দেন।

কী বললি ?

একবার তো বলেছি। আবার বলি, লুঙ্গি খুলে আমার হাতে দেন। নিজে না দিলে আমি টান দিয়া খুলব।

করিমের হাত-পা জমে গেল। তাঁর কান দিয়ে মনে হচ্ছে ধোঁয়া বের হচ্ছে। চোখ ঝাপসা।

মেঘের ভেতর থেকে চাঁদ বের হয়েছে। ফকফকা চাঁদের আলো। করিম দুই হাতে লজ্জা ঢেকে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। লাবুসের হাতে মাওলানার লুঙ্গি-পাঞ্জাবি। লাবুস সহজ গলায় বলল, বাজারের ভিতর দিয়ে যেতে পারবেন না। বাজারে হরিনাম জপ হচ্ছে। নদীর পাড় দিয়ে চলে যান। কেউ দেখবে না।

বাজারের দিক থেকে বিড়ি টানতে টানতে কে যেন আসছে। দূর থেকে বিড়ির আগুনের ওঠা-নামা দেখা যাচ্ছে। করিম রাস্তা ফেলে নদীর পাড়ের দিকে দৌড় দিলেন। রাত তেমন বেশি হয় নি। ঘাটের নৌকার মাঝিরা নিশ্চয়ই জেগে আছে। তাদের কেউ-না-কেউ অবশ্যই দেখবে। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা ভালো। রাত গভীর হলে বাড়ি ফিরবেন। জঙ্গলে বসে থাকারও হাজার সমস্যা আছে। সাপখোপের সমস্যা। অতিরিক্ত গরমে তারা সবাই গর্ত থেকে বের হয়েছে। পালপাড়ার এক বৌ গত বুধবার দুপুরে সাপের কামড়ে মারা গেছে। কচুর লতির সন্ধানে সে জঙ্গলে ঢুকেছিল। কচুগাছের নিচে হাত দেয়া মাত্র সাপ ঠোকর দিল। আল্লাহ্ মাবুদ জানে— তাঁর কপালে সাপের হাতে মৃত্যু আছে কি-না।

করিমের বাড়ি বাজারের শেষপ্রান্তে। তিনি বছরখানেক আগে ভাটি অঞ্চলের এক মেয়ে বিয়ে করেছেন। মেয়ের বয়স অল্প। কিশোরীর মায়া তার চোখ-মুখ থেকে যায় নি। তার নাম শরিফা। সে উঠানে হারিকেন জ্বালিয়ে স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছে। বাজারে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা হচ্ছে। উঠান থেকে মোটামুটি শোনা যায়। শরিফার শুনতে ভালো লাগছে। যদিও পরের ধর্মকথা শোনা ঠিক না। পাপ হয়। শরিফার প্রায়ই মনে হয় মুসলমানদের মধ্যে গানবাজনা করে ধর্মকথা বলার ব্যবস্থা থাকলে ভালো হতো।

গৌরাঙ্গের মিষ্টি গলার সঙ্গে মৃদঙ্গের বাড়ি, শরিফা আগ্রহ নিয়ে শুনছে।

কহিব তোমাকে আমি পূজার বিষয়।
সওয়া সের আটা কিংবা আতপের গুঁড়ি।
কাঁচা দুগ্ধ সওয়া সের, কলা সওয়া কুড়ি।
সওয়া সের ইক্ষুগুড় সেবার প্রমাণ।
সওয়া সের গুয়া লাগে, সওয়া কুড়ি পান।
সওয়া সের সওয়া মন যে যেরূপে পারে
মুদ্রা যদি থাকে তবে নানা উপাচারে—

বেড়ার বাইরে কে যেন গলা খাঁকারি দিয়ে ডাকল, ইমাম সাহেব বাড়ি আছেন?

শরিফা চমকে উঠল। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। কথা না বললে মানুষটা উঠানে ঢুকে পড়তে পারে, সেটা আরো বিপদের।

ইমাম সাহেব বাড়ি ফিরেন নাই?

শরিফা ক্ষীণ গলায় বলল, না।

পুরুষকণ্ঠ বলল, মা! আমার নাম লাবুস। ইমাম সাহেবের কিছু জিনিস আমার কাছে। যদি অনুমতি দেন উঠানে রেখে যাই।

যে পুরুষ 'মা' সম্বোধন করেছে তাকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া যায়। শরিফা ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। দরজার আড়াল থেকে বলল, রেখে যান।

লাবুস উঠানে ঢুকল। যুবা পুরুষের গায়ে চাঁদের আলো পড়েছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে ভিনদেশের কোনো রাজপুত্র পথ ভুলে চলে এসেছে। শরিফার মনে হলো, এমন রূপবান পুরুষ সে তার জীবনে দেখে নি। আর এই যুবা পুরুষটার কী অদ্ভুত নাম— লাবুস।

শরিফা আর কথা বলবে না ঠিক করে রাখার পর বলল, আপনি হিন্দু না মুসলমান?

আমি মুসলমান। মা, আসসালামু আলায়কুম।

শরিফা বিব্রত গলায় বলল, ওয়ালাইকুম সালাম।

লাবুস বলল, মা, আমি সারাদিন খাই নাই। খুবই ক্ষুধার্ত। ঘরে কিছু কি আছে? চিড়া, মুড়ি, একটা কিছু হলেই হবে।

আপনি দাওয়ায় জলচৌকিতে বসেন। খাওয়া আনতেছি। কলসিতে পানি আছে। হাত-মুখ ধোন।

লাবুস বলল, আপনাকে মা ডেকেছি— আমাকে তুমি করে বলবেন।

শরিফা অতি দ্রুত খাওয়ার ব্যবস্থা করল। গরম ভাত। খলিসা মাছের ঝোল, পাট শাক, ডাল।

বারান্দায় পাটি পেতে খাওয়ার নিখুঁত আয়োজন। পাতে লবণ দেয়া, কাগজি লেবুর টুকরা, কাঁচামরিচ, একটা বাটিতে পাতে খাওয়ার ঘি।

শরিফা দরজার আড়াল থেকে ক্ষীণ গলায় বলল, আয়োজন কিছুই নাই, আমি শরমিন্দা। তোমারে দাওয়াত দিলাম। একদিন আসবা। পোলাও করব, মুরগির কোরমা করব।

লাবুস মাথা কাত করে বলল, জি আচ্ছা।

খাওয়া শেষ করে লাবুস উঠানে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহপাক, আমাকে আমার নতুন মা যে যত্নের সঙ্গে খানা দিয়েছেন, তাঁকে সারাজীবন যেন কেউ না কেউ এরকম যত্ন করে খাওয়ায়।

অদ্ভুত এই দোয়ার কথা শুনে শরিফার চোখে পানি এসে গেল।

আহারে বেচারা, ঘরে কিছুই ছিল না, তারপরেও কত তৃপ্তি করে খেয়েছে। কী সুন্দর করে দোয়াটা করেছে! প্রিয়জন কেউ কি এর নাই? সে কি পথে পথে না খেয়ে ঘুরে?

তোমার পরিচয় কী?

আমার কোনো পরিচয় নাই।

পরিচয় থাকবে না এটা কেমন কথা! আমারে মা ডেকেছ, খুশি হয়েছি। তোমার আসল মা কে?

আমার কোনো মা নাই। এখন আমারে বিদায় দেন, আমি যাই।

কলাপাতায় শরীর ঢেকে ইমাম করিম কাদায় পানিতে মাখামাখি হয়ে গভীর রাতে ফিরলেন। তাঁর চোখ রক্তবর্ণ। শরীর কাঁপছে। হতভম্ব শরিফা বলল, আপনার কী হয়েছে?

করিম বিড়বিড় করে বললেন, আগে গোসলের পানি দেও। গামছা দেও। জিনের হাতে পড়েছিলাম। জীবনসংশয় হয়েছিল। অনেক কষ্টে জানে বাঁচছি।

কন কী আপনি ?

করিম বলল, তুমি কি ভাবছ মিথ্যা বলতেছি ? যা বলতেছি সবই সত্য। জিনের নাম খোররম। সে থাকে কোহকাফ নগরে। এশার নামাজের পর বাড়ি ফিরতেছি, সে আমার পিছু নিছে। কখনো থাকে পিছে, কখনো চইলা আসে সামনে। তার হাত থেকে বাঁচার জন্যে সূরায়ে জিন পাঠ শুরু করলাম— এইখানে হইল সমস্যা।

কী সমস্যা ?

ভয়ের কারণে মাঝখানে আমার দোয়া বিস্মরণ হলো। 'ওয়া আন্না জনান না আললান তাকুলাল ইনসু' পর্যন্ত পড়েছি, তারপর আর কিছু মনে আসে না। মাথা গেল আউলায়া, তখন জিন আইসা আমারে চাইপা ধরল। টান দিয়া নিয়া গেল জঙ্গলায়। পাছড়াপাছড়ি কামড়াকামড়ি।

কী সর্বনাশ!

একসময় জ্ঞান হারাইলাম। যখন জ্ঞান ফিরল দেখি ন্যাংটা হইয়া কাদার মধ্যে শোয়া। জানে যে বাঁচছি এইজন্য আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া।

ভয়ঙ্কর এই কথা শোনার পর শরিফা লাবুসের কথা চেপে গেল। সে যে ইমাম সাহেবের পাঞ্জাবি-লুঙ্গি দিয়ে গেছে, এটাও তো একটা রহস্য। আচ্ছা এমন কি হতে পারে— লাবুস নামে যে এসেছে, সে-ই জিন খোররম ? মানুষের বেশ ধরে এসেছে। তাকে মা বলে ডেকেছে। খাওয়া-দাওয়া করেছে। অনেক রাত পর্যন্ত শরিফা জেগে রইল। একসময় সে পুরোপুরি নিশ্চিত হলো, জিন খোররমের সঙ্গেই তার দেখা হয়েছে। মানুষ এত সুন্দর হয় না। মানুষ এত গরমে চাদর গায়ে রাখে না। শরিফার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। পাশেই তার স্বামী অঘোরে ঘুমাচ্ছে। শরিফার ইচ্ছা করছে স্বামীকে ডেকে তুলে জিন খোররমের সাথে তার দেখা হওয়ার গল্পটা করে।

লাবুস ভালো ঝামেলায় আছে। অনাহারের ঝামেলা। এত বেলা হয়েছে, এখনো খাবারের কোনো ব্যবস্থা হয় নি। দুপুরে মাওলানা ইদরিসের বাড়ির কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলো। ওই বাড়িতে তার মা জুলেখা থাকে। মায়ের সঙ্গে দেখা করার তার কোনো ইচ্ছা নেই।

সে রওনা হলো জংলার কালীবাড়ির দিকে। দেবীকে ভোগ হিসেবে কেউ কেউ হঠাৎ একটা দু'টা পয়সা ছুড়ে দেয়। একবার এখান থেকেই একটা এক আনি পেয়েছিল।

কালীবাড়িতে কোনো পয়সা-কড়ি পাওয়া গেল না। কেউ একজন কলাপাতায় ক্ষীর দিয়ে গেছে। দুনিয়ার পিঁপড়া ক্ষীরের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পিঁপড়ার খাওয়া দেখে সে জঙ্গলে ঢুকল। জঙ্গলে বুবি গাছে (লটকন) পাকা বুবি আছে। যত ইচ্ছা খাওয়া যায়। সমস্যা একটাই, বুবি খেলে ক্ষুধা যায় না, বরং আরো বাড়ে। সে জঙ্গলে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল। জংলি কিছু কলাগাছ আছে। আঙুলের মতো ছোট ছোট কলা ধরেছে। এই কলা সে আগেও খেয়ে দেখেছে— তিতা এবং ভয়ঙ্কর কষটা। জোর করে খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে প্রবল বমিভাব হয়।

জঙ্গলের মাঝখানে জলা জায়গায় হুটপুট শব্দ হচ্ছে। লাবুস সেদিকে এগিয়ে গেল। কেউ বরশি পুঁতে রেখেছে, সেখানে মাছ ধরা পড়েছে। প্রায় দুই হাত লম্বা এক বোয়াল। বর্শি ছেঁড়ার প্রাণান্ত চেষ্টায় সে ক্লান্ত। লাবুস বোয়ালটা ডাঙ্গায় তুলল। আগুনে পুড়িয়ে খেলে ভালো হবার কথা। আগুন জ্বালাবার কোনো সরঞ্জাম তার কাছে নেই। মাছটা কাঁচা খাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। যদিও তার মনে হচ্ছে, সে চোখ বন্ধ করে কাঁচা খেতেও পারবে। জংলি মানুষরা তো একসময় কাঁচা মাছ খেত। তাদের সমস্যা না হলে তার হবে কেন?

আগুনের উদ্দেশ্যে লাবুস জংলা থেকে বের হলো। তার চাদরের নিচে বোয়াল মাছ লুকানো। আগুন পাওয়া কঠিন হবে। যুদ্ধের বাজারে দেয়াশলাইয়ের দাম তিনগুণ হয়েছে। লাবুস বাজারের দিকে হাঁটা ধরল। দেয়াশলাই জোগাড় হবে কি-না বুঝতে পারছে না। কেউ তাকে মাগনা দেয়াশলাই দেবে না। হিন্দু পাইস হোটেলের সামনে থমকে দাঁড়াল। রান্নার কী সুন্দর গন্ধ আসছে! পাইস হোটেলের মালিক নিবারণ বলল, দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া থাকবি না।

লাবুস বলল, কর্তা, ভাত খাব।

নিবারণ বলল, ভাত যে খাবি পয়সা আছে?

লাবুস বলল, পয়সা নাই। একবেলা খাওয়ার বিনিময়ে এই মাছটা আপনারে দিব।

লাবুস চাদরের নিচ থেকে মাছ বের করল। বোয়াল মাছের প্রাণশক্তি ভালো। সে এখনো জীবিত। কানকো নড়ছে।

নিবারণ বলল, খেতে বস। বাইরে বসে খাবি। মুসলমানের ভিতরে ঢোকা নিষেধ। অন্যের খাওয়া নষ্ট হয়। যা কলাপাতা কেটে নিয়ে আয়।

সবুজ কলাপাতায় ধবধবে সাদা ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত। ঝিঙা দিয়ে রাঁধা লাবড়া, সঙ্গে মলা মাছের ঝোল। খেতে খেতে লাবুসের মনে হলো, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ ভরপেট খাওয়ায়। এইজন্যেই হয়তো বেহেশতে খাওয়া-খাদ্যের বর্ণনায় এত জোর দেয়া হয়েছে।

লাবুসের কলাপাতার ভাত শেষ হয়েছে। সে হাত গুটিয়ে বসে আছে, তার দৃষ্টি পাচক বামুনের দিকে।

নিবারণ বলল, অ্যাই এরে আরো ভাত দে, ডাল দে। পেটে ক্ষুধা নিয়ে কেউ আমার দোকান থেকে উঠবে, এটা ঠিক না। এতে অন্নপূর্ণা অসন্তুষ্ট হন।

লাবুস যখন খাচ্ছিল, তখনি বেঙ্গল নেভিগেশনের লঞ্চে করে ধনু শেখ বান্ধবপুরের ঘাটে এসে নামেন। পা কাটা যাবার পর এই প্রথম তিনি নিজ গ্রামে এসেছেন। যে লঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে আগে তিনি চোখ বন্ধ করে নামতেন, আজ সেই সিঁড়ি দিয়ে তাকে কোলে করে নামানো হচ্ছে। কী লজ্জার কথা! দুনিয়ার মানুষও জড়ো হয়েছে লঞ্চঘাটে। যেন তারা জীবনে কখনো এক ঠ্যাং-এর মানুষ দেখে নাই। সব বদের দল। ধনু শেখের ইচ্ছা করছে দু'নলা বন্দুক দিয়ে একটা ফাঁকা আওয়াজ করেন, যাতে ভয়ে লোকজন ছুটে পালায়। তিনি নিরিবিলিতে নামতে পারেন।

ধনু শেখকে তার বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে চেয়ারের হাতলে বাঁশ বেঁধে বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অতি বিরক্তি নিয়ে তিনি চেয়ারে বসে আছেন। চারজন মিলে তাকে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা হয়েছে পাল্কির মতো। পাল্কির ভেতরে বসে থাকা মানুষ দেখা যায় না। এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে।

চেয়ারের পেছনে পেছনে বালক-বালিকার বিশাল এক বাহিনী। ধনু শেখের লোকজন ধমক ধামক দিয়েও এদের দূর করতে পারল না। এমন মজার দৃশ্য তারা অনেক দিন দেখে নি। যতক্ষণ দেখা সম্ভব ততক্ষণ তারা দেখবেই।

ধনু শেখ বিরক্ত গলায় বললেন, খামাকা পিছে পিছে না এসে শ্লোগান দে। বল, খান বাহাদুর ধনু শেখ জিন্দাবাদ।

শিশুরা মহাআনন্দে জিন্দাবাদ দিতে লাগল। এত আমোদ তারা অনেক দিন পায় নি।

রাত আটটার মতো বাজে। বান্ধবপুরের বেশির ভাগ মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে। ধনু শেখ জেগে আছেন। তিনি এখনো রাতের খাওয়া খান নি। রান্নাবান্নার আয়োজন

হচ্ছে। রাতে তিনি মাছ খান না। তাঁর জন্যে খাসি জবেহ্ হয়েছে। কোলকাতায় খাসির মাংস বলে যা পাওয়া যায়, সবই পাঁঠা। হাজার মসলা দিলেও মাংস থেকে গন্ধ যায় না।

ধনু শেখের মদ্যপানের অভ্যাস ছিল না। পা কাটা যাবার পর সামান্য মদ্যপান শুরু করেছেন। জাহাজে করে কোম্পানির লোকজনের জন্যে বিলাতি বোতল আসে। নানা যন্ত্রণা করে তিনি সেখান থেকে বোতল সংগ্রহ করেন। মাঝে মাঝে বিস্মিত হয়ে ভাবেন, ইংরেজ জাতি কত উন্নত। এরা যখন মদ বানায়, সেই মদও উন্নত। আমরা এখনো পড়ে আছি ধেনু মদে। এতই দুর্গন্ধ যে নাক চাপা দিয়ে খেতে হয়।

ধনু শেখ লাবুসকে খবর দিয়ে এনেছেন। সে অনেকক্ষণ থেকে ধনু শেখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ধনু শেখ কয়েকবার তার দিকে তাকিয়েছেন, কিছু বলেন নি। নিজের মনে ডাবের পানি মেশানো 'জিনে'র বোতলে চুমুক দিয়েছেন। এইবার তিনি কথা শুরু করলেন—

তোমার নাম লাবুস?

হ্যাঁ।

হুঁ হ্যাঁ করছ কেন? আদব লেহাজ ভুলেছ? কার সঙ্গে কথা বলতেছ বিস্মরণ হয়েছ? আমি খান বাহাদুর। আদবের সঙ্গে কথা বলবা। বলো জি।

জি।

সুলেমানের পুত্র?

জি।

সুলেমান কোথায়?

উনি ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা করতে গেছিলেন, আর ফিরেন নাই।

ধনু শেখ আনন্দিত গলায় বললেন, ঘোড়ায় যেতে যেতে ইউরোপে চলে গেছে কি-না খোঁজ নাও। দেখা গেল যুদ্ধের মধ্যে পড়েছে। হা হা হা।

লাবুস বলল, আপনি কী জন্যে আমাকে ডেকেছেন?

ধনু শেখ ভুরু কুঁচকে বললেন, এত তাড়া কী জন্যে? তুমিও কি ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষায় বের হবে? গায়ে চাদর কেন? গরমের মধ্যে চাদর, ঘটনা কী?

লাবুস চুপ করে রইল।

ধনু শেখ বিরক্ত গলায় বললেন, প্রশ্ন করলে জবাব দিবা। আল্লাহ্পাক বোবা বানালে তুমি বোবা। নিজ থাইকা বোবা সাজবা না। গায়ে চাদর কেন?

লাবুস বলল, আমার কাপড় নাই, চাদর দিয়া নিজেরে ঢাইকা রাখি।

ধনু শেখ চারমিনার সিগারেট ধরিয়েছিলেন। সিগারেট ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, বাপের মতো ভিক্ষায় বাইর হও নাই কেন ? পিতা ভিক্ষুক পুত্রও ভিক্ষুক। ভিক্ষুক বংশ।

লাবুসের দৃষ্টি তীক্ষ্ম হলো। সে কিছু বলল না। এই মানুষটা শশাংক পালের মতো কথা বলছে। খুবই আশ্চর্যের কথা, কিছু কিছু মানুষ একইভাবে চিন্তা করে। তাদের পরিণতিও হয় একই।

ধনু শেখ বললেন, তোমাকে বিশেষ কারণে ডেকেছি। রসালাপ করার জন্যে ডাকি নাই। রসালাপ করতে হয় অল্পবয়সি মেয়েছেলের সাথে। বুঝেছ ?

বুঝেছি।

হরিচরণের বিশাল বিষয়সম্পত্তি, সব তিনি যে তোমারে দানপত্র করে দিয়েছেন সেটা জানো ?

না।

দানপত্রের মূল কপি আমার কাছে আছে। দানপত্র নিয়া যাও— মুফতে যে জিনিস পেয়েছ ভোগ কর। তার আগে সাবান ডলে ভালোমতো গোসল কর। টাকা দিতেছি— জামাকাপড় কিনো।

ধনু শেখ একশ' রুপির একটা নোট বের করলেন। লাবুস সহজ ভঙ্গিতে নোট হাতে নিল। ধনু শেখ উদার গলায় বললেন, রাতে আমার সঙ্গে খানা খাবে। পোলাও খাসির মাংস।

এত বড় একটা ঘটনা জানার পরেও একটা ছেলে এত নির্বিকার কেন ধনু শেখ ভেবে পেলেন না। পাগল না তো ! সুস্থ মাথার মানুষ হলে আনন্দে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত।

লেখাপড়া কিছু জানো ?

অল্প জানি।

যুদ্ধ যে চলতেছে এইটা জানো ?

শুনেছি।

কার সাথে কার যুদ্ধ ?

জার্মানি আর জাপানের সাথে সারা দুনিয়ার যুদ্ধ।

আমরা ভারতবাসী কার সাথে আছি ?

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সাথে।

উনি কোথায় ?

উনি ইংরেজের হাতে বন্দি।

যুদ্ধে কে জিতবে ?

কেউ জিতবে না, তবে হিটলার হারবে। জাপানে দুইটা বড় বোমা পড়বে। জাপান হারবে।

ধনু শেখ বললেন, জাপানে দুইটা বড় বোমা পড়বে তোমাকে কে বলেছে ? চার্চিল সাব তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেছেন ?

লাবুস বলল, আমি অনেক কিছু চোখের সামনে দেখি।

ধনু শেখ বললেন, তুমি তো বিরাট পীর হয়েছ। শরীরে নাই কাপড়, পেটে নাই ভাত। কিন্তু পীর কেবলা।

লাবুস শান্ত গলায় বলল, এখন তো ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

ধনু শেখ রাগী গলায় বললেন, ব্যবস্থা কে করেছে ? আমি, না-কি হরিচরণ ?

লাবুস জবাব দিল না। ধনু শেখ হঠাৎ লক্ষ করলেন, নোংরা চাদর গায়ে যে যুবক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সে অসম্ভব রূপবান একজন। মদের ঝোঁকে এরকম দেখছেন ? বেশি তো খাওয়া হয় নি। মাত্র তিন গ্লাস।

তুমি নিশ্চয়ই বিবাহ কর নাই ?

জি-না।

আমার কন্যাকে বিবাহ করবা ? তার নাম আতর। আমার মতো তার ঠ্যাং কাটা না। সে ভালো মেয়ে।

লাবুস পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালো। তার ঠোঁটে হালকা হাসির আভাস। ধনু শেখ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এই ছেলে সত্যি সত্যি হেসে ফেললে তাকে রাম ধোলাই দিতে হবে। বেয়াদবির শাস্তি।

ধনু শেখের নিজের ওপরই রাগ লাগছে। হুট করে এই ফকিরের পুলাকে মেয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেললেন ? দেশে কি সুপাত্রের অভাব হয়েছে ? তিনি বুঝতে পারছেন যা করেছেন সবই মদের ঝোঁকে করেছেন। এই বস্তু খাওয়া বন্ধ করতে হবে। ধনু শেখ বললেন, খাম্বার মতো সামনে দাঁড়ায়া থাকবা না। বিদায়।

লাবুস বলল, রাতে আপনার সঙ্গে খানা খেতে বলেছিলেন।

ধনু শেখ বললেন, যা বলেছিলাম ফিরায়ে নিলাম। খান বাহাদুর ধনু শেখ ভিক্ষুকের সাথে খানা খায় না। সামনে থেকে যাও।

লাবুস ঘর থেকে বের হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ধনু শেখ তার সন্ধানে লোক পাঠালেন। তাঁর কাছে মনে হলো, একবার যখন খানা খাওয়াবেন বলে কথা দিয়েছেন তখন কথা রাখা উচিত।

রাত দু'টা বাজে। মাওলানা ইদরিস উঠানে বসে আছেন। উঠানে আলো নেই। আকাশে মেঘ থাকায় চাঁদ বা নক্ষত্রের কোনো আলোও নেই। তাঁর চারদিকে ঘন অন্ধকার। ঘরের দরজা খোলা। ঘরের ভেতর থেকে হারিকেনের সামান্য আলো আসছে। ইদরিস তাকিয়ে আছেন আলোর দিকে। তাঁর মন সামান্য বিষণ্ন। শশাংক পালের বিষয়ে একটা কথা শোনা যাচ্ছে। সে না-কি মরে ভূত হয়েছে। অনেকেই শ্মশানঘাটে তাকে দেখেছে। নগ্ন অবস্থায় নদীর পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকে। কাউকে দেখতে পেলে দুঃখিত গলায় বলে, এইটা কী করলা ? একজন মুসলমানরে দিয়া আমার মুখাগ্নি করাইলা ? এই কারণে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছি। গয়ায় পিণ্ডিদানের ব্যবস্থা কর। আমারে উদ্ধার কর।

গয়ায় পিণ্ডিদানের বিষয়টা কী ইদরিস জানেন না। যারা জানে তারাও এই বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নিবে বলে মনে হয় না। পিণ্ডি দেওয়ার কাজটা কি কোনো মুসলমান্ন করতে পারে ? পারলে তিনি করতে রাজি আছেন। সমস্যা একটাই, গয়াকাশি যাবার মতো অর্থসংস্থান তাঁর নেই। তবে তাঁর ধারণা, মুখাগ্নির মতো পিণ্ডিদানের ব্যবস্থাটাও হিন্দুদের করতে হবে। তাঁকে দিয়ে হবে না।

গয়াকাশি না গেলেও মাওলানাকে একবার বগুড়ার মহাস্থানগড়ে যেতে হবে। শশাংক পাল মৃত্যুর আগে তাকে এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সেখানে ললিতা নামে এক মেয়েকে খুঁজে বের করে বলতে হবে— বান্ধবপুরের এক সময়ের জমিদার বাবু শশাংক পাল তোমার পিতা। জীবিত অবস্থায় এই খবর তিনি তোমাকে দিতে পারেন নাই বলে তিনি বিশেষ লজ্জিত। তিনি তোমার জন্যে কিছু উপহার রেখে গেছেন। দশটা সোনার মোহর। বিশেষ একটা জায়গায় মাটিতে গর্ত করে পোঁতা।

জুলেখা দরজায় এসে দাঁড়াল। হাই তুলতে তুলতে বলল, একটু ভিতরে আসবেন ? খাটের নিচে সাপ। সাপটা বিদায় করেন।

খাটের নিচে অন্যসব দিনের মতো হারিকেন জ্বলছে। আলোয় সাপ আসে না— এই কথা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে হারিকেনের কাছেই সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। মাওলানা হাততালি দিয়ে বললেন, অ্যাই যা। যা !

সাপটা মাথা তুলে তাকাল। কিছুক্ষণ মাওলানাকে দেখে আবার মাথা নামিয়ে শুয়ে পড়ল। জুলেখা বলল, সাপ খেদানির কোনো দোয়া জানেন না ? দোয়া পড়েন।

মাওলানা বললেন, খোদার কালাম নিয়া ঠাট্টা-তামাশা করবা না।

জুলেখা বলল, অন্য ব্যবস্থা নেন। লাঠি দিয়া মারেন।

মাওলানা বললেন, না। সে আমার কোনো ক্ষতি করে নাই। আমি তারে মারব কী জন্যে ?

যখন ক্ষতি করব তখন কিন্তু আর উপায় থাকব না। এইটা শঙ্খচূড় সাপ। এর বিষ নামানি কোনো ওঝার পক্ষেও সম্ভব না।

মাওলানা সাপ খেদানোর চেষ্টা আরেকবার করলেন। শলার ঝাড়ু দিয়ে কয়েকবার সাপের খুব কাছাকাছি বাড়ি দিলেন। সাপের কোনো ভাবান্তর হলো না। মাথা উঁচু করে সে একবার মাওলানাকে দেখল, আরেকবার জুলেখাকে দেখে আগের মতো মাথা নামিয়ে ফেলল। মাওলানা বা জুলেখা দু'জনের কেউ তখন জানে না এই শঙ্খচুড় সাপটা ডিম পাড়ার জন্যে খাটের নিচটা বেছে নিয়েছে। তাকে এখান থেকে সরানো এখন অসম্ভব।

ধনু শেখ খেতে বসেছেন। খাটে দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার সাজানো হয়েছে। লাবুস তাঁর সঙ্গেই বসেছে। কালিজিরা চালের পোলাও, খাসির মাংস। বাটিভর্তি পেঁয়াজ দেয়া হয়েছে। খাদিমদার আছে দু'জন। একজন লাবুসের প্লেটে খাবার দিচ্ছে, আরেকজন ধনু শেখকে দেখছে।

লাবুস মাথা নিচু করে খেয়ে যাচ্ছে। তার গায়ে নকশাতোলা পাঞ্জাবি। পায়জামা পাঞ্জাবিতে লাবুসকে সত্যিকার অর্থেই রাজপুত্রের মতো লাগছে। ধনু শেখ খানিকটা বিচলিত বোধ করছেন। কেন করছেন তাও বুঝতে পারছেন না। তিনি গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, তোমার নাম কী বলেছিলা বিস্মরণ হয়েছি। আরেকবার বলো।

লাবুস।

পিঁয়াজ নিয়া খাও। মুসলমানদের জন্যে পিঁয়াজ খাওয়া দুস্তর। কারণ পিঁয়াজ মুসলমান। রসুন হিন্দু। বুঝেছ ?

হুঁ।

একবার তো বলেছি হুঁ হাঁ করবা না। এখন তোমাকে আদবকায়দা শিখতে হবে। কারণ তুমি এখন রইস আদমি।

লাবুস বলল, রইস আদমির দোষ-ত্রুটি লাগে না। দোষ-ত্রুটি গরিবের জন্য।

তোমাকে এইসব কে শিখায়েছে ? তোমার ভিক্ষুক পিতা ?

আমার যা শিখার আমি নিজে শিখেছি। আমার কোনো শিক্ষক নাই।

ধনু শেখ বললেন, আমারে শিক্ষক মানতে পার। আমি অনেক কিছু জানি যা তুমি জানো না। সোহ্‌রাবর্দীর নাম শুনেছ ?

জি-না।

তিনি এখন আমাদের নেতা। আমি তাঁর নাম দিয়েছি কাটাকুটি নেতা।

কেন ?

কারণ তিনি গোপনে দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা বলেন। তাঁর মন্ত্র হিন্দু কমাও। মুসলমান কমাও, এই মন্ত্র কি কেউ বলে ?

সব হিন্দু নেতাই মনে মনে এই মন্ত্র জপ করে। কেউ কেউ প্রকাশ্যে বলে।

গান্ধিজি কি বলেন ?

গান্ধিজি চুপ করে থাকেন। মাঝে মাঝে গান্ধিপোকার মতো 'পাদ' দেন। তখন সব জ্বলেপুড়ে যায়। হা হা হা।

লাবুস খাওয়া বন্ধ করে ধনু শেখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাঁর হাসি অবিকল শশাংক পালের হাসি। মানুষটা চলে গেছে, কিন্তু তার হাসি রেখে গেছে।

ধনু শেখ বললেন, হিন্দু মারতে হবে এটা মাথার মধ্যে রাখবা। হিন্দু না মারলে পাকিস্তান কায়েম হবে না। হিন্দু মারলে ইংরেজ সরকার তোমাকে কিছুই বলবে না। কী জন্যে কিছু বলবে না জানো ?

জানি না।

ইংরেজ চায় আমরা নিজেরা মারামারি করি। আমরা মারামারি করলে তারা থাকবে নিরাপদ। তখন ক্ষুদিরামরা তাদের মারবে না। এখন বুঝেছ যে শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা আমার আছে ? কী হলো, খাওয়া শেষ ?

জি জনাব খাওয়া শেষ।

লাবুস হাত না ধুয়েই উঠানে নেমে গেল। ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টিতেই হাত ধোয়া হয়ে যাবে। লাবুস ভিজতে ভিজতে হরিচরণের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। পাকা পুলের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। খালে পানি বেড়েছে, শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। শুনতে ভালো লাগছে। শব্দের মধ্যেও ভালো মন্দ আছে। কিছু শব্দ শুনতে ভালো লাগে, কিছু শব্দ শুনতে খারাপ লাগে। এর কারণ কী ? আল্লাহপাক মানুষকে যেমন ভালো এবং মন্দতে ভাগ করছেন— জগতের সবকিছুকেই তাই করেছেন ? এ তাঁর কেমন লীলা ?

বৈশাখের শুরু। ভোরের আলো ভালোমতো ফোটে নি। আকাশ মেঘলা বলে চারদিক অন্ধকার হয়ে আছে। আকাশের মেঘ কিছুটা মনে হয় নিচেও নেমে এসেছে। জায়গায় জায়গায় গাঢ় কুয়াশা। বৈশাখ মাসের সকালে কুয়াশা পড়ে না। আজ পড়েছে।

হরিচরণের কবর এবং তার চারপাশ কুয়াশার মধ্যে পড়েছে। দূর থেকে আবছাভাবে বাঁধানো কবর এবং কবরের পাশের আমগাছটা চোখে পড়ছে। মনে হচ্ছে কেউ একজন কবরের ওপর মস্ত ছাতা মেলে ধরে আছে।

কবরের ঠিক মাথার কাছে আমগাছ কেউ লাগায় নি। আপনাআপনি হয়েছে। এবং অতি দ্রুত বিশাল বৃক্ষের রূপ নিয়েছে। প্রতি বছর এই গাছে মুকুল আসে না। দু'বছর পর পর আসে। এই বছর ঝাঁকিয়ে মুকুল এসেছে। গাছের ডালভর্তি সুতা। সবার ধারণা কোনো কিছুর জন্যে আমগাছে সুতা বেঁধে প্রার্থনা করলে তা মিলে। মেয়েদের ক্ষেত্রে নিজের মাথার চুল বাঁধতে হয়।

আমগাছের কাণ্ডে হাত রেখে যে যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে তার নাম শিবশংকর। কোলকাতায় জাপানিরা বোমা ফেলবে এমন এক গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর শিবশংকরের বাবা মনিশংকর ছেলেকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আতঙ্কে বাস করার কোনো মানে হয় না। শিবশংকরকে নিয়ে এমনিতেই তিনি আতঙ্কে থাকেন। তার স্বাস্থ্য মোটেই ভালো যাচ্ছে না। অসুখবিসুখ লেগেই থাকছে। শিবশংকরের সঙ্গে তিনি গোপীনাথ বল্লভ নামের একজনকে পাঠিয়েছেন। গোপীনাথ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক। যোগ ব্যায়াম ভালো জানেন। যোগ ব্যায়ামের ওপর তাঁর একটা বই আছে। বইয়ের নাম— 'যোগ ব্যায়াম, নিরোগ শরীর'।

গোপীনাথ বল্লভের দায়িত্ব শিবশংকরের স্বাস্থ্য ঠিক করে দেয়া। এই কাজটা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন। তাঁর নির্দেশেই সূর্য ওঠার আগে শিবশংকরকে উঠতে হয়। খালিপায়ে শিশিরভেজা ঘাসের ওপর একঘণ্টা হাঁটতে হয়। হাঁটার পর পাঁচ মিনিট বজ্রাসন এবং পাঁচ মিনিট শবাসন করতে হয়। আসনের পর

ভরপেট পানি খেয়ে গলায় আঙুল দিয়ে সেই পানি বমি করে উগরে ফেলতে হয়। এই পদ্ধতির নাম পাকস্থলী ধৌতকরণ।

ধৌতকরণ শেষ হবার পর এক কাপ চিরতার পানি এবং মধু দিয়ে মাখিয়ে এক কোয়া রসুন খেতে হয়। রসুন খাবার পর আবার পাঁচ মিনিটের জন্যে শবাসন।

জটিল নিয়মকানুন। শিবশংকর প্রতিটি নিয়ম নিখুঁতভাবে পালন করে। তার প্রকৃতিটাই এমন যে, সে যা করে নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করে। যেন তাকে গণিতের একটা সূত্র দেয়া হয়েছে। তাকে থাকতে হবে সূত্রের ভেতরে। তবে পায়ে শিশির মাখানোর একটা পর্যায়ে সে হরিচরণের কবরের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রণামের ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। আমগাছটার চারদিকে চক্কর দেয়। এই চক্কর দেয়ার মধ্যেও সে অংক নিয়ে এসেছে। ফিবোনাচ্চি রাশিমালায় চক্কর। প্রথম দিনে এক চক্কর, দ্বিতীয় দিনে এক চক্কর। তৃতীয় দিনে ২ বার, চতুর্থ দিনে ৩ বার।

ফিবোনাচ্চি রাশিমালা হলো, ১ ১ ২ ৩ ৫ ৮ ১৩ ২১ ... । এই রাশিমালায় যে-কোনো সংখ্যা আগের দু'টি সংখ্যার যোগফল। শিবশংকর আজ ১৩ সংখ্যায় পড়েছে। আমগাছ ঘিরে সে চক্কর দিচ্ছে। দূর থেকে দৃশ্যটা দেখলেন মাওলানা ইদরিস। তিনি কাছে এসে অবাক হয়ে বললেন, কে?

শিবশংকর জবাব দিল না। যন্ত্রের মতো ঘুরতে লাগল। তের প্রদক্ষিণ শেষ করে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আমার নাম শিবশংকর।

তুমি মনিশংকর বাবুর ছেলে? কেমন আছ বাবা?

ভালো আছি।

গাছের চারদিকে ঘুরছ কেন?

এম্নি। কাকু, আপনি ভালো আছেন?

ভালো আছি বাবা। আমাকে চিনেছ?

কেন চিনব না! এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলেন?

নদীর ঘাটে গিয়েছিলাম। এম্নি গিয়েছিলাম, কোনো কাজে না।

শিবশংকর অস্পষ্ট গলায় প্রায় বিড়বিড় করে বলল, প্রতিটি মানুষের কাজকর্মের ত্রিশভাগ অর্থহীন।

মাওলানা বললেন, কথাটা ভালো বলেছ তো। তবে কিছু মানুষের জন্যে এটা ঠিক না। হরিচরণ বাবু জীবনে কখনো অর্থহীন কাজ করেন নি।

শিবশংকর বলল, আপনি তো তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেন নি। কাছ থেকে দেখলে হয়তোবা জানতেন তাঁর জীবনের ত্রিশভাগ কাজ অর্থহীন।

তুমি পড়াশোনা কী করছ?

কলেজে ভর্তি হয়েছি।

মেট্রিকে তো খুব ভালো করেছিলে। স্বর্ণপদক পেয়েছিলে। মনিশংকর বাবু এই উপলক্ষে সবাইকে খানা দিলেন। তোমারও আসার কথা ছিল।

হঠাৎ শরীর খুব খারাপ করল, আসতে পরলাম না। আমার শরীর ভালো না। প্রায়ই অসুখবিসুখ হয়।

হরিচরণ বেঁচে থাকলে তোমার কারণে আনন্দ পেতেন। তিনি যে তোমার অসুখ ভালো করেছিলেন, এটা কি তোমার মনে আছে?

শিবশংকর নিচু গলায় বলল, মনে আছে। তবে তিনি আমার অসুখ সারান নি, এই ক্ষমতা মানুষের নাই। আমি ভালো হয়েছি আপনাআপনি। মানুষের শরীরে নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাই কাজ করেছে।

মাওলানা বললেন, বাবা যাই?

শিবশংকর দুই হাত জোড় করে মাথা খানিকটা নিচু করে বলল, নমস্কার।

হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি এই আদব দেখায় না। মুসলমানরাও দেখায় না। বিধর্মী কাউকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে না। তিনি নিজে বলতে কোনো বাধা দেখেন না। 'আসসালামু আলাইকুম'-এর অর্থ— তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বাড়ছে। কেন বাড়ছে তিনি জানেন না। উড়া উড়া শোনা যাচ্ছে— মুসলমানদের জন্যে আলাদা দেশ হবে, হিন্দুদের জন্যে আলাদা দেশ। মুসলমানের দেশে কোনো হিন্দু থাকতে পারবে না। মন্দির থাকতে পারবে না। সব মন্দির শুদ্ধ করে মসজিদ বানানো হবে। হিন্দু দেশেও একই ব্যবস্থা। তবে তাদের ব্যবস্থা আরেকটু জটিল। হিন্দুরাজ্যে ভাগ ভাগ থাকবে— এক ভাগে ব্রাহ্মণ, আরেক ভাগে ক্ষত্রিয় ...। শুধু অস্পৃশ্যদের জন্যে আলাদা দেশ হবে। অস্পৃশ্যরা সেই দেশে থাকবে। সেই দেশের নামও না-কি ঠিক হয়েছে 'হরিজন দেশ'। নামটা দিয়েছেন মহাত্মা গান্ধি। তিনি হবেন হরিজন দেশের রাজা।

গত কয়েকদিন ধরে জুম্মাঘরের টিনের ছাদে একটা শকুন বসছে। এটা ভালো লক্ষণ না। অতি অশুভ লক্ষণ। কে জানে বান্ধবপুর হয়তো হিন্দুরাজ্যে পড়বে। তারা মসজিদটাকে মন্দির বানিয়ে ফেলবে। সন্ধ্যাবেলায় মসজিদ থেকে আজানের শব্দ আসবে না। কাঁসার ঘণ্টার শব্দ আসবে।

মাওলানা ইদরিস অবেলায় খেতে বসেছেন। চারটা প্রায় বাজে। আসরের নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে। আসরের আজান পড়ে গেলে আর খাওয়া যাবে না। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত খাওয়া নিষেধ। এই সময়ে কেয়ামত হবে বলেই খাওয়া-খাদ্যে মন না দিয়ে শেষ বিচারের কথা ভেবে বিষণ্ণ থাকার বিধান আছে। সেই সময় সূর্য নেমে আসবে মাথার এক হাতের মধ্যে। শরীর থেকে ঝরনার মতো ঘাম বের হবে। মানুষ নিজের ঘামের সমুদ্রে ডুবে যাবে। 'ইয়া নফসি! ইয়া নফসি!' বলার ফুরসতও পাবে না।

আজ খানা খেতে এত দেরি হবার কারণ খাওয়া জোগাড় হয় নি। এখন যে জোগাড় হয়েছে তাও বলা যাবে না। কুরানি দিয়ে নারকেল কুরিয়ে এক প্লেট নারকেল এবং লবণ মাখানো দু'টা শসা নিয়ে মাওলানা বসে আছেন। পাশে এক গ্লাস পানি। আলাদা একটা পিরিচে সামান্য লবণ এবং এক টুকরা কাগজি লেবু। লেবু থেকে সুন্দর গন্ধ আসছে। তিনি নিয়মমাফিক প্রথমেই চোখ বন্ধ করে আল্লাহপাককে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বললেন, 'হে গাফুরুর রহিম! তুমি যে তোমার বান্দাকে ভুলে যাও নাই এতেই আমি খুশি। তুমি বান্দার রিজিকের ব্যবস্থা করেছ, এই জন্যে বান্দার আনন্দের সীমা নাই।'

মাওলানা বিসমিল্লাহ বলে লবণ জিভে ছোঁয়ালেন। নবী-এ-করিম (দঃ) জিভে লবণ ছুঁইয়ে খাওয়া শুরু করতেন। প্রতিটি বিষয়ে নবীকে অনুসরণ করা সব মুসলমানের কর্তব্য। তাঁর খাবার সময় জুলেখা সামনে থাকে। আজ জুলেখা নেই। সে পাশের ঘরে কী যেন করছে— খুটখাট শব্দ আসছে। মাওলানা ডাকলেন, জুলেখা!

জুলেখা সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখ-মুখ কঠিন। একটু আগে সে যে কেঁদেছে, এটা বোঝা যায়। গালের পানির দাগ শুকিয়ে আছে। মাওলানা বললেন, অতি তৃপ্তি সহকারে খানা খাচ্ছি।

জুলেখা বলল, আপনার মুখে রুচি বেশি— যাই দিব তাই তৃপ্তি নিয়া খাবেন। আমপাতা সিদ্ধ করে দিলে আমপাতা খেয়েও বলবেন, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

মাওলানা বললেন, আজকের খাওয়া নিয়া তুমি মনঃকষ্টে আছ, এইটা বুঝতে পারতেছি। মনঃকষ্টে থাকবা না— আল্লাহপাক নারাজ হবেন।

নারাজ হবেন কেন ?

কারণ তিনি রিজিকের মালিক। তাঁর ঠিক করে দেয়া রিজিক দেখে মন খারাপ করলে তিনি নারাজ হবেন না ?

জুলেখা তীব্র গলায় বলল, নারাজ হলে হবেন। আমি মনে কষ্ট নিয়া থাকব।

মাওলানা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তুমি যে মনঃকষ্টে থাকবা এইটাও কিন্তু তার বিধান। তিনি সূরা বনি ইস্রাইলে বলেছেন, 'আমি তোমাদের ভাগ্য তোমাদের গলায় হারের মতো ঝুলাইয়া দিয়াছি। ইহা আমার পক্ষে সম্ভব।' তুমি যে মনে কষ্ট পেয়েছ, এইটাও তোমার গলার হারে লেখা ছিল বলেই পেয়েছ।

জুলেখা বলল, আমি যদি আজ সন্ধ্যায় আপনার বাড়ি ছেড়ে চলে যাই, সেটাও কি গলার হারে লেখা ?

মাওলানা বললেন, তুমি কোথায় যাবে ?

আমি আগে যে প্রশ্ন করেছি তার জবাব দেন।

মাওলানা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি যা করবে সবই তোমার ভাগ্যে লেখা।

জুলেখা বলল, আমি আপনারে ফালায়া চইলা গেলে আপনি রাগ করতে পারবেন না। এইটা আমার ভাগ্যে লেখা ছিল।

মাওলানা শসায় কামড় দিলেন। জুলেখা তাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। সে যে চলে যাবার কথা বলছে— এটা কতটুক সত্যি তাও বুঝতে পারছেন না। পোয়াতি অবস্থায় অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক চিন্তা মাথায় আসে। বিচিত্র সব কাজ করতে ইচ্ছা করে। জুলেখার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার ব্যাপারটা এরকম কিছুই হবে। সে যাবে কোথায় ? তার যাবার জায়গা কই ?

জুলেখা বলল, বেশ কিছু দিন ধরে আমি ঠিকমতো খাওয়া-খাদ্য করতে পারতেছি না। কারণ ঘরে খাওয়া নাই। পেটের সন্তানটার জন্যে আমার ভালো খানা দরকার। এই সন্তান আমার অনেক কষ্টের। এর অযত্ন হইতে আমি দিব না। সেই জন্যেই আপনারে ছেড়ে যাব।

মাওলানা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি কই যাবে ? খাওয়া-খাদ্য কে তোমারে দিবে ?

জুলেখা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, আল্লাহপাক দিবেন, তবে অন্যের মাধ্যমে দিবেন।

অন্যটা কে ?

সেটা আপনার জানার প্রয়োজন নাই।

মাওলানার মুখে খাওয়া এখন রুচছে না। খাওয়া ফেলে উঠে পড়তেও পারছেন না। এতে রিজিকের অসম্মান হয়। আল্লাহপাক রিজিকের অসম্মান পছন্দ করেন না। রিজিকের অসম্মান এক অর্থে তাঁরই অসম্মান।

জুলেখা বলল, একটা সোনার নাকফুল আর আটটা রুপার চুড়ি বিছানার উপর রেখেছি। খাওয়া শেষ করে এগুলি নিয়া বাজারে যাবেন। বিক্রি করে চাল, ডাল, তেল কিনবেন।

মাওলানা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আচ্ছা। তিনি এখন নিশ্চিত হয়েছেন জুলেখা কোথাও যাবে না। তিনি শশার ওপর কাগজি লেবুর রস দিলেন। শশায় কামড় দিলেন। কী স্বাদ ! আল্লাহ্‌পাকের মহিমা। সামান্য শশায় তিনি বেহেশতি খানার স্বাদ দিয়েছেন।

বান্ধবপুর বাজারে বিরাট উত্তেজনা। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু পালিয়ে গেছেন। ইংরেজ সরকার তাকে গৃহবন্দি করে রেখেছিল। অসংখ্য গোরা পুলিশ বাড়ি ঘিরে রেখেছিল। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে একটা মাছিরও যেখানে পালাবার উপায় নেই, সেখানে একজন জলজ্যান্ত মানুষ কীভাবে পালাবে ? এই অসাধ্য নেতাজি সাধ্য করেছেন। পুলিশের এখন মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। গোলগাল চেহারার যাকেই পাচ্ছে তাকেই ধরছে। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাস করছে, 'তুম নেতাজি হ্যায় ?'

মাওলানা ইদরিস অবাক হয়েই একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, নেতাজিটা কে ? উনার পরিচয় কী ?

যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে বিরক্ত হয়ে বলল, নেতাজিরে চিনেন না, আপনি থাকেন কই ? জঙ্গলে ?

মাওলানা বিব্রত বোধ করছেন। অনেককে তিনি চিনেন। জিন্নাহ সাবকে চিনেন, মহাত্মা গান্ধিকে চিনেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে চিনেন। নেতাজির নাম এই প্রথম শুনছেন। তিনি যে অতি ক্ষমতাধর ব্যক্তি এটাও বোঝা যাচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলায় এককড়ির দোকানে খবরের কাগজ পাঠ হয়। প্রথমবারের মতো মাওলানা খবরের কাগজের পাঠ শোনার জন্যে দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

পত্রিকা পাঠক গৌরাঙ্গ বললেন, আজকের কাগজের পুরা পাতা গরম খবরে ভর্তি। এত গরম যে, কাগজে হাত দিলেই হাতে ফোসকা পড়ে যাবে। গৌরাঙ্গ কাগজের গরম কমানোর জন্যে ক্রমাগত কাগজে ফুঁ দিচ্ছেন। শ্রোতারা খুবই আমোদ পাচ্ছে। গৌরাঙ্গ বললেন, কোনটা রেখে কোনটা পড়ি ? যুদ্ধের খবরটা পরে পড়ব। গান্ধিজিরও গরম খবর আছে। উনি ডিগবাজি খেয়েছেন।

গান্ধিজির ডিগবাজি

হিটলারের বোমারু বিমানের আক্রমণে লন্ডন নগরী

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ায় গান্ধিজি মনক্ষুণ্ণ। তিনি বলিয়াছেন, ব্রিটিশদের ধ্বংস করিয়া ভারতের স্বাধীনতা আমি চাই না।

শ্রোতাদের ভেতর থেকে বিস্ময়ের ধ্বনি উঠল। একজন বলল, গান্ধিজি ইংরেজের পয়সা খেয়েছেন। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

আরেক শ্রোতা বলল, সারাজীবন বলেছে রাম রাম, এখন বলে টেঁ টেঁ। যুদ্ধের খবর শুনি, গান্ধিজি শুইন্যা লাভ নাই। নেতাজি পালায়া কোথায় গেছেন এই বিষয়ে কিছু আছে? এখন আমাদের ভরসা নেতাজি। গান্ধি দিয়া কাম হবে না। শুদ্রের পুলার গালে চুমা দিয়া স্বরাজ আনা যায় না।

গৌরাঙ্গ বললেন, বড় খবর আছে। সবের শেষে পড়ব।

মাওলানা ইদরিস পুরো কাগজ শুনে বাড়ি ফিরে দেখলেন, জুলেখা ঘরে নেই। সন্ধ্যার পর পুকুর থেকে পানি আনার জন্যে আগে পুকুরে যেত। শরীর ভারী হবার পর যাওয়া বন্ধ করেছে। তারপরও মাওলানা পুকুর ঘাটে খোঁজ নিতে গেলেন। সেখানেও জুলেখাকে পাওয়া গেল না।

জুলেখা বাড়িঘর সুন্দর করে গুছিয়ে চলে গেছে। যাওয়ার আগে দু'টা আগরবাতির কাঠি জ্বালিয়েছে। কাঠি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কিন্তু গন্ধ আছে। মন শান্ত করার জন্যে মাওলানা দরুদ পাঠ শুরু করলেন। একাগ্রচিত্তে দরুদ পড়লে অশান্ত মন শান্ত হয়। উন্মাদ রাগ গলে পানি হয়ে যায়। তাঁর প্রচণ্ড ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। চাল ডাল তেল নুন এখন ঘরে আছে। ইচ্ছা করলেই খিচুড়ি বসাতে পারেন। তাঁর সেই ইচ্ছা করছে না। তিনি নৌকাঘাটায় গেলেন। জুলেখা নৌকা নিয়ে কোথাও গেলে ঘাটের মাঝিরা বলতে পারত। মাঝিরা কেউ কিছু বলতে পারল না।

লাবুস হরিচরণের বাড়িতে থাকতে শুরু করেছে। প্রথম দিন সে একাই ছিল, দ্বিতীয় দিনে একজনকে চাকরি দেয়া হলো। সে মহা উৎসাহে কাজে লেগেছে। তার নাম হাদিস উদ্দিন, মধ্যবয়স্ক ছোটখাটো মানুষ। পোলিওর কারণে একটা পা অশক্ত। সে চলে লেংচাতে লেংচাতে। বাজারে তাকে ডাকা হতো ব্যাঙউদ্দিন। কারণ সে নাকি ব্যাঙের মতোই লাফিয়ে চলে। এই পর্যন্ত তার জীবন কেটেছে ওস্তাদ চোর দরবার মিয়ার সাগরেদি করে। বছরখানেক ধরে দরবার মিয়া নিখোঁজ বলে সে কর্মশূন্য। বাজারে এর-তার দোকানের বারান্দায় তার খেয়ে না-খেয়ে দিন কাটছিল। চোরের সাগরেদকে কেউ চাকরি দেয় না।

লাবুস দিয়েছে। সে কয়েকবারই লাবুসকে বলেছে, আর কাউকে লাগবে না। কাজ যা আছে আমি একাই পারব। আমার হাত দশটা। দুইটা দেখা যায়। বাকি আটটা দেখা যায় না।

হাদিস উদ্দিন লোকটি আসলেই কাজের। সে ঘরদুয়ার মোটামুটি গুছিয়ে ফেলেছে। উঠানে কোমর সমান ঘাস গজিয়েছিল। ঘাস কাটা হয়েছে। টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে পড়ে ছিল। সেতাবনগর থেকে টিউবওয়েলের কারিগর এনে কল সারিয়েছে। হাদিস উদ্দিন রান্নাবান্নাতেও দক্ষ। সে লাবুসকে প্রথমদিনই বলেছে, আপনে খাইতে বসবেন চটি জুতা হাতে নিয়া। খাইতে গিয়া যদি দেখেন লবণ হয় নাই, কোনো একটা পদ খারাপ হয়েছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে চটি জুতা দিয়া গালে বাড়ি দিবেন। ভালো হইলে কিছু বলার নাই, খারাপ হইলে চটি জুতা।

লাবুস পুকুরঘাটে বসে আছে। সে সন্ধ্যা থেকেই বসে আছে। এখন রাত আটটা। আকাশে পরিষ্কার চাঁদ উঠেছে। চাঁদের ছবি পড়েছে পুকুরে। সুন্দর লাগছে দেখতে। কোনো বাতাস নেই বলে পুকুরের পানি নড়াচড়া করছে না। লাবুস যেখানে বসেছে, সেখান থেকে আকাশের চাঁদ এবং পুকুরের চাঁদ দু'টাকেই একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত লাগছে। আশেপাশে কোথাও কেয়া ফুল ফুটেছে। তার তীব্র সুবাসও নাকে এসে লাগছে।

হাদিস উদ্দিন লাবুসের পাশে ফর্সি হুক্কা রাখতে রাখতে বলল, ছোটকর্তা, তামুক খান।

লাবুস বলল, আমি তামাক খাই না।

হাদিস উদ্দিনের মনটাই খারাপ হয়ে গেল। সিন্দুক ঘাঁটতে গিয়ে হুক্কার সন্ধান সে আজ সকালেই পেয়েছে। সারা দুপুর তেঁতুল দিয়ে ঘষে ঘষে রুপার হুক্কা ঝকঝকে করা হয়েছে। এক ফাঁকে তামাক টিক্কা আনতে তাকে বাজারে যেতে হয়েছে। সবচে' ভালো তামাকই এনেছে। মেশকে আম্বুরী। তার ওস্তাদ দরবার মিয়া এই তামাক খুব পছন্দ করতেন।

হাদিস বলল, হুক্কা নিয়া যাব ? না-কি একটা টান দিয়া দেখবেন ঘটনা কী ? ভালো লাগতেও পারে।

টান দিব না।

খানা কখন খাবেন ছোটকর্তা ?

দেরি আছে। আরেকটা কথা, তুমি আমাকে ছোটকর্তা ডাক কেন ? বড়কর্তাটা কে ?

হাদিস বলল, আপনিই বড়কর্তা। বয়স কম বলে ছোটকর্তা বলি। আপনি নিষেধ করলে আর ছোটকর্তা বলব না।

নিষেধ করছি না। তোমার যা ইচ্ছা ডাকবে।

হাদিস ছোট্ট একটা মিথ্যা কিছুক্ষণ আগে বলেছে। সচরাচর মিথ্যা কথা সে বলে না। তার কাছে বড়কর্তা দরবার মিয়া। আর কাউকে বড়কর্তা ডাকা তার পক্ষে অসম্ভব।

হাদিস ইতস্তত করে বলল, দুইটা মিনিট আপনার সঙ্গে কথা বলব ?

বলো।

এই বাড়িতে যে একটা গুপ্তঘর আছে আপনি জানেন ?

লাবুস বলল, জানি। হরিকাকু আমাকে দেখিয়েছিলেন। কোলে করে গুপ্তঘরে ঢুকেছেন। সিন্দুকের ভিতর দিয়ে গুপ্তঘরে যেতে হয়। তুমি সন্ধান কীভাবে পেয়েছ ? সন্ধান পাওয়ার তো কথা না।

হাদিস আগ্রহের সঙ্গে বলল, সিন্দুকে কী আছে দেখতে গেছি, জিনিসপত্র নামাইতেছি— হঠাৎ দেখি সিন্দুকের নিচের তক্তার এক কোনায় একটা আংটা। আংটা টান দিতেই সিন্দুকের তালা খুলে গেল— দেখলাম এক সুরঙ্গ।

সুরঙ্গের ভিতরে ঢুকেছিলা ?

না।

ঢুক নাই কেন ?

আপনারে নিয়া ঢুকব, এইজন্যে ঢুকি নাই।

ও আচ্ছা। এখন তুমি যাও।

রাতে কি সুরঙ্গে ঢুকবেন ? ঢুকলে মশাল জ্বালাই। সাপখোপ থাকতে পারে।

রাতে ঢুকব না।

আগামীকাল দিনে কি ঢুকবেন ?

আগামীকালেরটা আগামীকাল চিন্তা করব। আর শোন, আজ রাতে আমি খাব না।

ক্ষুধা হয় নাই ?

ক্ষুধা হয়েছে, কিন্তু খাব না। উপাস দিব।

হাদিস বিস্মিত হয়ে বলল, কেন খামুকা উপাস দিবেন ?

লাবুস বলল, একসময় খাওয়া ছিল না, উপাস দিছি। এখন খাওয়া থাকা সত্ত্বেও উপাস দিব। দুই উপাসের মধ্যে পার্থক্য কী দেখব।

হাদিসের ভুরু কুঁচকে গেল। তার ক্ষীণ সন্দেহ হলো, ছোটকর্তার মাথায় ফর্টিনাইন আছে। মাথা ফর্টিনাইন লোকের সাথে কাজ করা মুশকিল। তারা চলে ঝোঁকের মাথায়। তার ওস্তাদ দরবার মিয়ার মাথার মধ্যেও ফর্টিনাইন ছিল। কোনো চোর পূর্ণিমার রাতে চুরিতে বের হয় না। তার ওস্তাদ বের হতেন। হাসি মুখে বলতেন, আন্ধাইরে চুরি করব কোন দুঃখে ?

লাবুস হাদিস উদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার এখানে কাজ নেয়ার আগে তুমি তো অনেকদিন বাজারে ছিলে।

জি।

তোমার জানামতে বাজারে কেউ কি আছে যে প্রায়ই অভাবের কারণে না খেয়ে থাকে ?

একজন আছে। রামায়ণ পাঠ করে— শ্রীনাথ। কাজকর্ম পায় না। পেরায়ই এক দুই বেলা না খায়া থাকে। কী জন্যে জানতে চান ?

এম্নি। তুমি এখন যাও।

রাতে সত্যই খাবেন না ?

না।

এইখানে কতক্ষণ বইসা থাকবেন ?

বুঝতে পারছি না।

চাঁদ অনেক ওপরে উঠে গেছে। লাবুস একই সঙ্গে দু'টা চাঁদ এখন আর দেখতে পারছে না। কেয়া ফুলের গন্ধ এখনো আছে। গন্ধ তীব্র হয়েছে। লাবুসের মনে হলো, একসঙ্গে কয়েক'শ কেয়া ফুল ফুটেছে।

ছোটকর্তা তাকে চলে যেতে বলেছেন। হাদিস চলে যায় নি। একটু দূরে শিমুলগাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে। লুকিয়ে থাকার ব্যাপারে সে ওস্তাদ। বড়কর্তা দরবার মিয়া তাকে লুকিয়ে থাকার কৌশল শিখিয়েছেন। হাতেকলমে শিখিয়েছেন।

ল্যাংড়া, মন দিয়া শোন কী বলি। সাদা রঙ থাইকা একশ হাত দূরে থাকবি। সাদা রঙ দূর থাইকা দেখা যায়। সাদা রঙের কাপড় গেঞ্জি সব 'নট'। লুকায়া যখন থাকবি হাসবি না। হাসলে দাঁত বাইর হবে, দূর থাইকা দাঁত দেখা যাবে। বুঝছস ?

বুঝছি।

চোখ কখনো পুরা খুলবি না। পিটপিট কইরা দেখবি। কী জন্যে বল দেখি ?

জানি না বড়কর্তা।

আরে গাধা, চোখে সাদা অংশ আছে। দূর থাইকা চোখের সাদাও দেখা যাবে। জন্তু জানোয়ারের দিকে নজর কইরা দেখবি। তারার চোখে কোনো সাদা অংশ নাই। কী জন্যে বল দেখি ?

জানি না বড়কর্তা।

এক জন্তু যেন আরেক জন্তুরে দূর থাইকা না দেখে এই জন্যে এমন ব্যবস্থা। দেখলে একজন আরেকজনের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়বে।

বাহ্।

গাছের আড়ালে যখন লুকাবি ঘাপটি মাইরা বইসা থাকবি না। দুই হাতে গাছ জড়ায়ে শরীর মিশায়ে থাকবি। তোর সামনে দিয়া লোক যাবে তোরে দেখবে না। ভাববে গাছের গুড়ি।

হাদিস এখন অবশ্যি গাছ জড়িয়ে ধরে বসে নেই। গাছে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে। পুরনো দিনের কথা ভাবছে। বড়কর্তার সঙ্গে কী সুখের সময়ই না কেটেছে! সেইসব দিন কি আর আসবে ? এই বাড়িতে কত সুন্দর সুন্দর জিনিস। সুরঙ্গের ভেতরে কী আছে কে জানে। জিনিসপত্রের সব হিসাব সে চোখে চোখে রাখছে। বইয়ের কাপড় দিয়ে মোড়ানো এক পোয়া ওজনের একটা কৃষ্ণমূর্তি পেয়েছে। সে সরিয়ে ফেলেছে। তার ধারণা জিনিসটা সোনার। ওস্তাদ দরবার মিয়া থাকলে অন্ধকারেও মূর্তি হাতে নিয়ে বলতে পারতেন জিনিসটা সোনার না রুপার, নাকি তামার। সে বুঝতে পারছে না। বুঝতে হলে স্বর্ণকারের দোকানে নিয়ে যেতে হবে। লোক জানাজানি হবে। কী দরকার, তাড়াহুড়োর কিছু নাই। ওস্তাদ দরবার মিয়া বলতেন— এক কদম ফেলে যে এক মিনিট চিন্তা করে দ্বিতীয় কদম ফেলবে সে-ই দুনিয়ার সবচে' বড় দৌড়বিদ।

পুকুরে ধুপ করে শব্দ হলো। মাছে ঘাই দিল বলে মনে হয়। হাদিস গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে ভয়ে এবং আতঙ্কে বসে গেল। ঘাটের সিঁড়িতে দু'জন মানুষ পাশাপাশি বসে আছে। দুইজন একই ব্যক্তি— ছোটকর্তা লাবুস। এতে কোনো ভুল নাই। হাদিস চোখ বন্ধ করে তিনবার বলল, 'আল্লাহু শাফি! আল্লাহু কাফি'। জিন-ভূতের ব্যাপার হলে এখন চোখ মেললে কিছু দেখবে না। হাদিস চোখ মেলল। এখনো দুজনকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় দুজনেরই ছায়া পড়েছে ঘাটে। সেই ছায়াও দেখা যাচ্ছে। দু'জন যে একই দিকে তাকিয়ে আছে তাও না। একজন তাকিয়ে আছে পুকুরের দিকে, অন্যজন পাকাবাড়ির দিকে।

হাদিসের দমবন্ধের মতো হলো। বুকে ব্যথা শুরু হলো। সে দু'হাতে বুক চেপে ধরে নিজের অজান্তেই কাঁপা গলায় ডাকল, ছোটকর্তা! দু'জনই একসঙ্গে তাকাল তার দিকে। একজন মিলিয়ে গেল। অন্যজন রইল।

লাবুস বলল, কিছু বলবে ?

হাদিস কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ঘরে চলেন ছোটকর্তা। কী কারণে জানি ভয় লাগতেছে।

লাবুস উঠে দাঁড়াল। ঘরের দিকে রওনা হলো। হাদিস এখনো গাছের আড়াল থেকে বের হতে পারছে না। তার হাত-পা জমে গেছে।

রাত অনেক হয়েছে। বান্ধবপুর জামে মসজিদের ইমাম করিম সাহেব তাঁর বাড়ির উঠানে কাঠের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটু দূরে মাটিতে যে বসে আছে তার আসল নাম মজনু। লোকে তাকে ডাকে মজু গুণ্ডা। যদিও কেউ তাকে কখনো গুণ্ডামি করতে দেখে নি। মজু গুণ্ডা অতি বলশালী ব্যক্তি, বিশাল শরীর। সেই তুলনায় মাথা অস্বাভাবিক ছোট। চোখ বড় বড়। চোখের সাদা অংশ সবসময় লাল থাকে।

মজুর হাতে বিড়ি। সমীহ্ করে প্রতিবারই মাথা ঘুরিয়ে বিড়িতে টান দিচ্ছে। প্রতিবার বিড়িতে টান দেয়ার আগে খাঁকারি দিয়ে থুথু ফেলছে।

করিম মজু গুণ্ডাকে ধর্মকথা শোনাচ্ছে। মজু গুণ্ডাকে দেখে মনে হচ্ছে সে আগ্রহ নিয়ে ইমাম সাহেবের কথা শুনছে।

মজু!

জে বলেন।

সবচে' বড় সোয়াবের কাজ কী জানো ? কাফের মারা। ধর তুমি নামাজ কালাম পড় না। রোজা রাখ না। জুম্মার নামাজে সামিল হও না। তারপরেও একজন কাফের তুমি ধ্বংস করলা। তোমার হাতে বেহেশতের দরজার চাবি চইলা আসল। সেই চাবি দিয়া তুমি নিজেই বেহেশতের দরজা খুলবা। সত্তুরজন হুর এবং ত্রিশজন গেলমান গেটের বাইরে সোনার সিংহাসন নিয়া তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে। তুমি ঢোকা মাত্র তারা গোলাপজলের পানি দিয়া তোমাকে গোসল করাবে। রেশমি কাপড় পরায়ে সিংহাসনে বসাবে। বাদ্যবাজনা করে নিয়ে যাবে। বুঝেছ ?

হুঁ।

অন্য ধর্মের কাফেরের চেয়ে নিজ ধর্মে যদি কেউ কাফের থাকে সেই কাফের ধ্বংস করার সোয়াব দশগুণ বেশি। কারণ একটাই— অন্য ধর্মের কাফের ইসলামের যে ক্ষতি করবে, ইসলাম ধর্মের ভেতরে থাকা কাফের তার চেয়ে দশগুণ বেশি ক্ষতি করবে।

মজু গুণ্ডা এক দলা থুথু ফেলে বলল, কারে খুন করতে হবে বলেন। এত প্যাচাল পাড়ার দরকার নাই। নগদ একশ' টেকা দিবেন। কার্য সমাধা করে দিব। কাকপক্ষীও জানবে না। কার্য সমাধা হওয়ার পরে আমি দুইমাস বাইরে থাকি। এই দুই মাসের খরচ আলাদা।

করিম অবাক হয়ে বললেন, মানুষ খুন করার কথা আসল কী জন্যে ? আমি তোমাকে পাপ-পুণ্যের বিষয়ে কথা বলতেছি।

মজু উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলতে তুলতে বলল, যাই। টাকার জোগাড় যদি হয় খবর দিয়েন।

মজু রওনা দিয়েছে। একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না। করিম হতাশ গলায় বললেন, একশ' পারব না। এত টাকা আমার নাই। পঞ্চাশে কি সম্ভব ?

না।

ধর পঞ্চাশ এখন দিলাম। তুমি কার্য সমাধা করলা। তারপরে ধীরে সুস্থে যখন যা পারি তা দিয়া একশ' পুরা করলাম।

মজু আবারো থুথু ফেলে মুখ মুছতে মুছতে বলল, পুরা টেকা জোগাড় কইরা খবর দিবেন। দুই মাসের রাহাখরচ আলাদা। খুন হবে নগদ। টেকাও দিবেন নগদ।

করিম উঠানে বসে আছেন। মজু গুণ্ডার দেখাদেখি তার মুখেও ক্রমাগত থুথু জমছে। হারামজাদা লাবুসটাকে শাস্তি না দিয়ে তিনি বেহেশতে গেলেও শান্তি পাবেন না। এই হারামজাদার কারণে তাঁকে ন্যাংটা হয়ে দৌড়াতে হয়েছে। শুরুতে ভেবেছিলেন ঘটনা কেউ দেখে নি। ঘাটের দুই একজন মাঝি যে দেখেছে এই বিষয়ে তিনি এখন নিশ্চিত। লোকজন আড়ালে তাকে 'ন্যাংটা মাওলানা' ডাকে। এই অপমান সহ্য করার মানুষ তিনি না। করিমের মুখে আবার থুথু জমেছে। তিনি ঠিক মজু গুণ্ডার মতোই থুথু ফেললেন। মানুষ অনুকরণ প্রিয়।

শরিফা ঘরের ভেতর থেকে ডাকল, ভিতরে আসেন। ঘুমাইবেন না ?

করিম বিরক্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন। জবাব দিলেন না। শরিফা এগিয়ে গেল।

করিম বললেন, তোমারে তখন ঘর থাইকা বাইর হইতে নিষেধ করছি না ?

শরিফা বলল, উঠানে কেউ নাই, আপনি একা। একটা কথা জিজ্ঞাস করব ?

কর।

কিছুদিন যাবৎ দেখতাছি আপনি পেরেশান। কী হইছে ?

করিম ইতস্তত করে বললেন, জিন খোররম বড় ত্যক্ত করতেছে। তার কারণে পেরেশান।

আবার দেখা পাইছেন ?

হুঁ।

ভালো কোনো মাওলানার কাছ থাইকা তাবিজ আইনা পরেন।

আমার চেয়ে বড় মাওলানা এই অঞ্চলে কে আছে ?

শরিফা বলল, নিজের তাবিজ সবসময় নিজের জন্য কাজ করে না। মাওলানা ইদরিসের কাছ থাইকা তাবিজ নেন। শুনেছি তিনি সুফি মানুষ।

করিম বিরক্ত গলায় বলল, শোনা কথায় কান দিবা না। ইদরিস বিরাট বদ। এক নষ্টামাগিরে নিয়া কিছুদিন সংসার করছে। সেই মাগি পেট বাধায়া এখন আছে নটিবাড়িতে। সন্তান খালাস কইরা আবার পুরান ব্যবসা শুরু করব।

আপনারে কে বলছে ?

কেউ বলে নাই, আমি জানি।

শরিফা বলল, কেউ না বললে আপনি কেমনে জানবেন ? আপনি কি গেছিলেন নটিবাড়িতে ?

করিম স্ত্রীর স্পর্ধা দেখে অবাক হলেন। তিনি চিন্তাই করতে পারেন নি শরিফা এই ধরনের কথা বলতে পারে। তার রাগ চরমে উঠে গেলেও রাগ দ্রুত কমালেন। সহজ গলায় বললেন, তুমি বিরাট বেয়াদবি করেছ। যাই হোক, ক্ষমা করলাম। এমন বেয়াদবি আর করবা না। ভাত দাও।

মাওলানা খেতে বসেছেন। শরিফা সামনে বসে গরম ভাতে পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। আজকের আয়োজন ভালো। করিমের পছন্দের পাবদা মাছ। হাওরের লালমুখা বড় পাবদা। ঝোল ঝোল করে রান্না। শরিফা পাতের এক কোনায় আদা সরিষা বাটা দিয়া রেখেছে। তরকারির সাথে এই জিনিস মিশিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগছে। করিম বলল, তুমি রান্দা শিখেছ ভালো। এই বিষয়ে কোনো ভুল নাই। রান্দা কার কাছে শিখেছ ? শাশুড়ি আম্মার কাছে ?

শরিফা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আগ্রহের সাথে বলল, আচ্ছা জিন কি ভাত-মাছ খায় ? মিষ্টি খাইতে পছন্দ করে, এইটা আমি শুনেছি। ভাত-মাছ খায় ?

জানি না।

জিন খোররমের সাথে সাক্ষাৎ হইলে মনে কইরা জিজ্ঞাস কইরা জানবেন।

করিম বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি কি তারে দাওয়াত কইরা খাওয়াইবা ? খামাখা কথা বলো।

শরিফা চুপ করে গেল। তার খুব ইচ্ছা করছিল জিন খোররমের সাথে তার যে সাক্ষাৎ হয়েছিল এই ঘটনাটা বলে। রূপবান এক যুবকের বেশ ধরে সে এসেছে। নিজের নাম সে খোররম বলে নাই। অন্য কী যেন বলেছে। এখন মনে নাই। তাকে সে মা বলেছে। পাটিতে বসে খানা খেয়েছে। এত বড় একটা ঘটনা কাউকে বলার উপায় নাই।

খাওয়া শেষ করে করিম পান মুখে দিলেন। শরিফা বলল, এত বড় পাবদা মাছ আমি কই পাইলাম জিজ্ঞাস করলেন না ?

করিম পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, তোমার ভাইজান পাঠাইছেন। হাওরের মাছ আর কে পাঠাবে!

ধরেছেন ঠিক। ভাইজান নিজেই এসেছিলেন। পাঁচ মিনিট বসেন নাই। লঞ্চ ধরতে দৌড় দিয়েছেন। উনি যাবেন কইলকাতা। ছবিঘরে ছবি দেখবেন।

করিম বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি তোমার ভাইরে বললা না ছবিঘরে ছবি দেখা বিরাট গুনার কাজ ?

বলি নাই। ভাইজান আমারে কিছু টাকা দিয়া গেছে। মাছের ব্যবসায় বিরাট লাভ করেছে এইজন্যে।

কত টাকা দিয়েছেন ? সত্য কথা বলবা, তোমার টাকা নিয়া আমি পালায়া যাব না।

একশ' টেকা।

করিম চমকে উঠলেন। সেই চমক শরিফার চোখে পড়ল না।

তোমার ভাইয়ের মন ভালো। একশ' টেকা ভইনরে দিয়েছে সহজ কথা না। তবে শহর বন্দরে গিয়া টাকা নষ্ট করা ঠিক না। অর্থ সঞ্চয়ের জিনিস, অপচয়ের জিনিস না। অপচয়কারী শয়তানের ভাই।

শরিফা বলল, শয়তান আমার ভাইয়ের ভাই হইলে সম্পর্কে আমিও শয়তানের ভইন। আর আমারে বিবাহের কারণে আপনে শয়তানের দুলাভাই। হি হি হি।

করিম কঠিন গলায় বললেন, এইগুলা কেমন কথা ?

তামাশা করলাম।

স্বামী নিয়া তামাশা করবা না। স্বামী তামাশার বিষয় না।

স্বামী কিসের বিষয় ?

ভক্তি শ্রদ্ধার বিষয়। হিন্দু মেয়ের সবই খারাপ। একটা শুধু ভালো গুণ। তাদের পতিভক্তি। হিন্দু মেয়েরা দিন কীভাবে শুরু করে জানো ? স্বামীর পা ধোয়া পানি খাইয়া।

শরিফা বলল, এখন থাইকা আমিও আপনের পা ধোয়া পানি খাব।

তার প্রয়োজন নাই।

অবশ্যই প্রয়োজন আছে। সকালবেলা এক বালতি পানি আইন্যা দিব। আপনে পা ডুবায়ে দিবেন। সারাদিন আমি এই বালতির পানি খাব। দুপুরে এই পানি দিয়া গোসল করব।

অনেক রঙ্গ তামাশা হইছে। এখন যাও, পান আন। পান খাব।

স্ত্রীর উল্টাপাল্টা কথায় করিম যথেষ্টই বিরক্ত। তবে তিনি বিরক্তির প্রকাশ দেখালেন না। তাঁর মাথায় সম্পূর্ণ অন্য চিন্তা।

শ্রীনাথ লাবুসের অধীনে চাকরি নিয়েছেন। নায়েব সর্দার জাতীয় কাজ। আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা। খাজনার কাগজপত্র ঠিক রাখা। শ্রীনাথের জন্যে ঘর দেয়া হয়েছে। শ্রীনাথ শর্ত দিয়েছেন, তাঁর ঘরে কোনো মুসলমান ঢুকবে না। মুসলমানের রান্না কোনো খাবারও তিনি খাবেন না। স্বপাক আহারের ব্যবস্থা।

লাবুস সব শর্ত মেনে নিয়েছে। শ্রীনাথ বললেন, আপনি আমাকে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। দিনের পর দিন উপবাস করতে হয়েছে। অন্নকষ্ট থেকে আপনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। আমি একদিন তার প্রতিদান দিব।

লাবুস বলল, আচ্ছা।

হাদিস উদ্দিন নামে যাকে আপনি চাকরি দিয়েছেন, তার বিষয়ে কি আপনি কিছু জানেন ?

না।

সে বিরাট বড় চোর দরবার মিয়ার শিষ্য। হাদিস উদ্দিন নিজেও বিরাট চোর। তাকে আপনার বিদায় করা প্রয়োজন। আমার পরামর্শ এই মুহূর্তে তারে বিদায় করবেন।

লাবুস বলল, হাদিস উদ্দিনের কারণে আমি আপনাকে চাকরি দিয়েছি। আপনার উপবাসের কষ্টের কথা সে-ই আমাকে বলেছিল।

শ্রীনাথ বললেন, সে আমার উপকার করেছে। এখন আমি আপনার অধীনের কর্মচারী। আমি আপনার স্বার্থ দেখব। তারটা না।

লাবুস বলল, আমার স্বার্থ দেখার প্রয়োজন নাই। আপনি থাকবেন আপনার মতো, সে থাকবে তার মতো। এই বিষয়ে আলোচনা এইখানেই শেষ।

আপনি কিন্তু বিপদ নিয়া বাস করতেছেন।

ঠিক আছে করলাম। এখন আপনি আমাকে হিড়ম্বা রাক্ষসের কাহিনীটা বলেন।

কী বলব?

একদিন দূর থেকে আপনার গলায় রামায়ণ পাঠ শুনেছিলাম। বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। আপনার কণ্ঠস্বর মধুর।

শ্রীনাথ বললেন, হিন্দু ধর্মগ্রন্থের পাঠ শোনা অন্য ধর্মের মানুষদের জন্যে নিষিদ্ধ। যে পাঠ করবে তার পাপ হবে, যে শ্রবণ করবে তারও পাপ।

তাহলে থাক।

তবে মুখস্থ বিদ্যা থেকে পাঠ করায় দোষ নাই। গ্রন্থ সঙ্গে না থাকলে ঠিক আছে।

শ্রীনাথ পাঠ শুরু করলেন—

নিদ্রা যায় নিরুপমা   সুবদনী ঘনশ্যামা
এ রামা   তোমার কেবা হয়।
এ ঘোর দুর্গম বনে,   নিদ্রা যায় অচেতনে,
নাহি জানো   রাক্ষস আলয়।।
তিলেক নাহিক ডর,   যেন আপনার ঘর
অতিশয় দেখি দুঃসাহস।
এই বন অধিকারী,   পাপ আত্মা-দুরাচারী
ভয়ঙ্কর হিড়িম্ব রাক্ষস।।

প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে বলেই সে তার শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষকে নানান রহস্য দিয়ে পৃথিবীতে পাঠায়। সারাজীবন প্রতিটি মানুষ তার রহস্যের খেলা খেলে। প্রকৃতি দাড়িপাল্লায় মেপে সবাইকে সমান রহস্য দেন না। কাউকে বেশিমাত্রায় দেন, যেমন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পাওয়া এই মেধাবী মানুষটির চেহারা রাজপুত্রের মতো। সম্মোহনী ক্ষমতার জন্যেই হয়তোবা গান্ধিজির চেয়েও উঁচুস্থানে আসীন। কংগ্রেসের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তাঁর কোনো মিল নেই। প্রকাশ্যে এই কথা বহুবার বলেও যখন কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্যে ভোটে দাঁড়ান, তিনি ভোটে জিতেন। গান্ধিজি অসহায় বোধ করেন। কারণ তাঁর সমর্থিত প্রার্থী সিতারামাইয়া বিশাল ব্যবধানে পরাজিত।

সুভাষচন্দ্র অতি রহস্যময় মানুষ হলেও তাঁর চিন্তাভাবনায় কখনো রহস্য ছিল না। তাঁর এককথা— ইংরেজ আপনা-আপনি ভারত ছেড়ে যাবে সেই চিজ না। গান্ধিজির সত্যাগ্রহ কিংবা অনশনে তারা টলবে না। বিপ্লবীদের এদিক-ওদিক খুটখাট গুলিবোমাতেও কিছু হবে না। ভারতকে স্বাধীন করতে হলে সশস্ত্র বিপ্লবের ভেতর দিয়ে তা করতে হবে। অহিংসা দুর্বলের অস্ত্র। সুভাষচন্দ্র বসু নিজেকে এবং জাতিকে দুর্বল ভাবতে অভ্যস্ত না।

কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চরমে পৌঁছল। তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লক নামে নতুন রাজনৈতিক দল করলেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক যোগ দিলেন তাঁর সাথে। শেরে বাংলাও চাচ্ছিলেন অখণ্ড ভারত। মুসলিম লীগের সঙ্গে এই কারণেই তাঁর বনছিল না।

সুভাষচন্দ্রের কর্মকাণ্ড ইংরেজ সরকারের মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না। তাদের মাথায় বিশ্বযুদ্ধের ঝামেলা, এই ঝামেলায় সুভাষচন্দ্র বসুর রণহুঙ্কার অসহ্য বোধ হবারই কথা। ইংরেজ তাঁকে গৃহবন্দি করল। তিনি পালিয়ে গেলেন (১৭ জানুয়ারি, সন ১৯৪১)। প্রথমে গেলেন আফগানিস্তান। সেখান থেকে ছদ্মবেশে রাশিয়া, রাশিয়া থেকে জার্মানি।

জার্মানির চ্যান্সেলর হিটলার এই বাঙালির কথাবার্তায় মুগ্ধ। কী তেজ! হিটলারের শত্রু ইংরেজ, এই যুবকের শত্রুও ইংরেজ। একে অবশ্যই সাহায্য করা যায়। সুভাষচন্দ্র বসু সাহসী এক প্রস্তাব করে বসলেন। যে সব ভারতীয় সৈনিক জার্মানদের হাতে বন্দি হয়েছে, তাদের নিয়ে তিনি এক সৈন্যদল গঠন করবেন। এবং এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভারত বিজয়ের উদ্দেশে রওনা হবেন।

হিটলার প্রস্তাবে রাজি হলেন। বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের মুক্তি দেয়া হলো। তারা হিটলারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিল।

এদিকে মালয়ে কাকতালীয় এক ঘটনা ঘটল। জাপানিদের তাড়া খেয়ে ব্রিটিশ বাহিনী দ্রুত পশ্চাদপসরণের চেষ্টা করছে। তাদের নাস্তানাবুদ অবস্থা। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন মোহন সিং। হঠাৎ তাঁর মাথায় এলো ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে পালিয়ে না গিয়ে জাপানি সেনাদের হাতে ধরা দেয়া। তাদের রাজি করিয়ে বন্দি ভারতীয়দের নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। এই যুদ্ধ হবে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ। জাপান রাজি হয়ে গেল। ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের তুলে দিল মোহন সিং-এর হাতে। মোহন সিং ৪৫,০০০ ভারতীয় সৈন্য নিয়ে গঠন করলেন আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনী।

আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর এক সদস্য সিপাহি বৃন্দাবন পাল। তার বাড়ি বান্ধবপুরে। বৃন্দাবন পালের বাবা আনন্দ পাল জানতেন, ছেলে জাপানিদের হাতে বন্দি হয়েছে। হলুদ জাপানিরা ছেলেকে অমানুষিক যন্ত্রণা করছে। যুদ্ধক্ষেত্রে খাবারের অভাব হলে জাপানিরা না-কি প্রায়ই বন্দিদের মেরে তাদের কলিজাও খাচ্ছে। তিনি জাপানিদের ধ্বংস কামনা করে মন্দিরে জোড়া পাঠা বলি দিলেন। পটপরিবর্তনের খবর তিনি জানতেন না।

হলুদ জাপানিরা আমাদের বন্ধু হয়ে গেছে, নেতাজি জার্মান ইউ বোটে করে জাপানের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন। ঠিক হয়েছে জাপানের সেনাবাহিনী এবং মোহন সিং-এর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী একসঙ্গে বার্মা আক্রমণ করে বাংলা ভূখণ্ডের দিকে আসতে থাকবে।

জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে। আজাদ হিন্দ বাহিনীও পিছিয়ে নেই। তারাও যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ব্রিটেন এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে।

এদিকে খবর রটেছে জার্মানির বিজ্ঞানীরা ভয়াবহ এক বোমা বানানোর কর্মকাণ্ড শুরু করেছে। বোমার নাম অ্যাটম বোমা। সামান্য অ্যাটমের ভেতর না-কি লুকিয়ে আছে দৈত্য। সেই দৈত্যকে বের করে আনার চেষ্টা।

আমেরিকানরা গুপ্তচরদের এই খবরে বিচলিত। সত্যি কি এমন কিছু ওরা ঘটাতে যাচ্ছে? জার্মানি থেকে পালিয়ে আসা পদার্থবিদ্যার রথি-মহরথিদের আশ্রয় এখন আমেরিকা। অ্যাটম বোমার গবেষণায় তারা এগিয়ে আসতে পারেন, তবে তার জন্যে রাষ্ট্রের সাহায্য দরকার। আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বুঝাতে হবে যে, অ্যাটম বোমার মতো মারণাস্ত্র প্রয়োজন। বুঝানোর দায়িত্ব নিলেন পদার্থবিদ্যার গুরুদেব আলবার্ট আইনস্টাইন। তিনি নিজে শুধু যে দায়িত্ব নিলেন তা-না, তিনি পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী মানুষদেরকে দিয়েও রুজভেল্টকে বোঝানোর চেষ্টা চালালেন। মহাশান্তির জন্যে প্রয়োজন মহাঅশান্তি অ্যাটম বোমা।

আইনস্টাইনের কারণেই হয়তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শান্তির প্রয়োজনে অ্যাটম বোমা বানানো উচিত বলে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে অনুরোধ করে চিঠি পাঠালেন। আমেরিকায় শুরু হলো দৈত্য বানানোর প্রক্রিয়া। প্রক্রিয়ার নাম— ম্যানহাটন প্রজেক্ট।

ম্যানহাটন প্রজেক্টে অ্যাটম বোমা বানানো চলতে থাকুক, আমরা ম্যানহাটন থেকে ফিরে আসি বান্ধবপুরে। সেখানে কার্তিক মাস। দিন শুরু হচ্ছে ঘন কুয়াশায়। এই বৎসর কুয়াশার একটু বাড়াবাড়ি আছে। এক-এক দিন এমন কুয়াশা হয় যে, একহাত সামনের মানুষও দেখা যায় না। ভরদুপুরে আকাশের দিকে তাকালে যে সূর্য দেখা যায় তা চাঁদের মতো। কুয়াশা সেই সূর্যের তেজ কেড়ে নিয়েছে।

এমনই এক কুয়াশার মধ্যদুপুরে মাওলানা ইদরিস টিউব কল থেকে খাবার পানি নিয়ে ফিরছেন। বাড়ির উঠানে পা দিয়েই শুনলেন বিড়াল কাঁদছে। শোবার ঘরের ভেতর থেকে বিরামহীন বিড়ালের কান্না ভেসে আসছে— মিয়াঁউ মিয়াঁউ মিয়াঁউ। তাঁর বাড়ি কুকুর-বিড়ালশূন্য। তিনি কুকুর-বিড়াল খুবই অপছন্দ করেন। কুকুর অপছন্দ করেন, কারণ আমাদের নবী (দঃ) কুকুর অপছন্দ করতেন। এই যুক্তিতে বিড়াল তাঁর পছন্দ করার কথা। কারণ নবীজির পছন্দের প্রাণী বিড়াল। কিন্তু মাওলানা ইদরিস কুকুরের চেয়েও বেশি অপছন্দ করেন বিড়াল।

মাওলানা বিরক্ত মুখে কিছুক্ষণ উঠানে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ঢুকলেন। পলকহীন চোখে তাঁকে বিছানার দিকে তাকিয়ে থাকতে হলো। বিছানার ঠিক মাঝখানে কাঁথা দিয়ে পুঁটলির মতো করে জড়ানো একটা শিশু। তার দু'পাশে দু'টা বালিশ। তার মাথার কাছে ফিডিং বোতলে এক বোতল দুধ। শিশু হাত-পা ছুড়ছে এবং কাঁদছে ওয়াঁউ ওয়াঁউ। কান্নার এই শব্দকেই মাওলানা বিড়ালের মিয়াঁউ মিয়াঁউ ভাবছিলেন।

ইদরিস গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, জুলেখা! জুলেখা! কেউ জবাব দিল না। তবে শিশুটি কান্না থামিয়ে দিল। মাওলানা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। পৃথিবী এবং বেহেস্ত দুই জায়গাতেই সবচে' সুন্দর বস্তু ফুল। ফুল যত সুন্দরই হোক সে হাসতে পারে না, কাঁদতে পারে না। মুহূর্তে-মুহূর্তে নিজেকে বদলাতে পারে না। সেই অর্থে অবশ্যই মানবশিশু ফুলের চেয়ে সুন্দর। মাওলানা বললেন, এই! এই!

শিশুটি হাত নাড়ল। তার চোখ ঘন কালো এবং গরুর চোখের মতো বড়। চোখের মণিতে আলোছায়ার খেলা। মাওলানা বললেন, নাম কিগো ?

শিশু এবার পা নাড়াল।

মাওলানা আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ছেলে না মেয়ে ? প্রশ্নটিতে শিশু সম্ভবত অপমানিত বোধ করল। সে কাঁদতে শুরু করল। তার গলার স্বর এবার আগের চেয়েও উঁচুতে।

তার কি ক্ষিধে লেগেছে ? ফিডিং বোতল মুখে ধরলে কি খাবে ? দুধ কি বিছানায় শুইয়েই মুখে ধরবেন ? না-কি আগে তাকে কোলে নিয়ে মুখে ধরবেন ? কচি শিশুরা মাছের মতো পিচ্ছিল হয় বলে তাঁর ধারণা। কোলে নিতে গেলে পিছলে পড়ে যাবে না তো! তিনি তাঁর এই দীর্ঘজীবনে কখনো কোনো শিশু কোলে নিয়েছেন এরকম মনে করতে পারলেন না। আহারে, বেচারা হাত-পা নেড়ে কী কান্নাই না কাঁদছে!

মাওলানা বিসমিল্লাহ বলে অনেক আয়োজন করে শিশু কোলে নিলেন। তার মুখের সামনে ফিডিং বোতল ধরামাত্রই তার কান্না থামলো। সে চুকচুক করে দুধ টানছে। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। ঘুমিয়ে পড়ছে না-কি ? সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লে দুধ খাওয়ানো কি বন্ধ করে দেবেন ? সেটাই তো যুক্তিযুক্ত। ঘুমের মধ্যে কেউ খাদ্য গ্রহণ করে না। মানবসন্তান কেন করবে ?

পবিত্র কোরান পাঠ করার সময় মাওলানা যেভাবে দোলেন এখনো তিনি মনের অজান্তে সেভাবেই দুলছেন। শিশুটির দিকে তাকিয়ে মিল দিয়ে দিয়ে বিচিত্র সব কথা বলে যাচ্ছেন—

এই বাবু!
দুধ খাবু ?
মজা পাবু ?
কই যাবু ?
এই বাবু!
তুমি হাবু।
এবং হাবা
মজা পাবা

কই যাবা ?
বনে যাবা ?
বনে বাঘ।
ও আল্লা
বাবুর কী রাগ!

মাওলানার কথাবার্তা মনে হয় শিশুটির পছন্দ হচ্ছে। দুধ খেতে খেতেই সে হাসল। মাওলানা অস্পষ্ট গলায় বললেন, আহারে ! আহারে !! মাওলানার চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। তিনি গভীর আবেগে বললেন, হে রাব্বুল আলামিন, হে গাফুরুর রাহিম! তোমার প্রতি নাদান বান্দা ইদরিসের সালাম।

সন্ধ্যার মধ্যে অনেকেই জেনে গেল জুলেখা তার কন্যাসন্তানকে মাওলানার বাড়িতে ফেলে চলে গেছে। মাওলানা মহাবিপদে পড়েছেন। মাওলানা নিজে থাকেন একবেলা খেয়ে। সেই খাওয়াও সবদিন জোটে না। বাচ্চাটাকে খাওয়াবেন কী ?

কয়েকজন আগ্রহ করে বাচ্চা দেখতে গেল। দূর থেকে দেখল, কাছে গেল না, কোলেও নিল না। এই শিশু অপরূপ রূপবতী হলেও সে মূর্তিমান পাপ ছাড়া কিছু না। তাকে দূর থেকে দেখা যায়, কোলে নেয়া যায় না।

জুলেখা এক বোতল দুধ রেখে গিয়েছিল। সন্ধ্যার আগেই সেই দুধ শেষ হয়ে গেল। বাচ্চা কাঁদতে শুরু করল। তার জন্যে খাবার কীভাবে জোগাড় করবেন মাওলানা ভেবে পেলেন না। তাকে বাড়িতে রেখে খাবারের সন্ধানে কোথাও যাওয়া যাবে না। তিনি যেখানেই যান, তাকে কোলে নিয়েই যেতে হবে। বাচ্চাটার জন্যে কাঁথা দরকার, কাপড় দরকার। সেসবইবা কোথায় পাবেন ? বাচ্চা ঘনঘন পিসাব করছে। কাপড় বদলাতে হচ্ছে। এই মুহূর্তে মাওলানা তাকে নিজের একটা পাঞ্জাবি দিয়ে জড়িয়ে রেখেছেন। বাবু সেই পাঞ্জাবিও ভিজিয়ে ফেলেছে। মাওলানা অস্থির বোধ করলেন। সর্বপ্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব পরম করুণাময় আল্লাহপাকের। নিম্নশ্রেণীর প্রাণের জন্যে তা একশ' ভাগ সত্যি। প্রতিটি পিঁপড়ার খাবারের ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন। মানুষকে তিনি অস্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়েছেন বলে তার খাবার তাকেই সংগ্রহ করতে হয়।

ক্ষুধায় অস্থির হয়ে শিশু খুবই কাঁদছে। মাওলানার চোখ দিয়েও পানি পড়ছে। তাঁর মন বলছে, আল্লাহপাক তাঁকে জটিল এক পরীক্ষায় ফেলেছেন। এই পরীক্ষা থেকে তিনি কীভাবে পরিত্রাণ পাবেন বুঝতে পারছেন না। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই তাঁকে বের হতে হবে। দেরি করা যাবে না।

উঠানে লণ্ঠন হাতে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। ইদরিস বাচ্চা কোলে নিয়ে বারান্দায় এসে দেখেন লাবুস।

লাবুস বলল, বোনকে দেখতে এসেছি। তার নাম কী?

মাওলানা বললেন, নাম জানি না। তার মা কী নাম রেখেছে বলে যায় নাই। তবে তার ইচ্ছা ছিল মেয়ে হলে নাম রাখবে মীরা।

লাবুস বলল, বোনকে আমার কোলে দিন।

বাচ্চা কাঁদছিল। লাবুসের কোলে উঠে কিছুক্ষণের জন্যে তার কান্না থামল। সে কৌতূহলী হয়ে নতুন মানুষটাকে দেখছে। লাবুস বলল, আমি আমার বোনের নাম রাখলাম পুষ্পরানি।

মাওলানা বললেন, তুমি কি এর খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবে? এ ক্ষুধায় অস্থির হয়েছে।

লাবুস বলল, আমি সব ব্যবস্থা করেই আপনাকে নিতে এসেছি।

কী ব্যবস্থা করেছ?

লাবুস বলল, একটা মেয়ে রেখেছি যে পুষ্পরানির দেখাশোনা করবে। আমার বোনের যা যা লাগবে তার সব ব্যবস্থা করেছি।

মাওলানা বললেন, ব্যবস্থা করেছি, ব্যবস্থা করেছি— এমন কথা বলবা না। এতে অহঙ্কার প্রকাশ হয়। ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহপাক। তোমার মাধ্যমে করেছেন।

লাবুস বলল, আমার ভুল হয়েছে। এখন আমার সঙ্গে চলেন।

মাওলানা বললেন, আল্লাহপাকের হিসাব সাধারণ মানুষের বোঝা সম্ভব না। আমি বাচ্চাটাকে কী খাওয়াব কী পরাব ভেবে খুব অস্থির হয়ে ছিলাম। কাঁদতে ছিলাম। আমার একবারও মনে হয় নাই যে, আল্লাহপাক সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

পুষ্পরানি আবার কাঁদতে শুরু করেছে। লাবুস পুষ্পরানিকে কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে রওনা হয়েছে। হারিকেন হাতে নিয়ে মাওলানা আগে আগে যাচ্ছেন। আয়াতুল কুরসি পড়তে পড়তে যাচ্ছেন। ছোট শিশুদের দিকে ভূত-প্রেতের নজর থাকে বেশি। সেই শিশু যদি রূপ নিয়ে আসে তাহলে সমস্যা আরো বেশি হয়। জিনরা সুন্দর মানবশিশু তাদের দেশে নিয়ে যেতে আগ্রহী থাকে বলে তিনি শুনেছেন। মানুষ জিনের বাচ্চা পালতে পারে না, কিন্তু জিন মানুষের বাচ্চা পালতে পারে— এটাও এক রহস্য। জগৎ রহস্যময়।

জামে মসজিদের ইমাম করিম সাহেবের স্ত্রী শরিফা আজ সারাদিন অভুক্ত। এমন না যে ঘরে খাবার নাই। খাবার আছে, কিন্তু সে খেতে পারছে না। ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া তার একশ' টাকা চুরি গেছে। চুরি কখন হয়েছে সে অনেক চিন্তা

করেও বের করতে পারছে না। গত রাতে চুরি হয়েছে এটা পরিষ্কার। তবে চোর একশ' টাকা ছাড়া আর কিছুই নেয় নি। টাকাটা সে রেখেছিল অতি গোপন জায়গায়— শুকনা বড়ুই-এর হাঁড়িতে। টাকার ওপর শুকনা বড়ুই বিছানো। চোর এই গোপন জায়গা থেকে টাকা বের করে নিয়ে গেল কীভাবে কে জানে !

শরিফা ঘটনাটা তার স্বামীকে বলতে পারছে না। তার ধারণা ঘটনা শুনলেই তার স্বামী খুব রাগ করবেন। স্বামীর কাছ থেকে ধমক বা কড়া কথা শুনতে তার একেবারেই ভালো লাগে না। একবার ধমক শুনলে তার কয়েকদিন মন খারাপ থাকে। শরিফা আজ সারাদিনই একমনে পাঠ করেছে— 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।' কারো মৃত্যুসংবাদ শুনলে এই দোয়া পাঠ করতে হয়, আবার কিছু হারিয়ে গেলে এই দোয়া পড়লে হারানো বস্তু ফিরে আসে। এই দোয়া পড়ে সে একবার তার হারিয়ে যাওয়া সোনার নাকফুল খুঁজে পেয়েছিল। উঠান ঝাড়ু দিতে সে শলার ঝাড়ু নিয়ে উঠানে গেছে। হঠাৎ দেখে রোদ পড়ে ঝাড়ুর ভেতর কী যেন ঝকমক করে উঠল। নাকফুল ঝাড়ুর শলায় আটকে ছিল।

রাতে খেতে বসে করিম বললেন, তোমার কি শরীর খারাপ ? চোখ-মুখ শুকনা। জ্বর উঠেছে ?

শরিফা বলল, শরীর ঠিক আছে।

কোনো বিষয় নিয়া কি চিন্তাযুক্ত ?

আপনারে নিয়া চিন্তাযুক্ত।

করিম ভুরু কুঁচকে বললেন, আমারে নিয়া কী চিন্তা ?

শরিফা বলল, জিন খোররম যে আপনারে ত্যক্ত করতেছে এই নিয়া চিন্তা।

করিম বললেন, এইসব নিয়া তুমি চিন্তা করবা না। আমার সমস্যা আমি সমাধান করব। এর মধ্যে সমাধান কিছুটা হয়েছে— মসজিদ থেকে বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা বন্ধন দিয়েছি। ভূত-প্রেত-জিন-পরী এইটুক রাস্তায় আর আসবে না।

বন্ধন দেওনের পরে তার আর দেখা পান নাই ?

দুই দিন দেখেছি— জংলায় হাঁটতেছে, রাস্তায় উঠতে পরে নাই। চেষ্টা নিয়েছে, পারে নাই।

শরিফা বলল, একবার বন্ধন দিলে কতদিন থাকে ?

চন্দ্র তারিখ হিসাবে থাকে। শুক্লপক্ষের প্রথম দিনে বন্ধন দিলে পূর্ণিমা পর্যন্ত থাকে। যাই হোক, কথা চালাচালি বন্ধ। খাওয়া হলো ইবাদত। ইবাদতের সময় কথা বলা যায় না।

শরিফা বলল, ইবাদতের জন্য পুণ্য আছে না ?

করিম বললেন, অবশ্যই আছে।

শরিফা বলল, যে শুকনা মরিচভর্তা দিয়া ভাত খাইতেছে তার পুণ্য বেশি, না-কি যে দশ পদ পোলাও-কোর্মা খাইতেছে তার পুণ্য বেশি ?

করিম বললেন, মরিচভর্তা দিয়া যে খাইতেছে তার পুণ্য অনেক অনেক বেশি।

শরিফা বলল, আমার মনে হয় যে দশ পদ দিয়া খাইতেছে তার পুণ্য বেশি। আরাম কইরা মনের আনন্দে সে খাইতেছে বইলাই পুণ্য বেশি। শুকনা মরিচভর্তা দিয়া যে খাইতেছে সে বেজার হইয়া খাইতেছে।

করিম বিরক্ত হয়ে বললেন, যা জানো না তা নিয়া বাহাস করবা না।

আচ্ছা আর করব না।

বারান্দায় পাটি দেও, জায়নামাজ দেও। আজ রাতে ঘুমাব না। সারারাত ইবাদত বন্দেগি করে কাটাব। ফজরের নামাজ শেষ করে ঘুমাতে যাব।

কেন ?

করিম বিরক্ত হয়ে বললেন, কেন কী ? ইবাদত বন্দেগি করে রাত কাটানোর মধ্যে কোনো কেন নাই। ইবাদত বন্দেগি না করার মধ্যে কেন আছে।

রাত মন্দ হয় নাই। বাজারের কোলাহল বন্ধ হয়েছে। রাত বারোটায় গোয়ালন্দ থেকে শেষ লঞ্চ আসে। সেটাও চলে এসেছে। করিম বারান্দায় জায়নামাজে বসে আছেন। তাঁর হাতে তসবি। জায়নামাজের এক কোনায় কেরোসিনের কুপি। কুপির লাল আলো করিমের মুখে পড়েছে। করিমকে ভীত দেখাচ্ছে। তিনি বারবারই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। আজ একটা বিশেষ রাত। তিনি মজুকে একশ' টাকা দিয়েছেন। মজু বলেছে, সে যেভাবেই হোক আজ রাতেই কার্য সমাধা করে খবর দিয়ে যাবে। তখন তাকে আরো পঁচিশ টাকা দিতে হবে। করিমের পাঞ্জাবির পকেটে পঁচিশ টাকা আছে।

মজু এখনো আসছে না। সে কখন কার্য সমাধা করবে তাও তাঁকে বলে নি। এখন মনে হচ্ছে কার্য সমাধা হবে শেষরাতে। দরজায় খুট করে শব্দ হলো। করিম বিরক্ত হয়ে তাকালেন।

শরিফা ক্ষীণ গলায় বলল, আপনি কি সত্য সত্যই সারারাত জাগবেন ?

দরজার ফাঁক দিয়ে শরিফাকে দেখা যাচ্ছে। করিম অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। রাগী গলায় বললেন, ঘুমাইতে যাও, ইবাদত বন্দেগি করতেছি। এই সময় ত্যক্ত করবা না।

শরিফা ঘুমুতে গেল। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে না আসা পর্যন্ত সে একমনে হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার দোয়া পড়তে লাগল। ভাইজানের দেয়া একশ'টা টাকায় কত কিছুই সে কিনতে পারত।

লাবুস তার বোনের সব ব্যবস্থা ভালোমতোই করেছে। বাগদি পাড়ার এক মেয়েকে আনিয়েছে। তার বয়স ষোল-সতেরো। নাম কালী। কালীর নিজের একমাস বয়েসি মেয়ে গতকাল মারা গেছে। মৃত সন্তানের শোকে সে কাতর। পুষ্পরাণীকে সে লাবুসের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে নিল। বিস্মিত গলায় বলল, হা ভগবান, আমার তুলসির চেহারার মতো চেহারা। হেই মুখ হেই চউখ। একটাই বেশকম— তুলসি ছিল কালা, আর এ চাঁদের মতো ফকফইক্যা।

কালী পুষ্পরানিকে শাড়ির আঁচলের আড়ালে নিয়ে নিয়েছে। পুষ্পরানি চুকচুক করে দুধ খাচ্ছে। কালীর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। এই অশ্রু আনন্দের না বেদনার কে বলবে?

মাওলানা ইদরিস লাবুসের কাছে হিন্দু মেয়ের বুকের দুধ খাওয়া নিয়ে ক্ষীণ আপত্তি তুললেন। লাবুস বলল, দুধের কোনো হিন্দু-মুসলমান নাই। হিন্দু-মুসলমান মানুষের চিন্তায়। দুধের চিন্তার শক্তি নাই।

লাবুসের কথায় মাওলানা হকচকিয়ে গেলেন। ধর্ম নিয়ে এইভাবে তিনি কোনোদিন চিন্তা করেন নি। এই দিকে চিন্তা করা যেতে পারে।

পাকা দালানের দক্ষিণের সর্বশেষ ঘরটায় মাওলানার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। খাটে জাজিমের বিছানা। বিছানায় ফুলতোলা চাদর। খাটের পাশের টেবিলে কাসার জগভর্তি পানি, একটা কাসার গ্লাস। সবই ঝকঝক করছে।

হাদিস উদ্দিন মাওলানাকে খুবই খাতির-যত্ন করছে। গোসলের জন্যে গরম পানি করে দিয়েছে। মাওলানার সঙ্গে সে কলঘরে সাবান এবং 'ফোড়ল' নিয়ে ঢুকেছে, গায়ে সাবান ডলে দিবে।

মাওলানা বললেন, বাবা, আমি অন্যের সেবা নেই না। আমার নবীজি অন্যের সেবা নিতেন না। আমিও নেই না।

হাদিস বলল, আপনে তো নবী না। আপনে কেন সেবা নিবেন না?

মাওলানার সব আপত্তি অগ্রাহ্য করে সে তাঁর মাথায় আধাবালতি গরম পানি ঢেলে সাবান দিয়ে গা ডলা শুরু করল।

গোসল সেরে মাওলানা ঘরে ঢুকতেই সে হুক্কা নিয়ে উপস্থিত। মাওলানা বললেন, আমি তামাক খাই না।

হাদিস উদ্দিন বলল, খান না, আইজ খাইবেন। শরীর আরাম চায়। এইটা শরীরের একটা আরাম।

মাওলানা হুক্কায় টান দিলেন। তামাকটা ভালো লাগছে না, কিন্তু গুড়ুক গুড়ুক শব্দটা কানে মধুর হয়ে বাজছে।

হাদিস উদ্দিন বলল, খানা কখন খাইবেন বইলেন। ভাত বসাব। ধোঁয়া উঠা ভাত খাওয়ার আলাদা মজা। খিচুড়ি খাইতে চাইলে বলবেন, খিচুড়ি রানব।

মাওলানা বললেন, লাবুস যা খায় তাই খেতে দিও। সে যখন খাবে আমিও তার সাথে খাব।

ছোটকর্তা তো রাইতে কিছু খায় না।

কেন ?

জানি না কেন। উনার হিসাব বোঝা বড়ই কঠিন। অনেক রাইত পর্যন্ত ঘাটলায় বইসা থাকে। এক রাইতে দেখি জঙ্গলায় হাঁটতাছে।

এখন সে কোথায় ?

ঘাটলায় বসা। তাঁর বিষয়ে আরেকটা কথা আছে। সময় সুযোগ হইলে আপনারে বলব।

এখনই বলো।

জে-না, এখন বলব না। গোপন একটা বিষয়। হুজুর, পায়ে একটু তেল দিয়া দেই ?

মাওলানা বললেন, না-না, পায়ে হাত দিও না।

হাদিস উদ্দিন তেল মাখানো শুরু করল। বাটিতে করে তেল সে সঙ্গে করে নিয়েই এসেছে।

শ্বেতপাথরের ঘাটলায় লাবুস বসে আছে। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। আকাশে প্রচুর মেঘ। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। তখন যে খুব একটা আলো হচ্ছে তা-না। কারণ আজও ঘন হয়ে কুয়াশা পড়েছে।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে চাদর গায়ে মজু আসছে। চাদরের নিচে শার্টের বুক পকেটে সে একটা ক্ষুর নিয়ে এসেছে। তবে ক্ষুর সে ব্যবহার করবে না। ক্ষুর ব্যবহার করলেই চিৎকার শুরু হবে। এই ধরনের মৃত্যুর আগে মানুষ ভয়ঙ্কর চিৎকার করে। মজু ঠিক করেছে, সে পেছন থেকে গলা চেপে ধরবে। শব্দ করার কোনো সুযোগই মানুষটা পাবে না। মজু চাদরের আড়াল থেকে হাত বের করল। থাবার মতো বলশালী লোমশ হাত। দেখতেই ভালো লাগে। মজু বিড়ালের মতো নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করল। সে ছাতিম গাছের নিচে দাঁড়াবে। সেখান থেকে বাঘের মতো ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।

মজু খবর নিয়েই এসেছে যে লাবুস নামের মানুষটা অনেক রাত পর্যন্ত পুকুরঘাটে বসে থাকে। আজও সে বসে আছে এটা মজুর জন্যে ভালো। কাজ সহজ হয়ে গেছে। কুয়াশাটাও আজ ভালো সুবিধা দিচ্ছে। সব হচ্ছে

হিসাবমতো। মজু ছাতিম গাছের নিচে চলে এলো। তার দৃষ্টি লাবুসের দিকে। হঠাৎ সেই দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। মজু দেখছে, একজন লাবুস বসে নেই, দু'জন বসে আছে। সিঁড়ির দুই ধাপে দু'জন।

মজু চোখ বন্ধ করল। তাকে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে। সে বুঝতে পারছে তার চোখে ধান্ধা লেগেছে। অতিরিক্ত উত্তেজনায় চোখে এ ধরনের ধান্ধা লাগে। মজু জানে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রেখে খোলার পরপরই ধান্ধা কেটে যাবে। সে দেখবে মানুষ একটাই বসে আছে।

সে চোখ খুলল। মানুষ এখনো দু'জন। যে দৃশ্য সে দেখছে তা চোখের ধান্ধা না, অন্যকিছু। অন্যকিছুটা কী সে বুঝতে পারছে না। মজুর মন বলছে আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা ঠিক না। তাকে চলে যেতে হবে। এখনই যেতে হবে। মজু অনেক চেষ্টা করেও পা নাড়াতে পারল না। তার মনে হচ্ছে পায়ের প্রতিটি মাংসপেশি সীসার মতো হয়ে গেছে। সে কি চিৎকার করে সাহায্যের জন্যে কাউকে ডাকবে ?

ছাতিম গাছের নিচে কে ?

দু'জন মানুষের একজন কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে। একজন শুধু আছে। সে তাকিয়ে আছে মজুর দিকে। তাকে একটা প্রশ্ন করেছে। তাকে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

আপনি কে ?

আমার নাম মজু। আমি লঞ্চঘাটে কুলির কাম করি।

এত রাতে এখানে কী ?

মজু জবাব দিল না। লাবুস বলল, আপনার সঙ্গে একটা ক্ষুর আছে। ক্ষুর নিয়ে কেন এসেছেন ?

মজু এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। ক্ষুর তার পকেটে। সে গায়ে একটা চাদরও দিয়েছে– এই মানুষটার ক্ষুরের কথা জানার কোনোই কারণ নেই।

লাবুস বলল, যান বাড়িতে যান।

মজু রওনা হলো। পা ফেলতে এখন আর তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

ইমাম করিমের স্ত্রী শলার ঝাড়ু দিয়ে উঠান ঝাঁট দিচ্ছে। করিম সারারাত ইবাদত বন্দেগি করে এখন শুয়ে ঘুমাচ্ছে। মনে হয় দুপুর পর্যন্ত ঘুমাবে। শরিফার মাথায় গোপন এক ইচ্ছা কিলবিল করছে। বোরকা পরে কিছুক্ষণের জন্যে সে কি বের হবে ? মূলসড়ক পাশে রেখে জংলার ভেতর দিয়ে চলে যাবে। হরিচরণ বাবুর

কবরের (যার বর্তমান নাম মোহম্মদ আহম্মদ) পাশের আমগাছে মাথার এক গাছি সুতা বেঁধে বলবে— আল্লাহ্‌পাক দয়া কর। একশ' টাকার নোটটা পাওয়ায়ে দাও।

যেতে আসতে বেশি সময় লাগার কথা না। এর মধ্যে করিমের ঘুম ভাঙলে খুব সমস্যা হবে না। সে বলবে খাওয়ার পানি আনতে গিয়েছিল। বান্ধবপুরে দু'টা টিউবকল। একটা মুসলমানদের জন্যে, একটা হিন্দুদের জন্যে।

হিন্দু টিউবকলটা ঘরের কাছে। মুসলমান টিউবকল একটু দূরে। পানি আনতে দেরি হতেই পারে। উঠান ঝাট অসমাপ্ত রেখেই শরিফা অতি দ্রুত ঘরে ঢুকে বোরকা পরল। এলুমিনিয়ামের কলসি হাতে বের হয়ে গেল।

বনের ভেতর দিয়ে পথ। শরিফা ঝড়ের গতিতে যাচ্ছে। তার ভয় ভয় করছে, আবার ভালোও লাগছে। মনে হচ্ছে তার বয়স কমে গেছে। শরীর নিয়ে বিব্রত থাকার মতো বয়সও হয় নি। ইচ্ছা করলেই সে বোরকা খুলে ফেলতে পারে।

শরিফা আমগাছের ডালে সুতা বাঁধল। চোখ বন্ধ করে বলল, আল্লাহ্‌পাক, দয়া কর। আমি দরিদ্র মেয়েমানুষ। ভাইজান আমাকে আদর করে একশ'টা টাকা দিয়েছেন। কতকিছু কিনব শখ করে আছি। তুমি টাকাটা মিলায়ে দাও।

সুতা বেঁধে শরিফা ফিরছে। জঙ্গলের ভেতর ঢুকেই সে বোরকার মাথার পর্দা সরিয়ে দিল। জঙ্গলাভর্তি গাছপালা। গাছপালার সামনে পর্দা করার কিছু নাই।

মা, এখানে কী করেন ?

শরিফা চমকে উঠল। বাঁদিকে শিমুল গাছের নিচে লাবুস দাঁড়িয়ে আছে। শরিফার উচিত দ্রুত বোরকার পর্দা ফেলে দেয়া। কিন্তু তার হাত-পা কেমন শক্ত হয়ে গেছে।

মা, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন ? আমি লাবুস। এক রাতে আপনি আমাকে আদর করে খানা দিয়েছিলেন।

শরিফা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমি যাই। আমি যাই।

লাবুস বলল, আমি আপনাকে জংলা পার করায়ে দেই ?

শরিফা বোরকার পর্দা ফেলে দিয়ে ভীত গলায় বলল, লাগবে না লাগবে না।

শরিফা দৌড়াচ্ছে। যে-কোনো সময় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে এমন অবস্থা।

বাড়ির উঠানে ঢুকে শরিফা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বাড়ি সুনসান। করিমের ঘুম এখনো ভাঙে নি। ঘুম ভাঙলে সে শরিফাকে না দেখে চিন্তিত হয়ে উঠানে বসত।

শরিফা ঘরে ঢুকল। করিম চাদর গায়ে ঘুমাচ্ছে। শরিফা বোরকা খুলে উঠানে এসে অসমাপ্ত ঝাড়ু শুরু করল। কলাপাতার বেড়ার ওপাশ থেকে কেউ একজন গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, ইমাম সাহেব আছেন ? উনার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শরিফা জবাব দিল না। জবাব দেবার অর্থ পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা।

বেড়ার ওপাশ থেকে আওয়াজ এলো, আমার নাম মজু। ইমাম সাহেব একটা কাজে আমাকে একশ' টাকা দিয়েছিলেন। কাজটা হয় নাই। আমি টাকাটা ফেরত দিব। এখনই ফেরত দিতে হবে। আমি লঞ্চে উঠব। কইলকাতা যাব।

শরিফা দাঁড়িয়ে আছে। একশ' টাকার কথা উঠেছে। ব্যাপারটা কী ? করিম একশ' টাকা কোথায় পেয়েছে ?

মজু বলল, আপনে বাড়ির ভিতরে যান। আমি উঠানে টাকা রাইখা যাব। জলচৌকির উপর রাখব।

শরিফা ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। তার বুক ধ্বক ধ্বক করছে। ঘটনাটা কী ?

জলচৌকির ওপর পাথর চাপা দেয়া নোটটা যে শরিফার এই বিষয়ে শরিফা নিশ্চিত। নোটের এক কোনায় হলুদের দাগ। গাছে চুল বাঁধায় কাজ হয়েছে। আল্লাহপাক শরিফার টাকা শরিফাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তবে এখন শরিফার মনে হচ্ছে কাজ না হলেই ভালো হতো। কিছু জিনিস গোপন থাকাই ভালো।

শরিফা!

শরিফা চমকে তাকাল। ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠেছে। তার গলায় বিরক্তি।

ফজর ওয়াক্ত পার হয়েছে, তুমি আমারে ডাকলা না— এটা কেমন কথা! তুমি নিজে কি নামাজ পড়েছ ?

পড়েছি।

নিজে ঠিকই পড়লা, আমারে ডাকলা না ?

আপনে সারা রাইত জাগনা ছিলেন এই জন্যে ডাকি নাই।

বিরাট অন্যায় করেছ শরিফা। বিরাট অন্যায়। তাড়াতাড়ি অজুর পানি দেও।

করিম অজু করছেন। শরিফা জলচৌকিতে বসা করিমের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে চোখ ফেরাতে পারছে না। এই মানুষটা তার একশ' টাকা চুরি করেছে ? এই মাওলানা মানুষ। তার স্বামী। হাদিস কোরান জানা স্বামী। তাকে কি শরিফা সরাসরি প্রশ্ন করবে ? না-কি চুপ করে থাকবে ?

করিম অজুর শেষে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, কী দেখো ?

আপনারে দেখি।

আমারে দেখার কী আছে ?

শরিফা বলল, আইজ আপনারে সুন্দর লাগতেছে। চেহারায় নুরানি ফুটছে। আপনারে একটা প্রশ্ন করব। নামাজের আগে করব না পরে করব বুঝতেছি না।

কর, এখনই কর। আর একটা কথা, সব সময় মাথার মধ্যে প্রশ্ন নিয়া ঘুরবা না। বলো প্রশ্নটা কী ?

শরিফা বলল, হাদিস কোরান মতে চুরির শাস্তি কী ?

হাদিস কোরান মতে চুরির শাস্তি ভয়ঙ্কর। প্রথমবার যে চুরি করবে তার ডান হাত কেটে ফেলতে হবে। তারপরেও চুরি করলে বাম হাত।

আপনার ডান হাত কাটা গেলে আপনে চলবেন কীভাবে ?

কী বললা ?

শরিফা চুপ করে রইল। করিম বলল, একশ' টাকা হারায়া তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এখন আমারে চোর ভাবতেছ। আল্লাহপাক এই কারণে তোমারে কঠিন শাস্তি দিবেন। শাস্তি থেকে বাঁচার একটাই পথ। তওবা করা। আমার সঙ্গে তিনবার বলো— তওবা আস্তাগফিরুল্লা।

তওবা আস্তাগফিরুল্লার।

আবার বলো তওবা আস্তাগফিরুল্লা।

শরিফা আবার বলল, তওবা আস্তাগফিরুল্লা। বলতে বলতে সে কী মনে করে হেসে ফেলল। মাওলানা ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, হাসো কেন ? কিছুই বুঝলাম না, এখানে হাসির কী আছে!

শরিফা বলল, আমার হারানো টাকা আমি খুঁজে পেয়েছি, এইজন্যে মনের আনন্দে হাসতেছি। এই দেখেন টাকা। এক কোনায় হলুদের দাগ।

শাড়ির আঁচল খুলে শরিফা টাকা বের করেছে। মেলে ধরেছে।

টাকা কই পাইলা ?

আপনে একজনেরে টাকাটা দিয়েছিলেন, সে ফিরত দিয়া গেছে।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? তুমি এইসব কী বলতেছ ?

টাকা আপনে আমার বরই-এর হাঁড়ি থাইকা চুরি করেন নাই ?

কী বলো তুমি !

শরিফা ঠান্ডা গলায় বলল, আপনে নামাজ শেষ কইরা স্থির হয়া বসেন। আমি আপনের হাত কাটব। কুড়াল দিয়া এক কোপ দিব।

নাউজুবিল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ।

নাউজুবিল্লাহ্ বইলা লাভ নাই। আমি সত্যি হাত কাটব। বিসমিল্লাহ্ বইল্যা এক কোপ দিব।

হঠাৎ শরিফার হাসি পেয়ে গেল। মানুষটা ভয় পেয়েছে। মনে হয় সত্যি সত্যি বিশ্বাস করছে তার হাত কাটা যাবে। শরিফার সামান্য মায়াও লাগছে।

করিম বলল, শরিফা তুমি পাগল। আমি পাগল স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করব না। আমি ঠান্ডামাথায় পশ্চিমমুখী হইয়া তোমারে তালাক দিতেছি। তালাক তালাক তালাক।

শরিফা বিড়বিড় করে বলল, আমারে তালাক দিলেন?

হ্যাঁ দিলাম। শুনতে না পাইলে আরেকবার বলতেছি— তালাক তালাক তালাক। শুনেছ?

শুনেছি।

শরিফা বড় করে নিঃশ্বাস নিল। সে ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছে। চারপাশে কী ঘটেছে বুঝতেও পারছে না। গরম বোধ হচ্ছে। কপাল ঘামছে। ইচ্ছা করছে দিঘির ঠান্ডা পানিতে গলা ডুবিয়ে শুয়ে থাকে।

করিম বলল, আমি যে তোমারে তালাক দিয়েছি এটা কি বুঝেছ?

বুঝেছি।

খোরপোষের টাকা এখন দিতে পারব না। ধীরে সুস্থে দিব। হাতে টাকা নাই।

আচ্ছা।

আমি এখন বেগানা পুরুষ। আমার দিকে এইভাবে তাকাবা না। মাথায় ঘোমটা দাও। ঘরে যাও। ভাটির দেশে তোমারে পাঠাইবার ব্যবস্থা নিতেছি। ভাই বেরাদরের সঙ্গে থাকবা।

আমি কোনোখানে যাব না। এইখানেই থাকব।

অসম্ভব।

করিম জায়নামাজে দাঁড়ালেন। নামাজ দ্রুত শেষ করে খোঁজ নিতে হবে ঘটনা কী ঘটেছে। কিছুক্ষণ আগে তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন। এই নিয়ে তার মনে তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আপদ বিদায় করতে হবে। কেরায়া নৌকায় করে বদ মেয়েটাকে বাপের দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে। ভাগ্য ভালো মেয়েটার পেটে সন্তান নাই। সন্তান থাকলে ইদ্দতের সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হতো।

শরিফা কাঁদছে। শব্দ করে কাঁদছে। করিম নামাজে মন দিতে পারছেন না।

শিবশংকরের শরীর কয়েকদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। দুপুরের দিকে নিয়ম করে জ্বর আসছে। সন্ধ্যার পর পর জ্বর সেরে যাচ্ছে। তাকে কুইনাইন মিকচার দেয়া হচ্ছে। অতি তিক্ত সেই মিকচার সে পেটে রাখতে পারছে না। খাওয়ার পর পর বমি হয়ে যাচ্ছে। শিবশংকরের স্বাস্থ্য শিক্ষক গোপীনাথ বল্লভ ভালো দুশ্চিন্তায় আছেন। শিবশংকরকে নিরম্বু উপবাসের বিধান দিয়েছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস। উপবাসে শরীরের বিষ নষ্ট হয়। শিবশংকরের শরীর বিষাক্ত হয়ে গেছে বলে তাঁর ধারণা।

শিবশংকর উপবাস করে যাচ্ছে। খাদ্যে এমনিতেই তার রুচি নেই। উপবাস তার জন্যে ভালো। সে জ্বরের সময়টা চাদর গায়ে শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছে। হাতের কাছে বইপত্র রাখছে। পড়তে ইচ্ছা করলে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে। চামড়ায় বাঁধানো একটা খাতাও তার আছে। মাঝে মাঝে খাতায় ডায়েরির মতো লেখা লিখছে।

এক দুপুরে জ্বরের প্রবল ঘোরে সে খাতায় লিখল—

সাধনা = ফসল

সাধনা + প্রার্থনা = ফসল

কাজেই প্রার্থনা = ০

এর অর্থ প্রার্থনা মূল্যহীন। শিবশংকরের ধারণা হলো সে বিরাট এক আবিষ্কার করেছে। অংক দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, প্রার্থনা হলো শূন্য। মূল্যহীন। সে তার আবিষ্কারের কথা গোপীনাথকে বলল। তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন, তুমি বিকারের ভেতর আছ। জ্বরের কারণে এই বিকার তৈরি হয়েছে। তিনি শিবশংকরকে পাকস্থলী ধৌত করার বিধান দিলেন। বিকারের কেন্দ্রবিন্দু পাকস্থলী। পাকস্থলী ধৌত করার অর্থ বিকার ধৌত করা।

গোপীনাথের পাকস্থলী ধৌত করার পদ্ধতিটা জটিল এবং কষ্টকর। এক জগ লেবু মেশানো পানি পুরোটা খেয়ে ফেলতে হবে। ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট বসে থাকতে হবে। তারপর গলায় আঙুল দিয়ে বমি করে পাকস্থলীর পুরো পানি ফেলে দিতে হবে।

শিবশংকর কষ্টকর এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। কোনোরকম আপত্তি করছে না। পাকস্থলী ধৌতকরণ প্রক্রিয়ায় তার বিকার যে দূর হচ্ছে তা না। বরং আরো বাড়ছে। শিবশংকর তার আবিষ্কারের বিষয়টা চিঠি লিখে দু'জনকে জানিয়েছে। একজন তার বাবা মনিশংকর। অন্যজন বিখ্যাত মানুষ— শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মনিশংকর পুত্রের চিঠির জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়েছেন। তিনি পুত্রের মানসিক অবস্থা নিয়ে যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তা তাঁর চিঠিতে বোঝা যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন—

বাবা শিবশংকর,

তোমার পত্র পাঠ করিয়া দুঃখিত এবং চিন্তিত হইয়াছি। তোমাকে একা রাখা ঠিক হয় নাই। তোমার আশেপাশে আমার থাকা উচিত ছিল। আমি নানান কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত বলিয়া তাহা পারি নাই। ইহা আমার ব্যর্থতা। তুমি প্রমাণ করিয়াছ প্রার্থনা = ০, কিন্তু বাবা আজ তুমি যে বাঁচিয়া আছ তার মূলে আছে প্রার্থনা। তোমার আরোগ্য সাধনের সমস্ত চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয় তখন হরিচরণ বাবু প্রার্থনার মাধ্যমে তোমার জীবন রক্ষা করেন। এই কাহিনী বান্ধবপুরের সকলেই জানে। তুমিও নিশ্চয়ই এই বিষয়ে অবগত আছ।

এখন আমার আদেশ, তুমি মাথা হইতে এই ধরনের উদ্ভট এবং ক্ষতিকর চিন্তা পরিত্যাগ করিবে এবং কায়মনে পাপচিন্তার জন্যে ভগবানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

গোপীবাবুর কাছে শুনিলাম তোমার শরীর ভালো যাইতেছে না। আমি বিশেষ চিন্তাযুক্ত। মন্ত্রপূত একটি শক্তিকবজ পাঠাইলাম। ভক্তি সহকারে গলায় ধারণ করিবে। যেন অন্যথা না হয়।

ইতি তোমার চিন্তাযুক্ত পিতা
শ্রী মনিশংকর

রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা চিঠির জবাব এলো না। শিবশংকর তা আশাও করে না। বড় মানুষদের কাছে সবাই চিঠি লেখে। এত চিঠির জবাব দেয়া সম্ভব না।

মন্ত্রপূত মাদুলির গুণেই হোক কিংবা পাকস্থলী ধৌতকরণ চিকিৎসার কারণেই হোক শিবশংকরের রোগ খানিকটা সেরেছে। পালা জ্বর বন্ধ হয়েছে।

সে আগের মতো ঘুরতে বের হচ্ছে। হরিচরণের কবরের পাশে বেড়ে ওঠা আমগাছের চারদিকে রুটিন করে ঘুরছে। এই কাজটা করতে কেন জানি তার ভালো লাগে। নিজেকে তখন ইলেকট্রন মনে হয়। ইলেকট্রন যেমন অ্যাটমের নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘুরে সেও সেরকম ঘুরছে। আমগাছটা যেন নিউক্লিয়াস। প্রোটন এবং নিউট্রন।

বেলা কম হয় নি, দশটার ওপরে বাজে। শিবশংকর আমগাছের চারদিকে ঘুরছে। তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, কারণ ঘন হয়ে কুয়াশা পড়েছে। এই বৎসরটা মনে হয় কুয়াশার বছর। শ্রাবণ মাস শুরু হয়েছে। টানা বৃষ্টি হবার কথা। তার বদলে কুয়াশা। কথায় আছে— 'মেঘের দিনে কুয়াশা, রাজকপালও ধুয়াশা।' বড় কোনো দুর্ঘটনা অবশ্যই ঘটবে।

শিবশংকর নিজের মনে আছে। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বলছে, I am Mr. Electron. হঠাৎ সে শুনল অতি মিষ্টি সুরে কেউ যেন কথা বলল, আপনার কী হয়েছে?

শিবশংকর দাঁড়িয়ে আছে। কুয়াশার ভেতর থেকে কিশোরী এক মেয়ে বের হয়ে এলো। মেয়েটির পরনে ঘাগড়া জাতীয় পোশাক। মাথায় ঘোমটার মতো করে দেয়া ওড়না। মেয়েটির গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌর। বড় বড় চোখ। চোখের মণি ঘন কৃষ্ণবর্ণ। মুখ গোলাকার। নাক সামান্য চাপা। কুয়াশার ভেতর মেয়েটাকে দেখাচ্ছে ইন্দ্রাণীর মতো। বোঝাই যাচ্ছে মেয়েটা মুসলমান। মেয়েটা আবার বলল, আপনার কী হয়েছে?

শিবশংকর বিব্রত গলায় বলল, কিছু হয় নাই তো।

চক্কর দিচ্ছেন কেন?

এম্নি। এটা আমার খেলা।

মেয়েটি বলল, ছোট বাচ্চারা এরকম খেলে। আপনি কি ছোট বাচ্চা?

শিবশংকর বলল, তুমি বান্ধবপুরের?

মেয়েটি বলল, আমার নাম আতর। আমি ধনু শেখের মেয়ে।

কোলকাতায় থাকো?

হুঁ। জাপানিরা বোমা ফেলবে এইজন্যে চলে এসেছি।

স্কুলে পড়?

হুঁ। বেগম রোকেয়ার স্কুলে।

কোন ক্লাসে?

ক্লাস এইট।

তুমি ছাত্রী কেমন ?

ভালো না। ক্লাস সেভেনে একবার ফেল করেছি।

আমেরিকা কে আবিষ্কার করেছেন জানো ?

জানি। কলম্বাস।

শুধু কলম্বাস বলা ঠিক না। বলা উচিত ক্রিস্টোফার কলম্বাস। ভাস্কো দা গামা কে জানো ?

জানি না। আপনি এত প্রশ্ন করছেন কেন ? আপনি কি বেলারানি ?

বেলারানি কে ?

বেলারানি আমাদের ইংরেজি আপা। শুধু প্রশ্ন করেন। কেউ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে বলেন, You goat. আমরা উনাকে কী ডাকি জানেন ? আমরা ডাকি মিসেস গোটরানি। তাঁর একটা ছেলে আছে। হাবাগোবা। নাম অক্ষয়। আট বছর বয়স। একদিন স্কুলে নিয়ে এসেছিলেন। আমি তাকে বললাম, এই তোর নাম কী ? সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, অততয় বাবু।

শিবশংকর মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। কী সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে মেয়েটা কথা বলে যাচ্ছে। যেন শিবশংকর তার অনেক দিনের চেনা কেউ। মেয়েটার কথা বলার ভঙ্গিটাও কী সুন্দর! হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে। অভিনয়ও করছে। তোতলামির অভিনয় করে কী সুন্দর বলল— অততয় বাবু।

শিবশংকর বলল, তুমি তো আমার নাম জিজ্ঞেস করলে না।

আতর বলল, আমি সবাইকে চিনি। আপনাকেও চিনি। আপনি মনিশংকর চাচার ছেলে শিবশংকর। আপনি গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন। হয়েছে না ?

হয়েছে।

আমি এখন যাই। অনেকক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলে ফেলেছি। আল্লাহ আমাকে পাপ দিবে।

শিবশংকর তাকিয়ে আছে। আতর নামের মেয়েটা ছোট ছোট পা ফেলে দ্রুত যাচ্ছে। শিবশংকরের কাছে মনে হলো, হাঁটার মধ্যেও এই মেয়ের নাচের ভঙ্গি আছে। মেয়েটির ওপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যে সে চোখ ফেরাতে পারল না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার জন্যে তার একটু লজ্জাও লাগছে। তার কাছে মনে হচ্ছে বান্ধবপুরের সবাই তাকে দেখছে।

ধনু শেখ অনেক বেলায় নাশতা খেতে বসেছেন। বাটিভর্তি মুরগির মাংস এবং চালের আটার রুটি। তাঁর হজমের সমস্যা হচ্ছে। যা খান কিছুই হজম হয় না। বুক জ্বালাপোড়া করে। কবিরাজি চিকিৎসা চলছে। কোলকাতার কবিরাজ আয়ুর্বেদশাস্ত্রী মিশ্র ঠাকুর চিকিৎসা করছেন। গুরুপাক খাবার সম্পূর্ণ নিষেধ করে দিয়েছেন। নিষেধ মানা ধনু শেখের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

ধনু শেখ খেতে বসেছেন উঠানের জলচৌকিতে। চায়ের কাপে ওষুধ তৈরি করা আছে। খাওয়া শেষ করেই ওষুধ খাবেন। ওষুধ খালিপেটে খাওয়ার কথা। তিনি এই নিয়ম মানেন না। তাঁর মতে ওষুধ হচ্ছে ওষুধ। ওষুধের আবার খালিপেট ভরাপেট কী? যত ফালতু বাত।

নাশতার মাঝখানে আতর উঠানে উপস্থিত হলো। ধনু শেখ বললেন, কই ছিলি?

আতর বলল, বেড়াতে গিয়েছিলাম।

বান্ধবপুরে বেড়ানোর কী আছে?

অনেক কিছুই আছে। নদী আছে, জঙ্গল আছে, পুকুর আছে।

একা কোনোখানে যাবি না।

একা তো যাই নাই। দুইজন সঙ্গে নিয়ে গেছি।

ধনু শেখ বিস্মিত হয়ে বললেন, দুইজন কে?

আতর নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, কান্ধের দুই ফেরেশতা নিয়ে গেছি। একজনের নাম কেরামন, আরেকজনের নাম কাতেবিন। ঠিক আছে না বাবা?

ধনু শেখ হতাশ গলায় বললেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে বলা ছাড়া তাঁর উপায়ও নেই। তিনি তাঁর এই মেয়েকে অত্যধিক স্নেহ করেন। তাঁর তিন মেয়ের মধ্যে একজনই বেঁচে আছে। মা মরা মেয়ে। মেয়ের মা বেদানা গত বৎসর হঠাৎ করে মারা গেছে। ধনু শেখ বিনা কারণে কাউকে এভাবে মারা যেতে দেখেন নি। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সে পান মুখে দিয়ে শুয়েছে। শোবার আগে দাসীকে বলেছে, আইজ আরামের ঘুম দিব। কেউ যেন না ডাকে। মশারি ফেলে দিও। দিনেরবেলা মশা যখন ত্যক্ত করে তখন খুব খারাপ লাগে। রাতের মশা সহ্য করা যায়। দিনের মশা না।

দাসী মশারি খাটাতে গিয়ে দেখে, মুখভর্তি পান নিয়ে বেদানা মরে পড়ে আছে।

মায়ের মৃত্যুশোকে কাতর হয়ে আতর দুইদিন দুই রাত কিছুই মুখে দেয় নি। পানি পর্যন্ত না। তৃতীয় দিনে সে বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। ধনু শেখকে

বলল, বাবা, মা পরকালে খুব ভালো জায়গায় স্থান পেয়েছেন। সুখী এবং পবিত্র আত্মাদের সঙ্গে এখন তাঁর যোগাযোগ। এখন আর তাঁকে নিয়ে মনে কষ্ট পাওয়ার কিছু নাই। ধনু শেখ বিস্মিত হয়ে বললেন, তোকে বলেছে কে ?

আতর স্বাভাবিক গলায় বলল, মা বলে গেছেন।

ধনু শেখ জানেন এইসব কল্পনার কথা। মৃতমানুষ কখনো কিছু বলে যায় না। তাদের কিছু বলার ক্ষমতা থাকলে জীবিত মানুষদের সারাক্ষণ মৃতদের কথা শুনতে হতো। তারপরেও মেয়ের মনের শান্তির জন্যে তিনি বলেছেন, খুবই ভালো সংবাদ দিলা মা। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। বান্ধবপুরের ইমাম করিমকে পত্র দিতেছি, সে যেন মসজিদে মিলাদ এবং তবারুকের আয়োজন করে।

মাওলানা ইদরিসের মেয়ে মীরার বয়স তের মাসের কয়েকদিন বেশি। এই বয়সে শিশুরা বাবা, মা, পানি... এরকম অনেক কথা বলে। মীরা একটি শব্দ ছাড়া কোনো কথাই বলে না। সে শব্দটা হলো— রাম। ইদরিসের মনে এই নিয়ে খুবই কষ্ট। এত শব্দ থাকতে তাঁর মেয়ে রামনাম শিখল কেন ? যখন তিনি বলেন, মীরা মা, বলো বাবা। বাবা। আমি তোমার বাবা। বলো বাবা।

মীরা বলে, রাম।

ইদরিস বড়ই বিরক্ত হন। ছোট্ট মীরা মনে হয় বাবার বিরক্তি ধরতে পারে। সে তার বাবাকে আরো বিরক্ত করার জন্য মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে, রাম। রাম।

কালী বলে যে মেয়েটা মীরার দেখাশোনা করে তাকে ইদরিস জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি আমার মেয়েটার সামনে রামনাম নাও ? তাকে রাম বলা তুমি শিখায়েছ ?

কালী দুঃখিত হয়ে বলেছে, মুসলমান মেয়েরে আমি রামনাম কেন শিখাব বলেন ? আমার ধর্মভয় আছে না ?

মেয়েটা আপনাআপনি রাম ডাকা শুরু করল ?

তাই তো দেখি। বিরাট আশ্চার্য ব্যাপার।

মেয়ের 'রাম' ডাকার জন্যে মাওলানা ইদরিস যতটা দুঃখিত তারচেয়ে অনেক দুঃখিত হাদিস উদ্দিন। সে মীরার কানের কাছে ক্রমাগত বলে— মরা মরা মরা। রাম উল্টো করে মরা বলা। এতে যদি দোষ কাটে।

দোষ কাটে না। মীরা আরো বেশি করে বলে, রাম রাম। বলে আর হাসে। হাত-পা নাড়ে।

একজন মুসলমান মেয়ে জন্মের পর থেকে রামনাম জপ করছে, এই খবরটা বান্ধবপুরে ভালোই ছড়িয়েছে। অনেকের ধারণা মীরার ভেতর দেবী সীতা প্রকাশিত হয়েছেন। তিনিই স্বামী রামের নাম জপ করছেন। এয়োতি মেয়েরা তাদের শাঁখা এবং সিঁদুরের কৌটা মীরাকে দিয়ে ছুঁইয়ে নিচ্ছে। সবাই ভক্তিভরে মীরাকে কোলেও নিচ্ছে। অতি ভক্তিমতীরা মীরার পায়ে প্রণামের ভঙ্গিও করছে।

মীরার বিষয়ে কথাবার্তা শুনে তাকে দেখতে এসেছে শিবশংকর। মীরাকে কোলে নিয়ে শ্রীনাথ বাগানে হাঁটছিলেন। শিবশংকরকে দেখে মীরা কোলে ওঠার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে দিল। শিবশংকর তাকে কোলে না নিয়ে বলল, খুকি তোমার নাম কী ?

মীরা ফিক করে হেসে বলল, রাম।

শ্রীনাথ বাবু বললেন, বুঝলে শিবশংকর, এই মেয়ের মুখে রাম ছাড়া কোনো কথা নেই। তাকে যাই জিজ্ঞেস করো সে বলবে রাম। ভক্তিভরে বলে।

শিবশংকর বলল, কাকু, আমার ধারণা আপনি তাকে রামনাম শিখিয়েছেন।

শ্রীনাথ চোখ কপালে তুলে খড়খড়ে গলায় বললেন, এইরকম ধারণার কারণ কী ?

শিবশংকর বলল, আপনি রামভক্ত মানুষ। দিনরাত রামায়ণ পড়েন।

মুসলমান এই মেয়েকে রামায়ণ শিখায়ে আমার লাভ ?

আপনি পুণ্যের আশায় এই কাজ করেছেন। আপনি ভেবেছেন একটা মুসলমান মেয়েকে রামনাম শেখানোয় আপনার পুণ্য হয়েছে। পুণ্যের আশায় অশিক্ষিত মানুষরা অনেক অন্যায় করে।

তুমি আমাকে অশিক্ষিত বললা ?

আপনাকে বলি নাই। যারা অশিক্ষিত তাদের বলেছি।

আমি খাঁটি ব্রাহ্মণ। তুমি কি জানো তোমার এই আচরণের জন্যে আমি যদি পৈতা ছুঁয়ে অভিশাপ দেই তুমি গলায় রক্ত উঠে মারা যাবে।

শিবশংকর স্বাভাবিক গলায় বলল, আপনি অযথাই আমার ওপর রাগ করছেন। তারপরেও আপনি যদি অভিশাপ দিতে চান দিতে পারেন। অভিশাপ হলো শূন্য। আমি অংক দিয়ে প্রমাণ করতে পারি।

শ্রীনাথ রাগে থরথর করে কাঁপছেন। শিবশংকর স্বাভাবিক গলায় বলছে —

জীবন = মৃত্যু

জীবন + অভিশাপ = মৃত্যু

কাজেই অভিশাপ = ০

শ্রীনাথ বললেন, তোমার পিতা বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তার ছেলে হয়ে তুমি কুলাঙ্গার হয়েছ। তোমার মুখদর্শনও পাপ।

শিবশংকর চলে এলো। আজ তার মন খুব ভালো, কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ তার মতো নগণ্য একজন মানুষের চিঠির জবাব দিয়েছেন। চিঠি পড়ে শিবশংকর লজ্জার মধ্যে পড়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথ তার চিঠি পড়ে ভেবেছেন যে, শিবশংকর গুরুগম্ভীর বয়স্ক কোনো মানুষ। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র ভাবেন নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> ভবদীয় শিবশংকর,
>
> আপনার পত্র হস্তগত হইয়াছে। আপনি অংকের মাধ্যমে প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন প্রার্থনা সমান শূন্য। আপনার অংকে কিছু কৌশল আছে। কৌশল মানেই ফাঁকি। ভগবান ফাঁকির ঊর্ধ্বে। আপনি যে সাধনার কথা বলিয়াছেন সেখানেও কিন্তু প্রার্থনা জড়িত। প্রার্থনা বাদ দিয়া সাধনা হয় না।
>
> ইতি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
>
> জোড়াসাঁকো

শিবশংকরের খুব ইচ্ছা চিঠিটা সবাইকে পড়ায়। পড়াবার মতো কাউকে সে পাচ্ছে না। এই চিঠির মর্ম উদ্ধার সবার পক্ষে সম্ভব না। তবে তার ধারণা আতর মেয়েটা হয়তো চিঠির গুরুত্ব বুঝতে পারবে। মেয়েটার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না এটাই সমস্যা। রোজ ভোরে আমগাছের চারদিকে চক্কর দেবার সময় তার মনে হয় এই বুঝি কুয়াশার ভেতর দিয়ে আতর এসে দাঁড়াবে। তাকে দেখে ঠোঁট চেপে হাসবে। শিবশংকর ঠিক করেছে সাতদিন সে অপেক্ষা করবে। এর মধ্যে দেখা না হলে চলে যাবে ধনু শেখের বাড়িতে।

ধনু শেখ স্নানপর্বের আগে গায়ে রসুন ভেজানো সরিষার তেল মাখছিলেন। এই অবস্থায় খবর পেলেন মনিশংকরের ছেলে শিবশংকর এসেছে। সে আতরের সঙ্গে কথা বলতে চায়। খুব না-কি জরুরি। ধনু শেখের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি শিবশংকরকে উঠানে ডেকে পাঠালেন।

তুমি শিবশংকর?

শিবশংকর হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আমার মেয়ে আতরকে চেন?

চিনি।

কীভাবে চেন ?

তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কথা হয়েছে।

কী কথা হয়েছে ?

নানান বিষয়ে কথা হয়েছে।

তার সঙ্গে তোমার প্রয়োজনটা কী ?

তাকে আমি একটা চিঠি পড়তে দিব।

ধনু শেখের হতভম্ব ভাব কাটছে না। বরং বাড়ছে। তিনি চাপা গলায় বললেন, আতর বাড়িতে আছে। তবে তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। তুমি আর কখনো এ বাড়িতে আসবেও না।

শিবশংকর বলল, আচ্ছা।

ধনু শেখ বলতে চাচ্ছিলেন, এ বাড়ির ত্রিসীমানায় যদি তোমাকে দেখি তাহলে তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেব। কঠিন কথাটা বলতে পারলেন না। মনিশংকরের ছেলেকে এমন কথা বলা যায় না। মনিশংকর বিশিষ্ট ব্যক্তি। তবে তাকে তার পুত্রের কর্মকাণ্ড অবশ্যই জানানো উচিত। তিনি ঠিক করলেন, আজ দিনের মধ্যেই মনিশংকরকে চিঠি দিয়ে সব জানাবেন। এই সঙ্গে আতরকেও সাবধান করে দিতে হবে।

আতরের বিষয়ে তিনি খুবই দুশ্চিন্তায় আছেন। মেয়েটা এমন একটা কাণ্ড করেছে যার কাছে শিবশংকরের সঙ্গে আলাপের ঘটনা কিছুই না। তিনি শুনেছেন আতর নৌকা নিয়ে রঙিলা নটিবাড়ি দেখতে গিয়েছিল। এই বিষয়ে আতরের সঙ্গে এখনো কথা হয় নাই। কীভাবে কথা বলবেন বুঝতে পারছেন না বলেই কথা হয় নাই। আতরকে বান্ধবপুরে আনাটাই ভুল হয়েছে। যে কর্মকাণ্ড সে করছে তারচেয়ে কোলকাতায় থেকে জাপানিদের বোমা খাওয়াও অনেক ভালো।

ধনু শেখ ডাকলেন, আতর মা কোথায় ?

ঘর থেকে আতর বের হলো না। আতরের দাসী হামিদা বের হলো। হামিদার চেহারা রাক্ষসের মতো। দাঁত উঁচু। মুখে বসন্তের দাগ। একটা চোখ নষ্ট। সেই নষ্ট চোখ অক্ষিকোটর থেকে সামান্য বের হয়ে আছে।

অবিবাহিতা অতি রূপবতী কন্যাদের জন্যে কুৎসিতদর্শন দাসী রাখতে হয়। হামিদাকে এই কারণেই রাখা হয়েছে।

হামিদা ঘোমটা দিয়ে তার নষ্ট চোখ ঢেকে বলল, আম্মা বাড়িতে নাই।

ধনু শেখ বললেন, কই গেছে ?

ইমাম করিম সাহেবের বাড়িতে গেছেন।

করিম সাহেবের বাড়িতে কেন ?

উনার পরিবারের সাথে আম্মার ভাব হইছে। পেরায়ই ঐ বাড়িতে যায়।

তুমি তার সঙ্গে যাও নাই কেন ?

আম্মা আমারে নিয়া কোনোখানে যায় না।

ধনু শেখ বললেন, আতর রঙিলা বাড়িতে গিয়েছিল, এটা কি সত্য ?

সত্য না।

সত্য না হলে কেন আমার কানে এমন কথা আসছে ?

জানি না কেন আসছে।

তুমি ইমাম করিমের বাড়িতে যাও। আতরকে নিয়া আস।

জি আচ্ছা।

ধনু শেখ বললেন, জি আচ্ছা বলে দাঁড়ায়া আছ কেন! যাও।

হামিদা চলে গেল। ধনু শেখ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কারণ হামিদা। সে ধনু শেখের জীবনে বড় ধরনের এক সমস্যা তৈরি করেছে। এই মেয়েটির চেহারা যত কুৎসিত তার কণ্ঠস্বর ততটাই মধুর। সে যখন কথা বলে ধনু শেখের শুনতে ভালো লাগে। ধনু শেখের মনে হয়, মেয়েটিকে পর্দার আড়ালে রেখে তিনি তার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতে পারবেন। কেন এরকম মনে হয় তিনি নিজেও জানেন না। হামিদা কি কোনো তুকতাক করেছে ? সম্ভাবনা আছে। দাসীশ্রেণীর মেয়েরা তুকতাকে পারদর্শী। হামিদাকে বিদায় করে দেয়াটাই সবচে' ভালো বুদ্ধি। সমস্যা একটাই, আতর হামিদাকে অত্যন্ত পছন্দ করে। অনেক রাত জেগে তার সঙ্গে গল্প করে। ধনু শেখ শুনেছেন, এমনও হয়েছে— গল্প করতে করতে তারা রাত পার করে দিয়েছে। এটাও কোনো ভালো কথা না। দাসীর সঙ্গে এত কী গল্প! দাসী হলো দাসী। আতরের বিয়ে হলে হামিদা আতরের সঙ্গে আতরের শ্বশুরবাড়িতে যাবে। হামিদার বাকি জীবন কাটবে সেখানে। আতরের স্বামী যদি চায় দাসীর গর্ভেও সন্তান জন্মাতে পারবে। সেই সন্তানরা কোনো সম্পত্তির অংশ পাবে না। বাবাকে বাবা ডাকতে পারবে না। তারা বাবার সংসারে কামলা খাটবে। এইটাই নিয়ম। অনেকে এই নিয়মে ভুল খুঁজে। ধনু শেখ কোনো ভুল দেখেন না। নিয়ম সমাজের ভালোর জন্য আসে। মন্দের জন্য আসে না।

আতর গল্প করছে শরিফার সঙ্গে। গল্পের বিষয়বস্তু রঙিলা নটিবাড়ি। আতর সেখানে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ছিল। সে কী দেখে এসেছে তারই গল্প। শরিফা বলল, তোমার খুবই সাহস।

আতর বলল, ঠিকই বলেছেন, আমার অনেক সাহস।

তোমার বাবা এই ঘটনা জানেন না ?

না। আর জানলেই কী ? উনি আমারে কি শাস্তি দিবে ? আমারে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা উনার নাই। বাপজান আমারে ভয় পায়।

ভয় পায় ?

হুঁ। বাপজান ভাব দেখায় সে খুব সাহসী। আসলে ভীতু। বেজায় ভীতু।

শরিফা ইতস্তত করে বলল, রঙিলা বাড়িতে কী দেখলা ?

আতর বলল, দিনেরবেলা গিয়েছিলাম। কিছুই দেখি নাই। সুন্দর সুন্দর মেয়ে— হাসতেছে, গল্প করতেছে। একজন আরেকজনের চুল বানতেছে।

ইমাম ইদরিস সাহেবের স্ত্রী জুলেখা না-কি রঙিলা বাড়িতে থাকেন ? উনার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

না। উনি রঙিলা বাড়িতে থাকেন না। উনি কলিকাতা থাকেন। তাঁর গানের নতুন রেকর্ড হবে, এইজন্যে গিয়েছেন। আপনি কি রেকর্ডে উনার গান শুনেছেন ?

শুনি নাই। শুনতে ইচ্ছা করে।

আতর বলল, শুনতে ইচ্ছা করলে আমি শুনাব।

তোমার কাছে কি কলের গান আছে ?

কলিকাতার বাড়িতে আছে। আমি আনাব।

কবে আনাবা ?

খুব শিগগির আনাব। এখন আমি যাই।

আচ্ছা যাও, আবার আসবা।

আতর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাস করব। যদি মনে কিছু না নেন।

শরিফা বলল, মনে কিছু নিব না। যা ইচ্ছা জিজ্ঞাস কর।

আপনার স্বামী আপনাকে তালাক দিয়েছেন। তারপরেও আপনি স্বামীর ঘরে বাস করেন। এটা কেমন কথা ?

শরিফা বলল, আমি আমার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ভাই আমারে রাখে নাই। আমার কোনোখানে যাওয়ার জায়গা নাই। ইমাম সাব আমারে আবার বিবাহ করতে রাজি হয়েছেন। উনি দয়া করেছেন।

বিবাহ করবে ?

ধর্মে নিয়ম আছে উনি বিবাহ করার আগে আমারে অন্য জায়গায় বিবাহ করতে হবে। এরে বলে 'হিল্লা' বিবাহ। আমারে কেউ হিল্লা বিবাহ করতে রাজি

না বইলা দেরি হইতেছে। তবে আমি একঘরে থাকলেও আলাদা থাকি। উনার সঙ্গে কথা বলি না। পর্দার মধ্যে থাকি। ভইন, আর কিছু জিজ্ঞাস করবা ?

না।

আতরের মন খারাপ হয়ে গেল। শরিফা হাসিখুশি মেয়ে, এখন কেমন ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। আতরের নিজেরও কাঁদতে ইচ্ছা করছে। এরকম তার প্রায়ই হয়। নিজের দুঃখে না, অন্যের দুঃখে তার কাঁদতে ইচ্ছা করে।

যে সময়ের কথা বলছি সে-সময়ে হিল্লা বিবাহ কঠিন বিষয় ছিল। ইসলাম ধর্ম প্রচারের যুগে ভারতবর্ষের মুসলমানরা কঠোরভাবে ধর্মের নিয়মকানুন পালন করতেন না। ধর্মকর্মে ঢিলাঢালা ভাব ছিল। অনেক হিন্দুয়ানী ছিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ভক্তিভরে দেবদেবীকে নমস্কার করতেন। তাদের কাছে পারলৌকিক এবং ইহলৌকিক মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা জানাতেন। দেবদেবীদের নাম দিয়ে ছেলেমেয়েদের নামও রাখতেন। যেমন—

নারায়ণ শেখ
গোকুল মোল্লা
কালী বানু

মুসলমান মেয়েরা শাঁখা পরতেন, কপালে সিঁদুর দিতেন। মুসলমান বাড়িতে থাকত তুলসি মঞ্চ। সেখানে সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালানো হতো।

ভারতবর্ষের মুসলমানদের ধর্মের পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি মৌলানা এনায়েত আলী এবং মৌলানা কেরামত আলি ব্যাপক প্রচার শুরু করেন। তাদের ধর্ম প্রচার আন্দোলনের নাম 'তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া'। এই নামের অর্থ— মোহাম্মদের পথ।

তরিকায়ে মোহম্মদীয়া আন্দোলনের পাশাপাশি চলছিল ফরায়েজী আন্দোলন। এই আন্দোলনের সূচনা করেন শরীয়তুল্লাহ। ফরায়েজী আন্দোলন মোহাম্মদ (দঃ)-এর শিক্ষার চেয়ে কোরানের শিক্ষাকে প্রাধান্য দিল। তাদের মতে মুসলমানদের সব বাদ দিয়ে কোরানের ফরজ আঁকড়ে ধরতে হবে।

ফরায়েজী আন্দোলন এবং তার পরে পরে হানাফি মোস্তাহাবের কট্টরপন্থী আন্দোলনে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সহজিয়া ভাব দূর হয়ে গেল।

তালাক দেয়া স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহের ব্যাপারে কোরান শরীফ 'হিল্লা বিবাহ' উল্লেখ করেছে, কাজেই হিল্লা বিবাহ হতে হবে। এর মধ্যেও মনগড়া অনেক নিয়মকানুন তৈরি হয়ে গেল। যেমন, যিনি তাঁর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে আবার বিবাহ

করতে চান তিনি তার ইচ্ছার কথা জুমার নামাজের পর সমস্ত মুসল্লিদের জানাবেন। যাতে মুসল্লিদের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন তিনিই বিয়েতে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন। গোপনে কারো সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়া যাবে না।

পবিত্র কোরান শরীফে এ জাতীয় কোনো নিয়মকানুন নেই। সূরা বাকারায় (আয়াত ২৩০) আল্লাহপাক বলছেন—

> And if he hath divorced her (the third time), then she is not lawful unto him thereafter until she hath wedded another husband. Then if he (the other husband) divorced her it is no sin for both of them that they come together again if they consider that they are able to observe the limits of Allah.
>
> অনুবাদ : M Pickthall

> তারপর যদি সে ঐ স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ্ করেছে তার পক্ষে সে বৈধ হবে না। তারপর যদি সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দেয় তবে তাদের আবার মিলনে কারও কোনো দোষ নেই, যদি দুজনে ভাবে যে তারা আল্লাহ্র নির্দেশ বজায় রেখে চলতে পারবে।
>
> অনুবাদ : মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

এক জুম্মার নামাজে খুৎবা পাঠের পর ইমাম করিম শরিফার হিল্লা বিবাহের কথা বললেন। মুসল্লিদের মাঝে গুঞ্জন দেখা গেল। এ ধরনের ঘটনা বান্ধবপুরে এর আগে ঘটে নি। করিম বললেন, তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিজের বাড়িতেই আমি রেখেছি। বাধ্য হয়ে রেখেছি। তবে তার মুখ দর্শন করি না। সে আলাদা ঘরে থাকে। তার হিল্লা বিবাহের পর আমি ইনশাল্লাহ্ আবার তাকে বিবাহ্ করব। আমি একটা ভুল করেছি। আল্লাহপাকের কাছে ভুলের জন্যে ক্ষমা চাই। আমি আমার স্ত্রীকে খুব ভালো পাই। সে ভালো মেয়ে। এখন তার জন্যে আমার মন কান্দে।

কথা বলতে গিয়ে ইমাম করিমের গলা ভারী হয়ে গেল। তার চোখে পানিও এসে গেল। পাগড়ির কোণা দিয়ে তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, যদিও আল্লাহপাক তালাক বৈধ করেছেন, তারপরেও তাঁর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ। অপছন্দের কাজ বলেই তিনি যেসব দম্পতি তালাকের পর পুনর্বিবাহ করতে চায় তাদের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। হিল্লা বিবাহ্ এইরকম এক শাস্তি।

জুম্মাবার উপলক্ষে একজন মসজিদে খিচুড়ি সিন্নি দিয়েছিল। করিম সেই খিচুড়ি খানিকটা খেয়ে মসজিদে শুয়ে থাকলেন। বাড়িতে গেলেন না। ঠিক করলেন আছর, মাগরিব এবং এশার নামাজ শেষ করে বাড়িতে যাবেন। আজকাল বাড়িতে যাবার বিষয়ে তিনি আগ্রহ বোধ করেন না। যখন কাজকর্ম থাকে না তখন হাদিস কোরান পড়ে সময় কাটাতে চেষ্টা করেন। কোনো কিছুতেই মন বসে না। প্রচণ্ড অস্থিরতা বোধ করেন। অস্থিরতার কারণও তাঁর কাছে খুব স্পষ্ট না। শরিফাই কারণ এটা ঠিক, তবে কোন অর্থে ? শরিফাকে মাথা থেকে সম্পূর্ণ দূর করে তিনি দেশ থেকে আরেকটা মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসতে পারেন। এটাই করা উচিত। কিন্তু সেই মেয়ে তো শরিফার মতো হবে না। রং ঢং জানবে না। মজা করে কথা বলবে না। যদিও সারাক্ষণ হাসি মশকরা শোভন না।

ইমাম করিম সাহেব কি মসজিদে ?

কে ?

আমি ইদরিস।

কী চান ?

দু'টা কথা বলব।

করিম বিরক্ত হয়ে বের হলেন।

কী বিষয়ে কথা বলতে চান ?

তালাক বিষয়ে।

করিম বললেন, তালাক বিষয়ে আপনি কী বলবেন ?

ইদরিস বিনীত গলায় বললেন, হাফেজি পরীক্ষা দিতে আমি কিছুদিন দেওবন্দে ছিলাম। সেখানে বড় বড় আলেমদের তালাক বিষয়ে আলোচনা শুনেছি।

কী শুনেছেন ?

নবীজির এক হাদিস আছে যেখানে তিনি বলেছেন, কেউ যদি পর পর তিনবার তালাক দেয় তা এক তালাক হিসাবে গণ্য হবে। এক তালাকের পর ইদ্দতকাল পার করতে হবে। ইদ্দতের পর দ্বিতীয় তালাক আসতে হবে। তারপর আবার ইদ্দতকাল পার করতে হবে। কাজেই আপনি যে তালাক দিয়েছেন তা হয় নাই। আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ঘরসংসার করতে পারেন। তাকে হিল্লা বিবাহ দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

করিম বললেন, যে বিষয় জানেন না সে বিষয়ে কথা বলবেন না। অন্য মাজহাবের লোকজন এরকম কথাবার্তা বলে। আমরা হানাফি মাজহাবের। এই

মাজহাবে আমার তালাক বৈধ হয়েছে। আপনি কোরান শরীফ মুখস্থ করে বসে আছেন। জানেন না কিছুই।

ইদরিস বললেন, জি, কথা সত্য।

ধর্ম নিয়া আপনার কোনো কথাবার্তা বলাই উচিত না। আপনি বিবাহ করেছিলেন এক বেশ্যা মেয়েকে। শুনেছি আপনার যে মেয়ে হয়েছে সে না-কি দিনরাত হিন্দু দেবদেবীর নাম বলে।

ইদরিস বললেন, সে শুধু রাম বলে, আর কিছু না।

রামই বা কেন বলবে ? যাই হোক, সেটা আপনার ব্যাপার। এখন বিদায় হন। ধর্ম হাদিস কোরান এইসব নিয়া আর কোনো দিন আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন না।

মাওলানা ইদরিস মন খারাপ করে চলে এলেন। মীরার জন্যে তাকে এখন ভালো যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। বান্ধবপুরের বাইরে থেকেও হিন্দু মেয়েরা মীরাকে দিয়ে শাঁখা সিঁদুর ছোঁয়াতে আসছে। মীরার ডান পা ডুবানো পানি খেলে না-কি অনেক অসুখ সারছে। বিশেষ করে এই পানি শূলবেদনায় অব্যর্থ। ভক্তজনের কাছে মীরার পা ভেজানো পানি বিতরণ করার দায়িত্ব শ্রীনাথ নিজের কাঁধে নিয়েছেন। এই পানি খাবার নিয়মও আছে। পূর্ণিমা এবং অমাবশ্যার রাত ছাড়া খাওয়া যাবে না। পানি খাবার পর আর কোনো খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না। এইসব নিয়মকানুন তিনি না-কি স্বপ্নে পেয়েছেন। স্বপ্নে সাদা কাপড়ে সমস্ত শরীর এবং মুখ ঢাকা এক মহিলা এসে বলেছেন, শ্রীনাথ, তুই আমার সেবায়েত। কেউ যদি পা ভেজানো পানি চায় তুই দিবি এবং রোজ একবার আমার কানে শাঁখের শব্দ শুনাবি। শ্রীনাথ কিছুদিন হলো শাঁখ বাজাতে শুরু করেছেন। যখন তখন বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠছে।

সন্ধ্যা মিলিয়েছে। লাবুস পুকুরঘাটে বসে আছে। আজ হঠাৎ শীত পড়েছে। উত্তরী হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই হাওয়ার স্থানীয় নাম পাগলা হাওয়া। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে গারো পাহাড় ডিঙিয়ে এই হাওয়া এসে শীত নামায়। কিছু সময়ের জন্যে মনে হয় শীতকাল। প্রকৃতি ভ্রান্তি তৈরি করে। লাবুস বসে আছে খালি গায়ে। অসময়ের শীত গায়ে লাগাতে তার ভালো লাগছে। লাবুসের সামনে হুক্কা। হুক্কায় তামাক পুড়ছে। লাবুস তামাক খায় না। হাদিস উদ্দিন তারপরেও নিয়ম করে হুক্কা জ্বালিয়ে লাবুসের সামনে রাখছে। হাদিস উদ্দিনের ধারণা কোনো একদিন মনের ভুলে ছোটকর্তা হুক্কার নলে টান দিয়ে বসবেন। আস্তে আস্তে অভ্যাস ধরে যাবে।

তার ওস্তাদ দরবার মিয়া আয়েশ করে তামাক খেতেন। গভীর রাতে হুক্কা টানার গুড়ুক গুড়ুক শব্দ শোনা যেত। সেই শব্দ আধো-ঘুম আধো-জাগরণে শোনার আনন্দই আলাদা। হাদিস উদ্দিন ছোটকর্তার কাছ থেকেও এটা আশা করে।

লাবুসের পাশের সিঁড়িতে শ্রীনাথ এসে বসলেন। হঠাৎ শীত নামায় তিনি কাবু হয়ে পড়েছেন। চাদর গায়ে দিয়েছেন। কানঢাকা টুপি পরেছেন। তারপরেও শীত যাচ্ছে না।

লাবুস বলল, কিছু বলবেন ?

শ্রীনাথ বললেন, একটা বিষয়ে আপনার অনুমতি নিতে এসেছি। সকলের স্বার্থে আপনি আশা করি অনুমতি দিবেন। আমি একটা মন্দির দিতে চাই।

কী দিতে চান ?

মন্দির। মন্দিরের নাম মীরা মায়ের মন্দির।

ও আচ্ছা।

এই মন্দিরে কোনো মূর্তি থাকবে না। মীরা মায়ের ছবি থাকবে।

ও আচ্ছা।

আপনি কি অনুমতি দিয়েছেন ? আপনি অনুমতি না দিলেও মন্দির আমাকে দিতেই হবে। আমি মায়ের আদেশ পেয়েছি। মা স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমাকে বলেছেন, আমি হেথায় হোথায় ঘুরে বেড়াই, আমার ভালো লাগে না। তুই আমার থাকার একটা জায়গা করে দে।

আপনি সত্যি স্বপ্নে দেখেছেন ?

অবশ্যই। যদি মিথ্যা বলে থাকি যেন আমার শরীরে কুষ্ঠ হয়। সারা অঙ্গ গলে গলে পড়ে।

লাবুস বলল, মিথ্যা আপনি বলেন নাই। সত্যি বলেছেন। এরকম স্বপ্ন আপনি দেখেছেন। মানুষ যা চিন্তা করে স্বপ্নে তাই আসে। স্বপ্নের কোনো মূল্য নাই। আমি আমার এখানে আপনাকে মন্দির বানাতে দিব না। মীরাকে নিয়ে যে ঝামেলা আপনি করছেন সেই ঝামেলাও আপনাকে আর করতে দিব না। মীরা আমার বোন। সৎ বোন। আমার যিনি মা, মীরারও তিনি মা। আপনি জানেন না ?

জানি।

লাবুস হঠাৎ খানিকটা উৎসাহিত হয়ে বলল, মন্দির আমি বানাতে না দিলেও আপনি কিন্তু মন্দির বানাবেন। বড় মন্দির, পাকা দালান। মন্দির বানানোর টাকা আপনি কোথায় পাবেন আমি জানি না। তবে বানাবেন।

শ্রীনাথ বললেন, কীভাবে জানলেন ?

আমি মাঝে মাঝে ভবিষ্যতের কিছু জিনিস চোখের সামনে দেখি। কীভাবে দেখি জানি না, কিন্তু দেখি। আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না। এখন যান।

শ্রীনাথ বললেন, মন্দির কবে নাগাদ বানাব ?

লাবুস বলল, দিন-তারিখ বলতে পারব না। আমি ঘটনা দেখি। দিন-তারিখ দেখি না।

শ্রীনাথ ইতস্তত করে বললেন, অন্য একটা বিষয়ে আপনাকে কি একটা প্রশ্ন করব ?

করুন।

আপনাদের ধর্মে হিল্লা বিবাহ বলে একটা ব্যাপার আছে। সেই বিবাহ কি শুধু মুসলমানের সঙ্গে হতে হবে ? অন্য কোনো ধর্মের পুরুষের সঙ্গে হবে না ?

লাবুস বলল, আমি জানি না। নিয়ম থাকলে আপনি কি রাজি হতেন ?

শ্রীনাথ জিভে কামড় দিয়ে বললেন, রাম রাম! এটা কী বললেন ?

লাবুস বলল, আপনার মনে গোপন ইচ্ছা আছে বলেই বললাম। গোপন ইচ্ছা না থাকলে এরকম প্রশ্ন করতেন না। পুরুষমাত্রই লোভী। এখন আপনি আমার সামনে থেকে যান। আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

আপনি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন ?

না। আমি কারো উপর বিরক্ত হই না।

ইমাম করিম খেতে বসেছেন। তাকে খাবার দেয়া হয়েছে উঠানে। দরজার পাশে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শরিফা তদারকি করছে। ইমাম ডাকলেন, শরিফা।

শরিফা হাতের পাখা দিয়ে দরজায় বাড়ি দিল। এর অর্থ সে শুনছে। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ। তবে আকারে ইঙ্গিতে প্রশ্নের জবাব দেয়া যায়। এতে দোষ হয় না।

করিম বললেন, আজ তোমার হিল্লা বিবাহের কথা প্রকাশ্যে বলেছি। মনে হয় অতি দ্রুত ব্যবস্থা হবে। এরপর আগের মতো সংসার করতে পারব। তোমার জন্যে সারাক্ষণ আমার মন কান্দে। তোমারে যে এতটা পছন্দ করতাম আগে বুঝি নাই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করেছ ? ক্ষমা করলে পাখা দিয়া দুটা বাড়ি দেও।

শরিফা দু'টা বাড়ি না, সে ঠুক ঠুক করে ক্রমাগত বাড়ি দিয়েই যেতে লাগল। এর অর্থ কী করিম বুঝতে পারছে না। শরিফাকে দেখতে পেলে করিমের ভালো লাগত। শরিফার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

করিম বললেন, শরিফা কী বলতে চাও বুঝি না তো। মুখে কথা বলো। অসুবিধা নাই।

শরিফা চাপা গলায় বলল, আমি হিল্লা বিবাহ করব না।

চাও কী তুমি?

আপনারে নিয়া দূরদেশে পালায়া যাব। যেখানে কেউ আমারে চিনব না। আমি যে আপনের তালাকি বউ কেউ জানব না।

কোন দূরদেশে যাইতে চাও?

আসাম।

করিম ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আসামে গেলে কেউ জানব না তা ঠিক আছে। কিন্তু আল্লাহপাক তো জানবেন। না-কি তোমার ধারণা উনিও জানবেন না?

শরিফা চুপ করে গেল। করিম অনেক রাত পর্যন্ত তার ফোঁপানো শুনল।

৩০ জুলাই ১৯৪১ সন। সকাল ন'টা। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ শুয়ে আছেন। তাঁর শরীরের অবস্থা ভালো না। তিনি অসহায় এবং অস্থির বোধ করছেন। তাঁকে বড় বড় ডাক্তাররা ঘিরে আছেন। বিধান রায় এসেছেন, নীলরতন সরকার এসেছেন। বিখ্যাত শৈলচিকিৎসক মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছেন।

মোহনলাল একটা অপারেশন করতে চাচ্ছেন। তিনি নিশ্চিত যে, অপারেশন কবির জন্য মঙ্গলজনক হবে।

বিধান রায় রাজি না। তিনি বলছেন, আমার মন সায় দিচ্ছে না।

মোহনলাল বললেন, চিকিৎসা বিজ্ঞান মন দিয়ে চলে না। অপারেশন না করা ভুল হবে।

বিধান রায় তারপরেও জেদির মতো বলছেন, না।

রবীন্দ্রনাথ ইশারা করলেন যেন একজন কেউ খাতা-কলম নিয়ে বসে। তাঁর মাথায় কবিতা এসেছে। নিজের হাতে লেখার সামর্থ্য নেই। তিনি মুখে মুখে বলবেন, কেউ একজন লিখবে। তিনি ক্ষীণ স্বরে লাইনগুলি বলছেন। প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করছেন, যেন শ্রুতিলিখনে ত্রুটি না হয়। এমন হতে পারে যে, তিনি শুদ্ধ করার সময় পাবেন না। জীবনের সর্বশেষ রচনায় ভুল থেকে যাবে।

তোমার সৃষ্টির পথ

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী!
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে!
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।

তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক, অন্তরে সে ঋজু
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে-ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার॥

মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অপারেশন করলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই অপারেশন হলো। রবীন্দ্রনাথ চোখ বন্ধ করলেন, আর খুললেন না। ২২শে শ্রাবণ দুপুর বারোটা দশ মিনিটে তিনি এমন এক ভুবনের দিকে যাত্রা শুরু করলেন যে ভুবনকে তিনি তাঁর রচনায় গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে চিহ্নিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতিকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন একশ' বছর। তাঁর মৃত্যুর ত্রিশ বছর পর বাংলাদেশ নামের যে রাষ্ট্রের জন্ম হলো সেই রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতটিও তাঁর রচনা।

ধনু শেখ পালকি নিয়ে পাখি শিকারে বের হয়েছেন। হাওরে শীতের হাঁস নেমেছে। দেশান্তরী পাখির মাংস তিনি খান না। বহুদূর দেশ থেকে উড়ে আসে বলে এদের পাখা শক্ত, মাংসও শক্ত। মাংসে বালি বালি স্বাদ বলে এইসব বিদেশী পাখির আরেক নাম বালিহাঁস। এত ঝামেলা করে বালি খাওয়ার কোনো মানে হয় না। ধনু শেখ হরিয়াল শিকারে বের হয়েছেন। হরিয়াল ঘুঘু সাইজের পাখি। গায়ের রঙ সবুজ মেশানো হলুদ। এই পাখি বটগাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। বটফল খায়। অন্যসব পাখি মাছ খায়, শামুক ঝিনুক খায়। হরিয়ালের খাদ্য ফল বলেই এর মাংস অতি সুস্বাদু। মাখনের মতো নরম।

ধনু শেখের সঙ্গে যাচ্ছেন ইমাম করিম। গুলিবিদ্ধ পাখিকে তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলে জবেহ করবেন, তখনি শুধু মাংস হালাল হবে।

পালকির দরজা খোলা। ইমাম দরজার পাশে আছেন। ধনু শেখ গল্প করছেন। ইমামকে হ্যাঁ হুঁ দিতে হচ্ছে। বড় মানুষদের সঙ্গে গল্পগুজবের কিছু নেই। বড় মানুষরা গল্প করবেন অন্যরা শুধু হুঁ দিবে। ধনু শেখের গন্তব্য তিন বটের মাঠ। বান্ধবপুর থেকে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে। যেতে সময় লাগে। তিন বটের মাঠে বটগাছের সংখ্যা কিন্তু তিন না, চার। এই চার বটগাছ চক্রাকারে বড় হয়েছে। অতি দর্শনীয় ব্যাপার।

ধনু শেখ বললেন, বটগাছের সংখ্যা চার। কিন্তু নাম তিনবটের মাঠ। কারণ কী ইমাম?

করিম বলল, জানি না জনাব।

ধনু শেখ বললেন, জগতের বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তর একটাই— জানি না। আফসোস। তুমি কখনো তিনবটের মাঠে গিয়েছ?

জি-না।

বড়ই সৌন্দর্য। ভাদ্র মাসে সেই মাঠে হাওরের পানি উঠে। চারটা বটগাছের মাথা শুধু দেখা যায়। আর কিছু না। এই দৃশ্য একবার যে দেখবে সে ভুলবে না। পানির উপরে বটগাছের মাথা। সেই মাথায় কিচিরমিচির করছে হরিয়াল। এক গাছ থেকে উড়ে অন্যগাছে বসছে। মনে হয় বেহেশতেও এত সুন্দর দৃশ্য নাই।

করিম বললেন, বেহেশতের সৌন্দর্য বুঝার ক্ষমতা মানুষের নাই জনাব। পৃথিবীর সৌন্দর্য একরকম, বেহেশতের সৌন্দর্য অন্যরকম।

তাও ঠিক। বেহেশতে তো যেতে পারব না। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর তা দেখাই আমার জন্যে যথেষ্ট। এখন বলো, তোমাকে এত চিন্তাযুক্ত লাগছে কেন?

করিম জবাব দিল না।

ধনু শেখ বললেন, মনে ফুর্তি রাখা আমাদের কর্তব্য। মাসে কমপক্ষে একবার রক্ত দর্শন করলে মনে ফুর্তি আসে। মেয়েছেলেদের মনে ফুর্তি থাকে বেশি, কারণ তারা প্রতি মাসে একবার রক্ত দেখে। আমাদের পুরুষদের এই সুবিধা নাই বিধায় আমাদের পশুপাখি শিকার করতে হয়। পশুপাখির রক্ত দেখতে হয়। বুঝেছ?

জি।

তোমার স্ত্রীর হিল্লা বিবাহের কিছু কি হয়েছে?

এখনো হয় নাই।

কিছুই বুঝলাম না! কেন কেউ আগায়া আসতেছে না? শুনেছি তোমার স্ত্রী রূপবতী, বয়সও অল্প।

করিম জবাব দিলেন না। ধনু শেখ বললেন, মন দিয়া শোন কী বলি। আমি এক রাতের বিবাহে রাজি আছি। তোমার একটা উপকার হবে এইজন্যেই রাজি। এই বিবাহ হৈচৈ আমোদ-ফুর্তির বিবাহ না। একরাতের মামলা। বিবাহ তো তুমি নিজেই পড়াতে পার। ঠিক না?

জি।

পাখি শিকারের পর পালকি নিয়া তোমার বাড়িতে যাব। তুমি বিবাহ পড়াবে। পালকিতে বউ নিয়া আমি আমার ঘরে যাব। পরের দিন সকালে পালকি দিয়া কন্যা তালাক দিয়া ফেরত পাঠাব। তুমি নিজের স্ত্রী ফেরত পাইবা। সুখে ঘরসংসার করবা। ঠিক আছে?

করিম জবাব দিল না। হরিয়াল শিকারে ধনু শেখ কেন তাকে নিয়ে এসেছেন তা এখন স্পষ্ট হয়েছে। ধনু শেখ বললেন, চুপ করে আছ কেন বুঝলাম না। এমন কোনো নিয়ম কি আছে যে যার সঙ্গে হিল্লা বিবাহ হবে তার ঠ্যাং থাকতে হবে? লুলা পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হবে না।

এরকম কোনো নিয়ম নাই।

তাহলে তো তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। মুখ ভোঁতা করে রাখছ কেন? হাসো। স্ত্রীর অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হবে এইজন্যে মন খারাপ? এক রাতের মামলা।

তিনবটের মাঠের বটগাছ দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। চারদিকে খোলা প্রান্তর, মাঝখানে হঠাৎ ঝুড়ি নামানো চারটা বিশাল বটগাছ। হরিয়াল পাখির ঝাঁক এক গাছ থেকে আরেক গাছে যাচ্ছে, এই দৃশ্য এতদূর থেকেও দেখা যাচ্ছে।

ধনু শেখ বললেন, আমি শুনেছি বিসমিল্লাহ্ বলে যদি গুলি করে পাখি মারা হয় তাহলে সেই পাখি হালাল।

ভুল শুনেছেন। পশুপাখি শিকার কিংবা যুদ্ধের শুরু বিসমিল্লাহ্ বলে করা যাবে না।

তাহলে যুদ্ধ শুরু করব কীভাবে?

তখন বলতে হবে 'আল্লাহ্ আকবর'। আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ।

ধনু শেখ প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, তুমি কি তাবিজকবচ দিতে পার? যদি পার আমার মেয়ে আতরকে একটা তাবিজ দিবা। তার ঘুরাফিরা রোগ হয়েছে। এইখানে ওইখানে ঘুরে। কোনো একদিন জিন-ভূতের নজরে পড়বে। আমি অস্থির থাকি।

আমগাছের নিচে শিবশংকর বসে আছে। তার সামনে আতর। আতরের হাতে অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে বড়ই ভর্তা। ঢেঁকিতে বড়ই কুটে ঝাল কাঁচামরিচ দিয়ে তাকে এই ভর্তা বানিয়ে দিয়েছে হামিদা। ভর্তাটা খেতে এতই ভালো হয়েছে যে শিবশংকরের জন্যে খানিকটা নিয়ে এসেছে। আতর নিশ্চিত ভোরবেলায় আমগাছের কাছে এলেই শিবশংকরের দেখা পাওয়া যাবে।

শিবশংকর বলল, আমি বড়ই ভর্তা, আম ভর্তা এইসব খাই না।

আতর বলল, খান না কেন?

ঝাল দেয়া হয় এইজন্যে খাই না। আমি কাঁচামরিচ খেতে পারি না।

আশ্চর্য তো!

আশ্চর্যের কিছু নাই। অনেকেই অনেক কিছু খেতে পারে না। তুমি কি জানো ভারতবর্ষে কাঁচামরিচ ছিল না?

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। তারা তরকারি ঝাল করত আদা দিয়ে আর গোলমরিচ দিয়ে।

কাঁচামরিচ কোত্থেকে এসেছে?

পর্তুগীজরা নিয়ে এসেছে। শুধু কাঁচামরিচ না, তারা আলু এনেছে। এই দেশে আগে আলু ছিল না। তুমি আলু খাও?

হুঁ। তবে আমার পছন্দ কাঁঠালের বিচি। আচ্ছা, কাঁঠালও কি পর্তুগীজরা এনেছে?

না।

আতর ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ইশ কাঁঠাল যে কেন পর্তুগীজরা আনল না!

শিবশংকর বিস্মিত হয়ে বলল, পর্তুগীজরা কাঁঠাল আনলে কী হতো?

আতর বলল, আমার ভালো লাগত।

কেন?

জানি না কেন।

শিবশংকর বলল, এক টুকরা কাগজ আর একটা কলম হাতের কাছে থাকলে তোমাকে মজার একটা জিনিস দেখাতাম।

আতর চোখ উজ্জ্বল করে বলল, কী দেখাতেন?

প্রমাণ করতাম যে, এক সমান দুই।

এক সমান দুই হবে কেমনে?

এখানেই তো মজা।

আতর বলল, আমি একটা কাঠি নিয়ে আসি, আপনি মাটিতে লিখে দেখান।

আতর কঞ্চি নিয়ে এসেছে। শিবশংকরের পাশে উবু হয়ে বসেছে। শিবশংকর উৎসাহ নিয়ে আঁকাআঁকি করছে। আতর দেখছে মুগ্ধচোখে।

মনে কর,

$$x = y$$

এখন আমি উভয়পক্ষকে y দিয়ে গুণ করলাম। তাহলে কী হবে?

$$xy = y^2$$

এখন আমি উভয়পক্ষ থেকে x^2 বাদ দিলাম। তাহলে কী হবে?

$$xy - x^2 = y^2 - x^2$$

এসো এখন উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি। তাহলে কী হবে?

$$x(y-x) = (y-x)(y+x)$$

এখন উভয়পক্ষকে $(y-x)$ দিয়ে ভাগ দেব।

$$\frac{x(y-x)}{(y-x)} = \frac{(y-x)(y+x)}{(y-x)}$$

কাটাকুটি করার পর কী থাকবে?

$$x = y+x$$

যেহেতু y এবং x সমান

$$x = x+x$$
$$x = 2x$$

এখন x দিয়ে ভাগ দিলে হবে

$$1 = 2$$

শিবশংকর আনন্দিত গলায় বলল, আতর, বুঝতে পেরেছ? এক সমান দুই যে প্রমাণ করলাম।

আতর বলল, না।

খুব সহজ অংক, তুমি বুঝতে পারলে না কেন?

বুঝতে না পারলে আমি কী করব?

তোমার তো বুদ্ধি কম।

আতর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনারও বুদ্ধি কম।

শিবশংকর বলল, কেন বলছ আমার বুদ্ধি কম?

আপনি কাঁচামরিচ খান না এইজন্যে আপনার বুদ্ধি কম। যারা কাঁচামরিচ খায় না তাদের বুদ্ধি কম হয়।

কে বলেছে?

এটা সবাই জানে। আপনার বুদ্ধি কম এইজন্যে আপনি জানেন না। আপনি প্রমাণ করেছেন এক সমান দুই। আমি প্রমাণ করব আপনার বুদ্ধি নাই। করব?

কর।

একটা পাখির নাম বলেন যার ঠ্যাং তিনটা।

এরকম পাখি সত্যিই আছে?

আছে।

এ দেশের পাখি?

হুঁ।

তুমি নিজে দেখেছ?

হুঁ।

আমি জানি না।

আতর বলল, প্রমাণ হয়েছে না আপনার বুদ্ধি কম?

পাখিটার নাম বলো।

আপনি অনুসন্ধান করে বের করেন।

আতর চলে যাচ্ছে। শিবশংকর মন খারাপ করে তাকিয়ে আছে। তার খুব ইচ্ছা করছে আতরকে বলে, তুমি যে পাখির কথা বলেছ সেই পাখি আসলে নাই। তারপরেও ধরে নিলাম এরকম পাখি আছে। ধরে নিলাম আমি বোকা। তুমি চলে

যেও না। আরো কিছুক্ষণ থাক। আমার সঙ্গে গল্প কর। আমি অনেক মজার মজার জিনিস জানি। সব তোমাকে বলব।

ধনু শেখ শরিফাকে বিবাহ করে স্ত্রী নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। শরিফা জড়সড় হয়ে আছে। অকারণে চমকে চমকে উঠছে। আতর তার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করছে। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে দিয়েছে। সহজ স্বাভাবিক গলায় বলেছে, কলিকাতা থেকে কলের গান আনায়েছি। আপনি কি গান শুনবেন ? জুলেখার একটা থাল আছে। একপিঠে উনার গান, অন্যপিঠে কৃষ্ণভানুর গান।

শরিফা ক্ষীণ গলায় বলল, গান শুনব না।

আতর বলল, কাঁপতেছেন কেন ?

শরিফা বলল, ভয়ে কাঁপতেছি। খুব ভয় লাগতেছে আতর।

আতর সহজ গলায় বলল, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছেন, একজীবনে অনেকবার ভয় পাবেন। মেয়ে হয়ে জন্মানোর এটা শাস্তি।

ধনু শেখ প্রচুর মদ্যপান করে এক রাতের স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমুতে গেলেন। জড়ানো গলায় বললেন, বৌ শরিফা, তুমি বড়ই ভাগ্যবতী। ঠ্যাংওয়ালা স্বামীর সঙ্গে সংসার করলা, আবার ঠ্যাং ছাড়া স্বামীর সাথেও সংসার করলা। হা হা হা।

শরিফা আতঙ্কে এবং ভয়ে শিউরে উঠল।

ফজরের নামাজ পড়েই করিম ধনু শেখের বাড়িতে চলে এসেছে। ধনু শেখ ঘুম থেকে উঠলেন দুপুরবেলায়। করিমকে বাংলাঘরে ডেকে পাঠালেন। দরাজ গলায় বললেন, প্রচুর মদ্যপান করে রাতে শুয়েছি। শুয়েই ঘুম। স্ত্রীর সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা, আদর-সোহাগ কিছুই হয় নাই। কাজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজ আর তালাক দিব না। তালাক ফালাক যা হবার কিছুদিন পরে হবে।

করিম বলল, এসব কী বলেন ?

ধনু শেখ গলা উঁচিয়ে বললেন, কী বলি মানে ? তোমার সঙ্গে কি দলিল করেছি যে একদিন পরে স্ত্রী তালাক দিব ? বলো কোনো দলিল করেছি ?

করিম হতভম্ব গলায় বলল, আমি শরিফার সঙ্গে কথা বলব।

ধনু শেখ বললেন, অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাও, এটা কেমন কথা ? পর্দাপুষিদা বিস্মরণ হয়েছে ? যাও বিদায় হও। অনেক ত্যক্ত করেছ, আর না।

ধনু শেখ বাংলাঘর ছেড়ে অন্দরের দিকে রওনা দিলেন। তাঁকে উৎফুল্ল এবং আনন্দিত মনে হচ্ছে। পাখির মাংস রাতে খাওয়া হয় নি। রেঁধে রাখা হয়েছে।

পাখির মাংস বাসি করে খাওয়া নিয়ম। এখন লুচি এবং পাখির মাংস দিয়ে নাশতা করবেন এটা ভেবেও ভালো লাগছে। স্ত্রীর জন্যে শাড়ি গয়নার ব্যবস্থা করতে হবে। নয়া বৌ'র ফকিরনীর মতো বেশভূষা থাকবে কেন ? গলা হাত খালি দেখতেও খারাপ। নেত্রকোনায় লোক পাঠানো দরকার, লাল শাড়ি কিনে আনবে। বৌ মানুষকে লাল শাড়ি ছাড়া মানায় না।

গত দু'দিন ধরে মীরা চুপচাপ। তার মুখে রামনাম নেই। সে কোনো শব্দও করছে না। শ্রীনাথ বিব্রত অবস্থায় আছেন। মীরাকে দেখতে আসা দর্শনার্থীদের বলছেন, মা কুপিত হয়েছেন। কারো ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

নয়া বাজার থেকে বড় বাড়ির এক বৌ এসেছে মীরাকে দিয়ে কপালে সিঁদুর দেয়াতে। বৌটির নাম সরজুবালা। বারবার তার গর্ভ নষ্ট হচ্ছে। যদি মীরাকে দিয়ে সিঁদুর দেয়ালে গর্ভ রক্ষা হয়। মীরার হাতে সিঁদুরের কৌটা দেয়া মাত্র সে কৌটা দূরে ফেলে দিল। শ্রীনাথ হাহাকার করে উঠলেন, যা ভেবেছি তাই। দেবী কুপিত। পূজার ব্যবস্থা করতে হবে। দেবীর রাগ কমাতে হবে। সরজুবালা নামের বৌটি কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল।

মীরার দর্শনার্থীদের মধ্যে একজন পুরুষ— এককড়ি সাহা। যুদ্ধের কারণে তাঁর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। চালের দাম এতটা বাড়বে তিনি চিন্তাও করেন নি। বার্মা থেকে চাল আসা বন্ধ এটা ঠিক। দেশের চাল গেল কোথায় ? এককড়ি খবর পেয়েছেন কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ভুখা মানুষের না-কি ঢল নেমেছে। তারা ভাত চায় না। তাদের একটাই আকুতি— একটু ফ্যান দেন। অবস্থা যেদিকে যাচ্ছে তাতে মনে হয় না ফ্যানও পাওয়া যাবে। ঘরে ভাত রান্না হলে তবেই না ফ্যান হবে।

এককড়ি চাল ভালোই মজুদ করেছেন। বাড়ির একটি গোলা আগেই পূর্ণ করেছেন। তাড়াহুড়া করে বানানো দ্বিতীয় গোলাটিও পূর্ণ। ঠিক কত চাল আছে হিসাব না থাকলেও পাঁচশ মণের বেশি ছাড়া কম হবে না। এককড়ি এখন ঝুঁকেছেন কেরোসিন, সাবান এইসবের দিকে। অভাব আসে মিছিল করে। চালের অভাবের সঙ্গে এখন যুক্ত হবে অন্য অভাব। তেল, সাবান, কাপড় কিছুই পাওয়া যাবে না। নুনের মতো সামান্য জিনিসও না। ব্যবসার এমন সুযোগ সব সময় আসে না। সুযোগ হঠাৎ হঠাৎ আসে। সুযোগের ব্যবহার করতে হয়। এককড়ি সুযোগের ব্যবহার করছেন। কোলকাতার ছোটবাজারে তাঁর দোকান আছে। সেখানে চাল এবং কাপড় মজুদ করছেন। বিশ্বাসী লোকজন সেই দোকান দেখছে। তারপরেও এককড়ি দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। রাতে ভালো ঘুম

হয় না। চোখ বন্ধ হলেই নানান দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙে। স্বপ্নগুলির কোনো আগামাথা নাই।

একরাতে স্বপ্ন দেখলেন কোলকাতার ছোটবাজারের কাপড়ের গুদাম লুট হয়েছে। শত শত মানুষ কাপড় নিয়ে নিচ্ছে। তারা সবাই নগ্ন, কিন্তু কেউ কাপড় গায়ে দিচ্ছে না। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এককড়ি হতভম্ব হয়ে বললেন, এই তোমরা করছ কী ? তারা বলল, হুদা কাপড় খাইতে পারি না গো। লবণ দেন, লবণ দিয়া খাই। স্বপ্নে অস্বাভাবিক ব্যাপার খুবই স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়। তিনি এক ধামা লবণ এনে তাদের সামনে রাখলেন। তারা সবাই লবণের ধামার ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। স্বপ্নের পরের অংশ আরো ভয়াবহ। এক চশমা পরা বুড়ো লবণ মাখিয়ে এককড়ির গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়া শুরু করল। এককড়ি দৌড়ে পালাতে গেলেন, শত শত মানুষ তার পেছনে দৌড়াতে শুরু করল। তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। বাকি রাত আর চোখের পাতা এক করতে পারলেন না।

এ ধরনের বিকট স্বপ্ন প্রতি রাতে দেখলে মন দুর্বল হয়। এককড়ির বেলাতে তাই ঘটেছে। তিনি ঠিক করেছেন রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করবেন। মন্দিরে রোজ পূজা হবে। এই দুই দেবদেবী তাঁকে সর্ব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তিনি এসেছেন বিষয়টা নিয়ে শ্রীনাথের সঙ্গে পরামর্শ করতে। মীরার জন্যে তিনি রুপার পায়ের মল নিয়ে এসেছেন। লোকজন বলাবলি করছে— এই মেয়েতে দেবী প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনা যদি সত্যি সেরকম হয় তাহলে ছোট্ট দেবীকে তুষ্ট রাখা প্রয়োজন।

এককড়ি শ্রীনাথকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, তোমাকে একটা কাজ দিব শ্রীনাথ।

শ্রীনাথ জোড়হস্ত হয়ে বলল, ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ তো আমারে দিয়ে হবে না কর্তা। নিষেধ আছে।

নিষেধ কে করেছে ?

বললে বিশ্বাস করবেন না। এইজন্যে বলব না।

এককড়ি বললেন, বিশ্বাস যাব না কেন ? তুমি অনেক দিনের বিশ্বাসী মানুষ।

শ্রীনাথ চাপা গলায় বলল, দেবী সীতা স্বয়ং বলেছেন। তিনি বলেছেন, দিনরাত রাম-সীতা নাম জপবি। অন্যকিছু মনে স্থান দিবি না। এখন তাই করি।

এই বিষয়েই তোমার সঙ্গে কথা বলব। আমি মন্দির বানাবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মন্দিরে দিনরাত নামজপ হবে। তোমার পরামর্শ দরকার।

মন্দির কার হবে ? রামমন্দির হলে বিবেচনা করতে পারি।

আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিব। আগে আলোচনা পরে সিদ্ধান্ত।

এককড়ি ফিরে যাবার আগে লাবুসের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। লাবুস এখন অঞ্চলের বিশিষ্টজন। বিশিষ্টজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে হয়।

লাবুস শ্বেতপাথরের ঘাটে বসে ছিল। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। কিছুক্ষণ আগে পাঁচটা বিমান পাখির মতো ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেছে। সবার সামনে একটা, বাকি চারটা পেছনে। মানুষ শুধু যে পাখির মতো উড়তে শিখেছে তা-না, পাখির স্বভাবও আয়ত্ত্ব করেছে।

লাবুস, ভালো আছেন ? আমাকে চিনেছেন ? আমি এককড়ি।

আপনাকে চিনেছি। বসুন। তামাক খেলে খান। হাদিস উদ্দিন রোজ আমাকে তামাক বানিয়ে দিয়ে যায়। আমি খাই না। তারপরেও দেয়। আপনি ইচ্ছা করলে খেতে পারেন। আমি নলে মুখ দেই নাই।

এককড়ি বললেন, নলে মুখ দিলেও অসুবিধা নাই। মহাবিপদে কোনো হিন্দু মুসলমান নাই। সব সমান। দেশের এখন মহাবিপদ। চূড়ান্ত অভাব। শুনেছি কলিকাতার রাস্তায় এখন ফ্যানের জন্যে মিছিল। আপনিও নিশ্চয়ই শুনেছেন ?

আমি এই বিষয়ে কিছু জানি না।

আমি জানি। আমার কাছে কাগজ আসে। *কলিকাতা সমাচার*। আপনি যদি চান কাগজ পড়ার পর আপনার কাছে পাঠায়ে দিব।

লাবুস বলল, পাঠাতে হবে না।

এককড়ি তামাক টানতে টানতে বললেন, ঠিকই বলেছেন, খারাপ সংবাদ যত কম জানা যায় ততই ভালো। এদিকে রাশিয়া তো শেষ। হিটলার স্টালিনগ্রাদ দখল করে বসে আছে। স্টালিনগ্রাদ দখল মানে রাশিয়া দখল। নাম শুনেছেন স্টালিনগ্রাদের ?

জি-না।

বিরাট শহর। রাশিয়ার কলিজা। হিটলার সেই কলিজা চাবায়ে খেয়ে ফেলেছে। বাপকা ব্যাটা। রাশিয়ার যিনি প্রধান তাঁর নাম স্টালিন। হিটলারের নাম শুনেই তিনি এখন মুতে দিচ্ছেন। দিনের মধ্যে কয়েকবার তার কাপড় নষ্ট হয়।

ও আচ্ছা।

এদিকে আবার মরুভূমির শিয়াল শুরু করেছে হক্ক হুয়া।

বুঝলাম না।

হিটলারের সেনাপতি রুমেলকে আদর করে সবাই ডাকে মরুভূমির শিয়াল। শিয়ালের মতো বুদ্ধি, এই কারণে শিয়াল ডাকে। সে আফ্রিকা খেয়ে ফেলেছে। চার পাঁচ মাসের মামলা, দেখবেন সারা পৃথিবী চলে যাবে হিটলার বাবাজির দখলে।

লাবুস অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, যাবে না।

এককড়ি বললেন, কী বললেন ?

হিটলার পরাজিত হবে।

আপনাকে কে বলেছে ?

লাবুস চুপ করে রইল। তাকে কেউ কিছু বলে নাই। কিন্তু সে জানে। কীভাবে জানে সেটা এক রহস্য। এই রহস্য নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করা দরকার। কার সঙ্গে আলাপ করবে ?

এককড়ি দুই দফা তামাক খেয়ে হৃষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন। আজ তাঁর মন ভালো। মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। রাধাকৃষ্ণের মন্দির বানাবেন। রামমন্দিরে তাঁর পুষবে না। রাম কোনো কাজের দেবতা না। দুর্বল দেবতা। যে তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারে না সে দেবতাদের মধ্যেই পড়ে না। মন্দিরের পেছনে একসঙ্গে অনেকগুলি টাকা বের হয়ে যাবে। তা যাক। মন্দিরের জন্যে দেবদেবী তাঁকে রক্ষা করবেন। সবার রক্ষাকর্তা দরকার। ইউরোপের রক্ষাকর্তা হিটলার। তাঁর রক্ষাকর্তা রাধাকৃষ্ণ। তিনি ভক্তিভরে রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

সন্ধ্যা অনেক আগে মিলিয়েছে। পুকুর থেকে ধোঁয়ার মতো বোনকা দিয়ে কুয়াশা উঠছে। লাবুস আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে। হঠাৎ হঠাৎ কিছু দৃশ্য খুব মনে লেগে যায়। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, কী সুন্দর ! কী সুন্দর !

মাওলানা ইদরিস মেয়েকে কোলে নিয়ে পুকুরঘাটে এসে বসলেন। লাবুস বলল, কিছু কি বলবেন ?

ইদরিস বললেন, আমি কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যাব। তোমার বোনকে দেখেশুনে রাখবে।

লাবুস বলল, অবশ্যই রাখব। আপনি কোথায় যাবেন ?

বগুড়া যাব। মহাস্থান বলে একটা জায়গা। তুমি কি আমাকে হাতখরচ দিতে পারবা ?

পারব।

জমিদার শশাংক পালের কাছে আমি একটা ওয়াদা করেছিলাম। ওয়াদা রক্ষা করতে যাব। কী ওয়াদা জানতে চাও ?

না।

তোমার বিষয়ে হাদিস উদ্দিন কিছু অদ্ভুত কথা বলেছে।

কী কথা ?

সে একদিন সন্ধ্যায় দেখে পুকুরঘাটে দুইজন লাবুস বসে আছে।

লাবুস সহজ গলায় বলল, মানুষ অদ্ভুত কথা বলতে পছন্দ করে। সাধারণ জীবন তার পছন্দ না। এর মধ্যেও সে রহস্য নিয়ে আসতে চায় বলেই এইসব বলে।

ইদরিস বললেন, রহস্য সে কেন আনতে চায় ?

লাবুস বলল, যে জিনিস নাই তার জন্যে মানুষ থাকে ব্যস্ত। রহস্য বলে কিছু নাই, কিন্তু মানুষ রহস্য বিশ্বাস করে।

ইদরিস বলল, রহস্য নাই কথাটা ঠিক বললা না। মেরাজের সময় আল্লাহপাকের সঙ্গে নবীজির সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয় তার ষাটভাগ জাহেরী। চল্লিশভাগ বাতেনী। অর্থাৎ রহস্যের কথা।

লাবুস বলল, পুষ্পরানিকে নিয়া ভিতরে যান। তার ঠান্ডা লাগবে।

ইদরিস উঠে দাঁড়ালেন। লাবুস বলল, বগুড়া থেকে ফিরে আপনি অদ্ভুত একটা বিষয় দেখবেন। খুবই আনন্দ পাবেন।

ইদরিস অবাক হয়ে বললেন, কী দেখব ?

লাবুস বলল, আপনি দেখবেন পুষ্পরানি কথা বলা শুরু করেছে। সে দিনরাত কথা বলবে।

তুমি জানো কীভাবে ?

লাবুস হাসতে হাসতে বলল, এটা একটা বাতেনী কথা।

ধনু শেখ আজ মদ্যপান করেন নি। মদ্যপান করলে মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। ঘুম পায়। নয়া স্ত্রী পাশে নিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে হয়। আজ রাতে তিনি এই সমস্যার ভেতর দিয়ে যাবেন না। ধনু শেখ বাংলাঘরে তামাক খাচ্ছেন। অতিরিক্ত জর্দা দিয়ে পান খাবার কারণে মাথা ঘুরছে। তিনি মাথার ঘূর্ণন কমানোর জন্যে অপেক্ষা করছেন। শরীরটা সুস্থ হলেই তিনি শোবার ঘরে যাবেন। শরিফাকে ডাকবেন। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে নেবার জন্যে ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। কোলকাতার কারিগরকে দিয়ে গদিমোড়া চাক্কাওয়ালা চেয়ার বানানো হয়েছে।

ধনু শেখের মেজাজ বেশ খারাপ। তিনি খবর পেয়েছেন ইমাম করিম তাঁর বাড়ির সামনের কদম গাছের নিচে বিকাল থেকে বসে আছে। এখন রাত বাজে দশটা। হারামজাদা এখনো আছে। করিমকে তিনি ডেকে পাঠাবেন না-কি পাঠাবেন না এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। দেখা হলে অতিরিক্ত রাগারাগি

করে ফেলতে পারেন। কবিরাজ আশু ভট্টাচার্য তাঁকে রাগারাগি করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর মাথার রগ না-কি দুর্বল হয়ে গেছে। বেশি রাগারাগি করলে রগ ছিঁড়ে মৃত্যুও হতে পারে।

ধনু শেখ মনে মনে তিনবার বললেন, আমি কোনো রাগারাগি করব না। আমি কোনো রাগারাগি করব না। আমি কোনো রাগারাগি করব না। তিন প্রতিজ্ঞার পর ধনু শেখ করিমকে ডেকে পাঠালেন।

কালো চাদর গায়ে দিয়ে করিম দাঁড়িয়ে আছে। তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। তার চোখ ডেবে গেছে। চোখের কোণে কালি। চোখ টকটকে লাল।

ধনু শেখ বললেন, শুনলাম সন্ধ্যা থেকে তুমি কদম গাছের গোড়ায় বসে আছ?

জি।

মসজিদের মাগরিবের নামাজ পড়ায়েছ?

না।

এশার নামাজ পড়ায়েছ?

না।

তোমার ইমামের চাকরি আমি নট করে দিলাম। মসজিদের জন্যে নতুন ইমাম আসবে।

করিম বলল, জনাব, শরিফার বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নিলেন?

ধনু শেখ হুকায় লম্বা টান দিয়ে বললেন, আমার কোনো পুত্রসন্তান নাই। মন বলতেছে এইবার পুত্রসন্তান হবে। পুত্রসন্তান না হওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নাই।

বুঝলাম না। আপনি হিল্লা বিবাহ করেছেন।

হিল্লা ফিল্লা বুঝি না। বিবাহ করেছি এইটা বুঝি। তুমি বিদায় হও। আইজ রাইতের পরে আমার ঘরের আশেপাশে তোমারে যদি দেখি তোমার ঠ্যাং আমি ভেঙে দেব। শরিফার বর্তমান স্বামীর ঠ্যাং ভাঙা, আগের স্বামীরও ঠ্যাং ভাঙা। বিদায় হও।

ইমাম বাংলাঘর থেকে বের হলো, কিন্তু চলে গেল না। কদম গাছের নিচে বসে রইল। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। কিন্তু তার শীত লাগছে না। শরীর দিয়ে গরম ভাপ বের হচ্ছে। চাদরের নিচে করিমের হাতে ধারালো একটা ছুরি। আসরের নামাজের পর থেকেই সে ছুরি হাতে ঘুরছে।

শরিফা আতরের ঘরের রেলিং দেয়া খাটে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তার গায়ে জরি বসানো লাল শাড়ি। ধনু শেখ এই শাড়ি নেত্রকোনা থেকে লোক পাঠিয়ে

আনিয়েছেন। তার গলায় চন্দ্রহার। হাতে বালা। পায়ে রুপার মল। গয়না সবই বেদানার, ধনু শেখের নির্দেশে আতর পরিয়ে দিয়েছে।

খাটের মাঝখানে কলের গান। আতর বলল, নয়া মা, গান দিব? গান শুনবেন?

শরিফা মাথা নাড়ল। মাথা নাড়া থেকে হ্যাঁ না কিছু বোঝা গেল না। আতর ঘুরন্ত রেকর্ডে পিন রাখল। গান শুরু হয়েছে। জুলেখার কিন্নর কণ্ঠ। যদিও রেকর্ডে লেখা 'চাঁন বিবির পল্লী গান'।

আমার গায়ে যত দুঃখ সয়
বন্ধুয়ারে করো তোমার মনে যাহা লয়।
নিঠুর বন্ধুরে
বলেছিলে আমার হবে
মন দিয়াছি এই ভেবে
সাক্ষী কেউ ছিল না সেই সময়
সাক্ষী শুধু চন্দ্রতারা
একদিন তুমি পড়বে ধরা
ত্রিভুবনের বিচার যেদিন হয়

শরিফা ফিসফিস করে বলল, কী সুন্দর গান!

আতর বলল, এই মেয়ে আমাদের অঞ্চলের কেউ চিন্তা করবে?

শরিফা বলল, কেউ চিন্তা করবে না। তার সঙ্গে দেখা হইলে সামনে বসায়া দুইটা গান শুনতাম।

সত্যই দেখা করতে চান?

শরিফা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আতর বলল, আমগাছে সুতা ঝুলায়া আসবেন, মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। আমি একটা সুতা ঝুলাইছি।

কী জন্যে ঝুলাইছ?

আতর সামান্য ইতস্তত করে সহজ গলায় বলল, সুতা ঝুলাইছি যেন একজনের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। আমগাছের সুতা ছাড়া এই বিবাহ হবে না। আমার বাপজান যদি শুনে, গাঙ্গে ডুবায়া আমারে মাইরা ফেলবে।

শরিফা অবাক হয়ে তাকাচ্ছে।

আতর বলল, আমি একটা হিন্দু ছেলেরে বিবাহ করতে চাই। তার নামের প্রথম অক্ষর শ। বলেন দেখি তালিব্য শ দিয়া কী নাম হয়?

বলতে পারব না। আমি বাংলা লেখাপড়া জানি না। কোরান মজিদ পড়তে পারি। বাংলা পারি না।

শিখতে চান?

না।

না কী জন্যে?

মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে স্বামীর হায়াত কমে।

আমার বাপের হায়াত কমলে তো আপনার জন্য ভালো। উনি মানুষ মন্দ। আপনেরে কোনোদিন ছাড়বে না।

শরীফা তাকিয়ে আছে। আতর হালকা গলায় গল্প করছে। মেয়েটার গল্প শুনতে এত ভালো লাগছে। কেমন মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কথা বলে।

আতর বলল, বাপজানরে বিবাহ কইরা আপনি কিন্তু বান্ধা পড়ছেন।

শরিফা বলল, আমারও সেইরকম ধারণা।

আতর বলল, এখন না ছাড়লেও কোনো একদিন ছাড়ব। যখন আপনের কোনোখানে যাওনের জায়গা থাকব না তখন ছাড়ব। তখন আপনের না থাকব ঘর, না থাকব খাওন। আমার বড় মার এই দশা। আমার বড় মা যে জীবিত আছে জানেন?

না।

তাঁর নাম আমিনা। আমার এক সৎভাই আছে, তার নাম বাহাদুর। বড়ই সুন্দর।

আতরের গল্প শেষ হলো না। ধনু শেখ স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

ধনু শেখের মেজাজ খুবই খারাপ। তিনি পাঞ্জাবিতে সামান্য আতর দিয়েছিলেন। আতরের গন্ধে এখন গা গুলাচ্ছে। বমি আসি আসি করছে। মনে হচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় আজও হবে না। বমি করে পালংক ভাসাবেন। বমির মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বেন। অতিরিক্ত মদ্যপান করলে এই অবস্থা হয়। আজ বোতল হাতে পর্যন্ত নেন নি। জর্দা দিয়ে পান খেয়েছেন। আতর মেখেছেন।

শরিফা পালংক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লাল শাড়িতে তাকে সুন্দর লাগছে। ধনু শেখ বমি চাপতে চাপতে বললেন, শাড়ি পছন্দ হয়েছে?

শরিফা জবাব দিল না। ধনু শেখ বললেন, একটা জিনিস খেয়াল রাখবা। প্রশ্ন করলে উত্তর দিবা। উত্তর না দিলে চড় খাবা। শাড়ি পছন্দ হয়েছে?

হইছে।

এখন শাড়ি খুইল্যা ফেল। মেয়েছেলের সৌন্দর্য শাড়ি পরায় না। শাড়ি না পরায়। বুঝেছ ?

শরিফা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। ধনু শেখ হামাগুড়ি দিয়ে শরিফার কাছে এগিয়ে এলেন। শরিফার গালে আচমকা চড় বসিয়ে বললেন, প্রশ্ন করেছি জবাব দেও নাই, এইজন্যে চড় খাইলা। বুঝেছ ?

বুঝেছি।

স্ত্রীকে স্বামী বরাবর হইতে হয়। আগে তোমার স্বামী ছিল মাওলানা, তুমি ছিলা মাওলানা। এখন তোমার স্বামী মদ খাউরা। তুমিও হবা মদ খাউরা। বুঝেছ ?

শরিফা ক্ষীণ গলায় বলল, বুঝেছি।

ধনু শেখ বলল, এক দুই চুমুক কইরা খাইলেই হবে। বোতল সাফা করতে হবে না। বোতল আমি সাফা করব। ঠিক আছে ?

জি।

আইজ থাইকা শুরু হউক। তোমার ডাইন দিকের আলমিরাতে বোতল আছে। বোতল আন।

শরিফা বোতল আনতে রওনা হলো।

ধনু শেখ হুঙ্কার দিলেন।

অনেক আগে তোমারে ন্যাংটা হইতে বলছি। হও নাই। এখন হও। ন্যাংটা অবস্থায় বোতল আনবা। লজ্জা ভাঙা দরকার।

শরিফা থরথর করে কাঁপছে। গা থেকে শাড়ি খোলার চেষ্টা করছে। শাড়ি খুলছে না, আরো যেন পেঁচিয়ে যাচ্ছে।

ধনু শেখ বমি করছেন।

আতর চাঁন বিবির রেকর্ডটা আবার ছেড়েছে। সে ঝুঁকে আছে রেকর্ডের ওপর। গান শুনতে শুনতে এক চোখে পানি আসবে। এক ফোঁটা পানি রেকর্ডে পড়বে। গ্রামোফোনের পিন যখন অশ্রুভেজা জায়গাটা পার হবে তখন গান আরো মধুর লাগবে। ব্যাপারটা আতরের পূর্বপরীক্ষিত।

আতর এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলে রেকর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। একই সময় ব্রিটিশ ফিল্ড মার্শাল তাঁর ক্যাম্পে একটি রেকর্ড বাজাচ্ছেন। রেকর্ডে Waltz মিউজিক হচ্ছে। তিনি এক বোতল রেড ওয়াইন খুলেছেন। কর্ক খুলতে গিয়ে কিছু রেড ওয়াইন ছিটকে পড়েছে রেকর্ডে। তিনি গ্লাসে ওয়াইন ঢালতে ঢালতে বললেন, The wine will make the music sweeter.

তারিখ ৫ই নভেম্বর ১৯৪২ সন। মন্টোগোমারীর আনন্দের দিন। কারণ তাঁর হাতে পরাজিত হয়েছেন ট্যাংক যুদ্ধের কিংবদন্তি জার্মান ফিল্ড মার্শাল রোমেল। যুদ্ধ হয়েছে মিশরের আল আমিনে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মন্টোগোমারী জয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন।

রেডওয়াইনের গ্লাস উঁচু করে ধরে মন্টোগোমারী বললেন, রোমেলের সাহসের তারিফ করে একটা টোস্ট যদি করি খুব অন্যায় কি হবে ?

উপস্থিত চারজন ব্রিগেডিয়ারের ভেতর মাত্র একজন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। মন্টোগোমারী বললেন, ঠিক আছে, নাম না হয় উচ্চারণ নাই করলাম। বলি শুধু সাহসের প্রতি সম্মান।

এবার তিনজনই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। মন্টোগোমারী বললেন, To the courage.

গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকির ঝনঝন শব্দ হলো।

অন্যদিকে জার্মান সেনাবাহিনী ঢুকে পড়েছে স্টালিনগ্রাদে। সোভিয়েত সৈন্যরা শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। তাদের দিয়ে যুদ্ধ করানো যাচ্ছে না। সোভিয়েত নেতা স্টালিন কাপুরুষতার জন্যে ১৩ হাজার সোভিয়েত সেনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এই খবরে জার্মান জেনারেল এরিখ ভন ম্যানস্টেইন যথেষ্টই আনন্দ পেলেন। তিনি রাশিয়ান ভদকা দিয়ে টোস্ট করলেন। বললেন, To the cowards.

সাহস এবং কাপুরুষতার জন্যে একই সময় পৃথিবীর দুই প্রান্তে টোস্ট করা হলো।

মাওলানা ইদরিস মহাবিপদে পড়েছেন। কোনোদিন বগুড়ার মহাস্থান নামের জায়গা খুঁজে বের করতে পারবেন এরকম মনে হচ্ছে না। পদে পদে বিপদে পড়ছেন। খাওয়াখাদ্য নিয়েও সমস্যা। চারদিকে অভাব। ভাতের দোকান বেশির ভাগই বন্ধ। তাঁর খুঁতিতে টাকা আছে। টাকা দিয়েও খাওয়া পাওয়া যাচ্ছে না। কালীঘাটা নামে এক লঞ্চঘাটে নামার সময় তার ব্যাগ চুরি হয়ে গেল। তাকে একবস্ত্রে নামতে হলো। ব্যাগে কম্বল ছিল। রাত কাটত কম্বল মুড়ি দিয়ে। প্রচণ্ড শীতে এখন গায়ের পাঞ্জাবি সম্বল। কালীঘাটা থেকে এক্কা গাড়ি চলাচল করে। এক্কাওয়ালা তাকে উল্টোপথে নিয়ে গেল। জনমানবহীন এক বিরানভূমিতে নামিয়ে দিয়ে বলল, নাক বরাবর হাঁটেন। জঙ্গলা পাবেন। জঙ্গলা পার হবেন, মহাস্থান পাবেন।

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হেঁটে তিনি জঙ্গলা পার হলেন। মহাস্থান নামের এক কালীমন্দিরের দেখা পেলেন। মন্দিরের সেবায়েত ছোটখাটো মানুষ। মুখভর্তি জঙ্গুলে দাড়ি। দেখে মনে হয় মুসলমান। সে চাপা গলায় বলল, আপনে যাবেন বগুড়া। এটা রংপুর।

ইদরিস বললেন, এখন কী করব?

আপনি মুসলমান?

জি জনাব।

সঙ্গে টাকাপয়সা আছে?

আছে।

কত টাকা?

দুইশ টাকার সামান্য বেশি। পঁচিশ কিংবা ত্রিশ। গুনা নাই।

টাকা রেখেছেন কোথায়?

আমার খুঁতিতে বান্ধা আছে।

দেখি।

ইদরিস কোমরে বাঁধা কাপড়ের থলি বের করে টাকা দেখালেন। লোকটা টাকা দেখতে চাচ্ছে কেন এটা বুঝলেন না।

সেবায়েত বলল, আপনি বোকা কিসিমের মানুষ। আমি টাকা দেখতে চেয়েছি আপনি দেখালেন। কাজটা ঠিক হয় নাই। আপনি বলবেন, আমি ফকির মানুষ, টাকাপয়সা নাই।

টাকা তো আছে। মিথ্যা বলা ঠিক না। আপনি যখন বলেছেন তখন মিথ্যা বলব। বাঁচার জন্যে মিথ্যা বলায় দোষ নাই।

সেবায়েত বলল, খাওয়াদাওয়া হয়েছে?

জি-না জনাব।

আমার বাড়িতে চলেন। খাওয়াদাওয়া করবেন। তারপরে দেখি কী করা যায়।

আপনার অনেক মেহেরবানি।

উঠানে বসে খাওয়াদাওয়া করবেন। মুসলমানকে বাড়িতে ঢুকাব না। এত বড় পাপ করতে পারব না।

ইদরিস বললেন, আপনার অনেক মেহেরবানি। আমাকে একটা চাদর কিনার ব্যবস্থা করে দেন। শীতে কষ্ট পাইতেছি।

চাদর পাবেন না। আশেপাশে দোকান নাই। থাকলেও সেখানে কাপড় নাই। বাড়িতে চলেন দেখি কাঁথা দেওয়া যায় কি-না। মেয়েছেলের ব্যবহারী কাঁথা গায়ে দিতে আপনাদের ধর্মে কি বাধা আছে?

জি-না জনাব, আপনার অনেক মেহেরবানি।

ভাত খাওয়াতে পারব না। দেশে ভাত নাই। মিষ্টি আলু সিদ্ধ খাবেন। নুন কাঁচামরিচ দিয়ে মিষ্টি আলু সিদ্ধ পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু।

জনাব, রিজিকের মালিক আল্লাহপাক। উনি যা নির্ধারণ করে দেন তাই খাওয়া লাগে। উনার কঠিন হিসাব, সেই হিসাবের বাইরে রাজা মহারাজাও যেতে পারেন না। আর আমি একজন নাদান মানুষ।

গ্রামের বাইরে ঝুপড়ি জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি। পাকাবাড়ি, তবে এখন ভগ্নদশা। বাড়িতে মনে হয় লোকজনও নাই। চারদিক সুনসান নীরব। বারান্দায় কুপি জ্বলছে। কুপির আলোয় অন্ধকার আরো বেড়েছে। অসুস্থ কোনো অতি বৃদ্ধা আছেন। তিনি ক্রমাগত কাশছেন। কাশির দমক একটু থামলেই বলছেন— যম কই রে। আয়। আমারে নিয়া যা। তোর চরণে ধরি।

ইদরিসের কয়েক বেলার নামাজ কাজা হয়ে গিয়েছিল। মাওলানা কাজা নামাজ শেষ করে খেতে বসলেন। বড় ঝকঝকে কাঁসার থালায় তাকে খেতে দেয়া হয়েছে। শুধু যে মিষ্টি আলু তা না, গুড় মাখানো ছাতু এবং একটা কলাও আছে। মাওলানা বসেছেন উঠানের এককোণে। তার সামনে কুপি জ্বলছে। মাওলানা খাওয়া শেষ করে হাত তুলে মোনাজাত শুরু করলেন—

হে আল্লাহপাক। চরম অভাবের দিনে যারা আমাকে এত যত্ন করে খাইয়েছে তুমি তাদের প্রতি দয়া কর। তোমার রহমতের দরজা তুমি এদের জন্যে খুলে দাও। গাফুরুর রহিম তুমি দয়া কর। এদের প্রতি দয়া কর।

কপালে চওড়া করে সিঁদুর দেয়া ঘোমটা পরা একটা মেয়ে মাওলানার সামনে দাঁড়াল। তার হাতে ফুলতোলা কাঁথা। মেয়েটা নরম গলায় বলল, কাঁথাটা গায়ে দেন। শীত অনেক বেশি।

মাওলানা বললেন, মা শুকরিয়া।

বৌটি গলা নামিয়ে বলল, এখন আমার কথা মন দিয়া শুনেন। সে আঙুল উঁচিয়ে বলল, তালগাছ কি দেখা যায়?

মাওলানা মাথা নাড়লেন। অনেক দূরে কুয়াশার মতো তালগাছ দেখা যাচ্ছে।

দৌড় দিয়া তালগাছ পর্যন্ত যাবেন। সেখানে নদী পাবেন। নদীর নাম করতোয়া। নদী বরাবর দক্ষিণমুখী হাঁটবেন। সারারাত হাঁটবেন। থামবেন না। আমার স্বামী লোক খারাপ। আপনার সঙ্গে টাকাপয়সা আছে আপনি তাকে বলেছেন। সে লোক আনতে গেছে। টাকাপয়সা কেড়ে নিবে। আপনাকে মেরেও ফেলতে পারে। এই কাজ সে আগেও কয়েকবার করেছে। দাঁড়ায়া আছেন কেন? দৌড় দেন।

মা, আপনার নাম?

আমার নামে আপনার প্রয়োজন নাই। যা করতে বললাম করেন। হাতে সময় নাই।

নামটা বলেন মা। কোনো একদিন খাস দিলে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করব।

আমার জন্যে দোয়া করতে হবে না। আমার স্বামীর জন্যে প্রার্থনা করবেন যেন সে ভালো হয়ে যায়। আমার স্বামীর নাম লক্ষণ দেওয়ান।

বৃদ্ধা মহিলা ঘরের ভেতর থেকে কাশতে কাশতে ডাকছে, ও বৌমা! ও বৌমা!

বৌটি কুপি নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। মাওলানা দৌড়াতে শুরু করলেন। অচেনা অজানা বৌটির কথা ভেবে চোখে পানি আসছে। এখন অশ্রুবর্ষণের সময়। মেয়েটার জন্যে আল্লাহপাকের দরবারে খাস দিলে প্রার্থনা করতে হবে। মেয়ের

স্বামীর জন্যেও করতে হবে। স্বামীর নাম লক্ষণ দেওয়ান। আজকাল তাঁর নাম মনে থাকে না। এই নাম কি মনে থাকবে ? লক্ষণ দেওয়ান, লক্ষণ দেওয়ান, লক্ষণ দেওয়ান। বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেই নফল রোজা রেখে এই কাজটা করবেন।

রাত দশটার মতো বাজে। শীতের রাত বলেই নিশুতি মনে হচ্ছে। বান্ধবপুর বাজারের সব ঘরের বাতি নেভানো। লঞ্চঘাটায় কিছু আলো আছে। লাবুস পাকা পুলের উপর বসে আছে। পুলের মাথায় প্রকাণ্ড জামরুল গাছ। গাছভর্তি জোনাকি পোকা একসঙ্গে জ্বলছে নিভছে। দেখতে সুন্দর লাগছে। একটি জোনাকি অন্য একটির সঙ্গে কথা কীভাবে বলে ? আলোর সংকেতে ? জোনাকি পোকাদের কথা বুঝতে পারলে কত কী জানা যেত।

গায়ে কালো কম্বল জড়িয়ে কে যেন এদিকেই আসছে। লাবুসকে দেখে সে জামরুল গাছের আড়ালে চলে গেল। লাবুস বলল, কে ?

আমি করিম। ইমাম করিম।

গাছের পিছনে লুকায়ে আছেন কেন ?

তোমাকে দেখে শরমিন্দা হয়েছি বিধায় লুকায়ে আছি।

শরমিন্দা হয়েছেন কেন ?

আমি সবের কাছেই শরমিন্দা। যার স্ত্রী অন্যের দখলে সে তো শরমিন্দা হবে। এটা জগতের নিয়ম। স্ত্রী অন্যের সঙ্গে ঘুমায়, এই কষ্ট তুমি বুঝবা না। তুমি শাদি কর নাই।

জোর করে কেউ আপনার স্ত্রী দখল করে নাই।

তাও ঠিক। আমার কপাল মন্দ।

আপনি সামনে আসেন। একটা বিষয় নিয়া আলাপ করি।

করিম এগিয়ে এলেন। লাবুসের পাশে বসলেন।

লাবুস বলল, আপনার স্ত্রীকে আমি যে মা ডাকি এটা কি আপনি জানেন ?

করিম বিস্মিত হয়ে বলল, না। তবে তার সঙ্গে তোমার যে দেখা হয়েছিল এই বিষয়টা জানি।

লাবুস বলল, একজন পুরুষ যেমন তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে একজন স্ত্রী কি স্বামীকে তালাক দিতে পারে না ? তাহলে আপনার স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিয়ে আপনার কাছে চলে আসতে পারেন।

স্ত্রীদের এই ক্ষমতা নাই। এই ক্ষমতা শুধু পুরুষের। স্ত্রী যদি তালাক চায় তাকে তার স্বামীকে টাকাপয়সা দিয়ে কিংবা হাতেপায়ে ধরে মানাতে হবে যেন স্বামী তালাক দেয়। এটা সহি হাদিস। বোখারি শরিফ।

এটা কি ভুল না?

আসমানি কানুনের ভুল ধরা ঠিক না।

লাবুস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। করিম বললেন, আমি তোমার মা'কে একটা পত্র দিয়েছি। সেই পত্রে তাকে বলেছি পালায়া চলে আসতে। সে যদি পালায়া আসে তখন তারে নিয়া দূরদেশে চলে যাব। যেখানে কেউ তারে চিনে না। আমারেও চিনে না। আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করব।

পত্র কি পাঠায়া দিয়েছেন?

হুঁ। ধনু শেখের মেয়ে আতরের হাতে দিয়েছি। সে বলেছে পত্র পৌছায়ে দিবে। একটাই সমস্যা— তোমার মা বাংলা পড়তে জানে না।

আতর পড়ে শুনাবে।

করিম চুপ করে রইল। লাবুস বলল, শুনেছি ইমামের চাকরি আপনার চলে গেছে। নতুন ইমাম আসবে। আপনার এখন চলে কীভাবে?

করিম জবাব দিল না।

লাবুস বলল, আজ কি আপনার খাওয়া হয়েছে?

করিম এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। উঠে দাঁড়িয়ে যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে দ্রুত চলে গেল।

করিম যাচ্ছে ধনু শেখের বাড়ির দিকে। খুব কাছে সে যাবে না। দূর থেকে বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকবে। ধনু শেখের শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। করিম একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চোখ জ্বালা করছে।

শরিফা মাথা নিচু করে খাটে বসে আছে। ধনু শেখ বসেছেন তার সামনে। দু'জনের হাতেই গ্লাস। ধনু শেখ যতবার বলছেন ততবারই শরিফা গ্লাস ঠোঁটে লাগাচ্ছে। শরিফা এমনভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে যেন তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

ধনু শেখ আদুরে ভঙ্গিতে ডাকলেন, শরিফা রানি।

জি।

এখন থেকে তোমারে ডাকব রানি। স্বামী আদর করে রানি ডাকে, এটা অনেক বড় ব্যাপার। বুঝেছ?

বুঝেছি।

চুমুক দাও। গ্লাস হাতে নিয়া বইসা থাকবা না। এইটা একটা ঢং। ঢং করবা না। ঢং আমার পছন্দ না।

শরিফা গ্লাসে চুমুক দিল।

ধনু শেখ বললেন, তোমার বিষয়ে আমার দিলখোশ হয়েছে। তোমারে নিয়া আমি কিছুদিনের জন্যে কলিকাতা যাব। ফুর্তির জায়গা দুনিয়াতে একটাই। কলিকাতা। বায়োস্কোপ দেখবা। বাইজি নাচ দেখবা। ঠিক আছে?

জি।

হাসিমুখে বলো ঠিক আছে। প্যাঁচার মতো মুখ কইরা কথা বলবা না। তুমি প্যাঁচা না। এক অক্ষরের কথা বলাও বন্ধ কর। তুমি টিকটিকি না যে সবকিছুতে বলবা— টিক টিক। এখন হাসিমুখে বলবা, আমি বাইজি নাচ দেখব।

শরিফা হাসিমুখে বলার চেষ্টা করল, আমি বাইজি নাচ দেখব। বলতে পারল না। মুখ আরো বিকৃত হয়ে গেল। ধনু শেখ এতেই সন্তুষ্ট হলেন। নেশাগ্রস্ত হয়ে তাঁর এমনই অবস্থা যে হাসি এবং কান্নার তফাৎ তিনি ধরতে পারলেন না।

ধনু শেখের মুখ দিয়ে লালা পড়ছিল। তিনি মুখের লালা মুছতে মুছতে বললেন, কলিকাতায় তোমার জন্যে ড্যান্স মাস্টার রেখে দিব। ড্যান্স মাস্টার তোমারে নাচ শিখাবে। ঘুংগুর পইরা তুমি নাচবা। ঝুমঝুম ঝুমাঝুম ঝুমঝুম। চুমুক দেও।

শরিফা চুমুক দিল।

ড্যান্স মাস্টারের কাছ থাইকা নাচ শিখার পর তুমি আমার সামনে ন্যাংটা নাচ নাচবা। স্বামীর সামনে ন্যাংটা নাচে অসুবিধা নাই। স্বামী যদি সুখী হয় তার জন্যে আলাদা সোয়াব। বুঝেছ?

জি।

আতর শরিফাকে চিঠি দেয় নি। চিঠি প্রসঙ্গে কিছু বলেও নি। সে শুধু বলেছে, আমার কাছে আপনার একটা জিনিস আছে। যেদিন লেখাপড়া শিখবেন সেদিন দিব। তার আগে না।

শরিফা লেখাপড়া শিখছে। আরবি পড়া সে খুব সহজে শিখে ফেলেছিল। বাংলা বড়ই কঠিন লাগছে।

জায়গাটার নাম কালীবাড়ি। মাওলানা ইদরিস সন্ধ্যাবেলা কালীবাড়ি পৌঁছলেন। শ্মশানের মতো জায়গা। লোকজন কিছু নেই। লঞ্চঘাটে একটা বাতি জ্বলছে। সব কেমন ভুতুড়ে লাগছে। রাতটা কোথাও কাটানো দরকার। মাওলানার হাঁটার অবস্থা নেই। পা ফুলে গেছে। পায়ের পাতায় ফোসকা পড়েছে। পায়ের কষ্টের চেয়েও ক্ষুধার কষ্ট প্রবল হয়েছে। ক্ষুধায় তিনি অবসন্ন। ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে, কিন্তু ক্ষুধার কারণে ঘুম আসবে বলেও মনে হয় না। ভাত খেতে ইচ্ছা করছে।

থালাভর্তি গরম ভাত হলেই হবে। আর কিছু লাগবে না। ভাতের ওপর লবণ ছিটিয়ে খেয়ে ফেলবেন। ভাত খাওয়ার পর এক জগ পানি।

মাওলানা খাবারের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না। তবে রাতে থাকার ব্যবস্থা হলো। মসজিদে থাকবেন। পাকা মসজিদ। মেঝেতে পাটি বিছানো। মসজিদে তিনি একা না। একজন সঙ্গীও আছে। সঙ্গীর নাম সরফরাজ। সুন্দর চেহারা। গোলগাল মুখ। কানঢাকা টুপি পরে আছেন। তিনি যাবেন কোলকাতা। কালীবাড়িতে লঞ্চ বদল করতে হয়। রাতে কোথাও থাকার জায়গা না পেয়ে মসজিদে উঠেছেন।

সরফরাজ সঙ্গী হিসেবে ভালো। মাওলানাকে দেখে বললেন, আপনার পায়ের যে অবস্থা তিন-চার দিন নড়তে পারবেন না। ফোসকার চিকিৎসা না করলে পায়ে ঘা হয়ে যাবে। রাতে কিছু খেয়েছেন ?

মাওলানা বললেন, জি-না জনাব।

আমার কাছে আখের গুড় আছে, খাবেন ? দুর্ভিক্ষের কারণে দেশের অবস্থা এমন যে টাকা থাকলেও খাওয়া পাওয়া মুশকিল। আখের গুড় খেয়ে পানি খান, ক্ষুধা কমবে।

সরফরাজ গুড় বের করে দিলেন। নিজেই মাটির সরায় করে পানি এনে দিলেন। মাওলানা তৃপ্তি করে পানি খেয়ে বললেন, জনাবের এশার নামাজ কি পড়া হয়েছে ? পড়া না হয়ে থাকলে আসুন দুই ভাই মিলে নামাজটা পড়ে ফেলি।

সরফরাজ বললেন, আমি মুসলমান না। যখন মসজিদে থাকার দরকার পড়ে তখন মুসলমান নাম নেই।

আপনি কোন ধর্মের ?

আমি কোনো ধর্মেরই না। মহাত্মা কবীরের অনুসারী বলতে পারেন।* মহাত্মা কবীরের নাম শুনেছেন ?

জি-না জনাব। আমি মূর্খ মানুষ।

মহাত্মা কবীর বলেছেন—

পাথর পূজে হরি মেলে তো
হাম পূজেঙ্গে পাহাড়।

অর্থ বুঝেছেন ?

জি-না।

অর্থ হলো পাথর পূজা করে যদি ভগবান পাওয়া যেত তাহলে ছোট্ট পাথর পূজা না করে আমি পাহাড় পূজা করতাম। শুয়ে পড়ুন। আপনাকে খুবই কাহিল

* ধর্মগুরু। গুরু নানকের সমসাময়িক।

দেখাচ্ছে। নামাজ টামাজ যা পড়ার কাল পড়বেন। কাজা পড়ে ফেলবেন। তাছাড়া ভ্রমণের সময় নামাজের ব্যাপারে আপনাদের কিছু রেয়াত আছে না?

জি আছে।

তাহলে আর কথা কী। টেনে ঘুম দিন।

মাওলানা ইদরিস ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর গাঢ় ঘুম হলো। ফজরের ওয়াক্তে মুসল্লিরা এসে তাঁর ঘুম ভাঙাল। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলেন, কোমরের সঙ্গে বাঁধা খুঁনিটা নেই।

নিশিসঙ্গী কবীরভক্তও নেই। শরীর কাঁপিয়ে তার জ্বর এলো। ইদরিস মসজিদের বারান্দায় কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে রইলেন। ভাগ্যকে দুষতে ইচ্ছা করছে। দুষতে পারছেন না। আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, ‘তুমি ভাগ্যকে দোষ দিও না। কারণ আমিই ভাগ্য।’

কালীবাড়ির মসজিদে তিনদিন তিন রাত প্রায় অচেতন অবস্থায় কাটালেন। চতুর্থদিনে মুসল্লিরা তাঁকে কোলকাতার এক লঞ্চে তুলে দিলেন। মসজিদে মরে পড়ে থাকার চেয়ে লঞ্চে মরে থাকুক।

মাওলানা লঞ্চের খোলা ডেকে শুয়ে আছেন। তাঁর মুখের ওপর মাছি ভনভন করছে। ডেকের এক কোনায় বাদ্য বাজনার দল বসেছে। শীত কাটানোর জন্যে তারা গান করছে। গান জমছে না। বারবার তাল কাটছে। মূল গায়ক বড়ই বিরক্ত হচ্ছে।

কালী, হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
বৃন্দাবনে এ এ এ এ...

লঞ্চ বড় নদীতে পড়ে খুব দুলছে। মাওলানার মনে হচ্ছে তিনি গড়িয়ে পানিতে পড়ে যাচ্ছেন। গানের দলের মূল গায়েনকে বললেন, বাবা, আমাকে একটু ধরেন। গায়েন তাঁর কথা শুনতে পেল না। সে কানে হাত দিয়ে লম্বা করে সুর টানল— বৃন্দাবনে এ এ এ।

রাত অনেক।

ধনু শেখ দলবল নিয়ে লাবুসের বাড়িতে এসেছেন। পাল্কিতে করে এসেছেন। পাল্কির ভেতরই বসে আছেন। তাঁর হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। তার সঙ্গীদের মধ্যে একজনের হাতে হ্যাজাক বাতি। হ্যাজাকের ঝকঝকে সাদা আলোয় লাবুসের বাড়ির উঠান আলোকিত। লাবুস এগিয়ে এলো। এত রাতে ধনু শেখের আসার কারণ সে বুঝতে পারছে না। নিশ্চয়ই বড় কোনো ঘটনা ঘটেছে।

কেমন আছ লাবুস ?

ভালো আছি।

সবকিছু কি ঠিকঠাক ?

জি ঠিকঠাক।

কোনোখানে বেতাল কিছু আছে ?

লাবুস বিস্মিত হয়ে বলল, না ! লাবুসের পাশে শ্রীনাথ এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হৈচৈ শুনে জেগেছেন। আচমকা ঘুম ভাঙায় ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছেন না।

ধনু শেখ বললেন, আমার স্ত্রী শরিফা কি তোমার বাড়িতে লুকায়ে আছে ?

জি-না।

হুট কইরা না বলবা না। চিন্তা ভাবনা কইরা বলো। তোমার এই বিশাল বাড়ির কোনো চিপায় চাপায় লুকায়া থাকতে পারে। ভালোমতো সন্ধান না কইরাই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। তুমি নিজে সন্ধান কর। আমার লোকজনও সন্ধান করবে।

জি আচ্ছা।

শরিফার সাথে আমার সামান্য মনকষাকষি হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এইসব হয়। সে রাগ করে বের হয়ে গেছে। বুঝেছ ?

জি। আপনি কি ভেতরে এসে বসবেন ?

আমারে ভিতরে নেওয়া আরো ঝামেলা। কোলে কইরা নিতে হবে। তার প্রয়োজন নাই। যেখানে আছি ভালো আছি। তোমার এখানে কি তামাকের ব্যবস্থা আছে ? ব্যবস্থা থাকলে তামাক দিতে বলো।

হাদিস উদ্দিন তামাক সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। ধনু শেখ গুড়ুক গুড়ুক করে নল টানছেন। তামাকের ধোঁয়া চিন্তা পরিষ্কারক। ধনু শেখ হাদিস উদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর নাম কী ?

হাদিস উদ্দিন।

লোকমুখে শুনি শশাংক পাল মরে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়েছেন। এই বাড়ির আশেপাশে তারে দেখা যায়। কথা কি সত্য ?

জি সত্য। ষোল আনা সত্য।

তুই কোনোদিন দেখেছিস ?

জে না।

তাহলে কীভাবে বললি ষোল আনা সত্য ?

শ্রীনাথ বাবু দেখেছেন।

শ্রীনাথটা কে ?

গোমস্তার কাজ করে।

সে কই ?

এতক্ষণ আপনার সামনেই ছিল, এখন ছোটকর্তার সঙ্গে অন্দরে গেছেন।

তারে ডাক দিয়া আন। ভূতের কী ঘটনা শুনি।

হাদিস উদ্দিন এক দৌড়ে অন্দরে ঢুকল। গভীর রাতে হঠাৎ এই কর্মব্যস্ততায় সে আনন্দ পাচ্ছে। ধনু শেখ আরাম করে হুক্কা টানছেন, এটাও তার জন্যে আনন্দের। ভালো জিনিসের মর্ম সবাই বুঝে না।

তোমার নাম শ্রীনাথ ?

জি।

চেহারা-ছবি তো ভালো না। শ্রীনাথ নাম না হয়ে বিশ্রীনাথ নাম হলে মানানসই হতো। হা হা হা।

নিজের রসিকতায় মুগ্ধ হয়ে ধনু শেখ অনেকক্ষণ হাসলেন। শ্রীনাথ শুকনা মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

শশাংক পালের ভূত তুমি নাকি দেখেছ ?

আজ্ঞে দেখেছি।

কী দেখেছ গুছায়া বলো। তার আগে বলো কতবার দেখেছ ?

অনেকবার দেখেছি।

সর্বশেষ কবে দেখেছ ? কী দেখেছ ?

শ্রীনাথ গলা খাঁকারি দিয়ে গল্প শুরু করল। এ ধরনের গল্প বলতে সে খুবই পছন্দ করে। তবে আজ গল্প বলে আরাম পাওয়া যাচ্ছে না। যারা ভূত বিশ্বাস করে না তাদের সঙ্গে ভূতের গল্প করে আরাম নেই। এরা হঠাৎ বেমাক্কা প্রশ্ন করে গল্প উলট-পালট করে ফেলে।

সন্ধ্যাবেলা আমি বাগানে গিয়েছি নিমের ডাল আনব। দাঁত মাজব। ডাল ভেঙেছি। কী কারণে যেন গাছের উপর চোখ গিয়েছে, দেখি সেখানে কে যেন বসে আছে।

গাছে কি শশাংক পাল বসা ?

জি। আমার দিকে তাকায়া আছেন, মুখে হাসি।

তুমি কী করলা ? ঝাঁকি দিয়া তারে গাছ থাইকা ফেললা ?

শ্রীনাথ গল্প বন্ধ করে দিল। এই মানুষকে ভূতের গল্প শোনানোর কোনো অর্থ হয় না। যে-কেউ গাছে ভূত দেখলে দৌড়ে পালাবে। গাছে ঝাঁকি দিয়ে ভূত মাটিতে ফেলবে না। ভূত তো ফল না যে ঝাঁকি দিয়ে গাছ থেকে ফেলতে হবে।

চুপ করলা কেন ? তারপর কী হলো বলো। শশাংক পালের ভূত কী করল ? গাছের উপর থেকে তোমার শরীরে পেসাব করে দেয় নাই তো ? শুনেছি অনেক দুষ্টভূত এই কাজ করে। পেসাব কি করেছে ?

শ্রীনাথ কী বলবে ভেবে পেল না।

শরিফাকে পাওয়া গেল না। ধনু শেখ পাল্কি উঠাতে বললেন। এখন যাবেন রঙিলা বাড়িতে। নটিবাড়িগুলো সুন্দরী মেয়েদের পালায়া থাকার জন্যে ভালো জায়গা। বাড়ির মালেকাইন এদের আগ্রহ করে স্থান দেয়। গানবাজনা শিখিয়ে একসময় কাজে লাগিয়ে দেয়। নটিবাড়িগুলোতে মেয়ের অভাব কখনোই হয় না।

রঙিলা বাড়িতে যাবার পথে ধনু শেখের সঙ্গে করিমের দেখা হয়ে গেল। করিম লঞ্চঘাটে হাঁটাহাঁটি করছে। ধনু শেখ পাল্কি থামিয়ে বললেন, কে ? ইমাম করিম না ?

করিম উঠে দাঁড়াল। যন্ত্রের মতো বলল, আসসালামু আলায়কুম।

ধনু শেখ বললেন, ওয়ালাইকুম। শরিফা যে পালায়ে গেছে এই খবর শুনছ ?

জি।

নটিবাড়িতে যাইতেছি তার সন্ধানে। যদি দেখি সে নটিবাড়িতে দাখিল হয়েছে তাহলে আর ফিরায়া আনব না। এটা দস্তুর না। আমোদ ফুর্তি করতে চাইলে তখন নটিবাড়িতে যাব। ইচ্ছা করলে তুমিও যাইতে পারবা। নটিবাড়ির মেয়েগুলার সুবিধা আছে। তারা একজনের বউ না। সকলের বউ। ভালো বলেছি না ?

করিম তীব্র চোখে তাকিয়ে আছে। ধনু শেখ করিমের তীব্র চাউনি উপেক্ষা করে বললেন, শরিফা জঙ্গলেও লুকায়ে থাকতে পারে। জঙ্গলে লোক পাঠায়েছি। ইচ্ছা করলে তুমিও যেতে পার। ঘোষণা দিয়েছি, যে শরিফারে খুঁজে পাবে তার জন্যে তিনশ' টাকা পুরস্কার।

করিমের বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে। সে কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলাল। তার চোখের সামনে দিয়ে ধনু শেখের পালকি নটিবাড়ির দিকে যাচ্ছে। পাল্কি মাত্র দু'জন টানছে। বিশাল বপু ধনু শেখকে টানতে তাদের কষ্ট হচ্ছে। এই প্রবল শীতেও তাদের সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে।

শরিফা লুকিয়ে আছে ধনু শেখের বাড়িতে। সে আছে আতরের ঘরে রাখা প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুকের ভেতরে। সিন্দুক তালাবন্ধ। চাবি আতরের ঘরের আলমারির ওপর। সিন্দুকের ওপর বিছানা করা। সেই বিছানায় ঘুমায় হামিদা। শরিফাকে

লুকিয়ে রাখায় হামিদার ভালো ভূমিকা আছে। হামিদা নৌকা ঠিক করে রেখেছে। সময় সুযোগ মতো নৌকা শরিফাকে ভাঁটির দিকে নিয়ে যাবে। ভাঁটি অঞ্চলে শরিফার দেশ। কেউ-না-কেউ তাকে আশ্রয় দিবে।

শরিফাকে লুকিয়ে রাখার অসীম সাহসী কাজটি আতর করেছে, কারণ শরিফা তার এই মেয়ের কাছে ধনু শেখের কর্মকাণ্ড সবই কাঁদতে কাঁদতে বলেছে। তাকে কোলকাতায় নিয়ে নাচ শেখানো হবে, তাকে স্বামীর সামনে নগ্ন নৃত্য করতে হবে এই তথ্যও গোপন করে নি।

আতর বলেছে, নয়া মা! বাপজানের কলিকাতা যাওয়ার আগেই আমি ব্যবস্থা নিব। আপনি চিন্তা নিয়েন না।

ধনু শেখের আগামীকাল ভোরেই কোলকাতা যাবার কথা। নিজের লঞ্চে করে যাবেন। কেবিনের ঘর ঝাড়পোছ করা হয়েছে। বিছানা বালিশ তোলা হয়েছে। তখনই আতর ব্যবস্থা নিয়েছে। ধনু শেখকে গিয়ে বলেছে, বাপজান, নয়া মা তো ঘরে নাই। লাবুস চাচার বাড়ির দিকে দৌড়ায়া যাইতে দেখেছি।

ধনু শেখ রঙিলা বাড়িতে। তাঁকে যত্ন করে রুপার বাটায় পান দেয়া হয়েছে। গোলাপ জলের হুক্কায় তামাক দেয়া হয়েছে। ধনু শেখ নিশ্চিত হয়েছেন রঙিলা বাড়িতে শরিফা নেই। তিনি ফিরে আসতে চাচ্ছেন। মালেকাইন তাকে ছাড়ছেন না। হাতজোড় করে বলেছেন, হুজুর এতদিন পর দয়া করেছেন। আজ রাতে আপনাকে ছাড়ব না। আপনার সম্মানে সারারাত গানবাজনা হবে। ভালো বিদেশী পানি আছে। এক চুমুক হলেও মুখে দিতে হবে। ধনু শেখ দোটানায় পড়ে গেছেন। মালেকাইন বলল, তের বছরের একটা মেয়ে নতুন এসেছে। ডানাকাটা পরী কেউ দেখে নাই, এই মেয়ে ডানাকাটা পরী।

মেয়ের নাম কী?

মেয়ের নতুন নাম এখনো দেওয়া হয় নাই। আপনি একটা নাম দেন।

আমি নাম দিলাম আঙুর।

ভালো নাম দিয়েছেন। তবে এই মেয়ে আঙুরের অধিক মিষ্ট। তারে কি আনব?

আনো।

শরিফাকে খুঁজতে আজ অনেক পরিশ্রম হয়েছে। এখন বিশ্রাম দরকার।

হামিদা শরিফাকে বোরকা পরিয়ে নৌকায় তুলে দিয়েছে। ছইওয়ালা বড় নৌকা। চারজন মাঝি। এরা সারারাত নৌকা বেয়ে শরিফাকে সেতাবনগরে পৌছে দিবে। সেতাবনগরে শরিফার এক ফুফু আছেন। শরিফাকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। আপাতত শরিফা সে বাড়িতেই থাকবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

নৌকার ছইয়ের দু'পাশ শাড়ি দিয়ে পর্দা দেয়া। ভেতরটা অন্ধকার। অন্ধকারে গুটিসুটি মেরে শরিফা বসে আছে। তার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না সে মুক্তি পেয়েছে।

গভীর রাতে নৌকা হাওরের মুখে পড়ল। হাওর এখন শুকিয়ে গেছে। হাওরের মাঝখান দিয়ে মূল নদীতে সামান্য পানি। নৌকা থেমেছে। মাঝিরা বিড়ি খাচ্ছে। বিড়ির উৎকট গন্ধে শরিফার বমি আসছে। সবাই নৌকা থামিয়ে একসঙ্গে বিড়ি খাচ্ছে কেন শরিফা বুঝতে পারছে না। পর্দার ফাঁক দিয়ে শরিফা দেখল মাঝিদের একজন কুপি জ্বালাচ্ছে। শরিফা বলল, নৌকা থামা কেন?

কুপি যে জ্বালাচ্ছে সে বলল, এত দূরের পথ যাব, আমরা চারজনে পাইছি মাত্র দশ টেকা। এইজন্য ঠিক করেছি আপনারে নিয়া আমরা রঙতামাশা করব। চিৎকার দিয়া লাভ নাই। কোনোদিকে জনমানুষ্যি নাই। আপোসে রঙতামাশা করলে আপনের ভালো আমরারও ভালো।

মাঝির কথা শেষ হবার আগেই পেছন দিকের পর্দা সরিয়ে একজন ঢুকে শরিফার মুখ চেপে ধরল। ভারী গলায় বলল, একজন আস, ঠ্যাং চাইপা ধর। ঠ্যাং দিয়া লাত্থি দিতে পারে। আরেকজন খিক খিক করে হাসতে হাসতে বলল, আমি 'বুনি' চাইপা ধরব। ঠ্যাং ধরব কোন কামে। হি হি হি।

সারারাত রঙতামাশা করে তারা অচেতন শরিফাকে ফেলে গেল পরিত্যক্ত এক বিষ্ণুমন্দিরে। সেখান থেকে তার স্থান হলো রঙিলা নটিবাড়িতে।

মাওলানা ইদরিস শুয়ে আছেন শিয়ালদা রেলস্টেশনের প্লাটফরমে। তিনি একা না। তাঁর মতো আরো অনেকেই আছেন। এদেরকে আলাদা করা হয়েছে, কারণ এরা মারা যাচ্ছে।

হাসপাতালে রোগীর জায়গা নেই। স্বেচ্ছাসেবীরা কিছু সাহায্যের চেষ্টা করছে। সেই সাহায্য কোনো কাজে আসছে না। মাওলানাকে সকালবেলা একটা রুটি দেয়া হয়েছে। মাওলানা রুটি খান নি। রুটি তার পাশে পড়ে আছে, সেখানে পিঁপড়া উঠেছে। মাওলানা আছেন প্রবল ঘোরে। সারাক্ষণই তাঁর মনে হচ্ছে মাথার ভেতর দিয়ে ট্রেন চলাচল করছে।

কংগ্রেসকর্মীরা সাহায্যে নেমেছে। ব্যাগে ওষুধপত্র নিয়ে এসেছে। তারা রোগীদের তালিকা তৈরির চেষ্টাও করছে। একজন খাতাকলম নিয়ে মাওলানার পাশে বসল।

আপনার নাম?

ইদরিস। মাওলানা ইদরিস।

গ্রাম ? গ্রামের নাম বলুন।

বান্ধবপুর।

কী বললেন ? বান্ধবপুর ? জেলা কি ময়মনসিংহ ?

জি।

আপনি কি কোরানে হাফেজ ?

জি।

যমুনা নামের কাউকে চেনেন ?

জি-না জনাব।

যমুনার বিয়ে হয়েছিল সুরেন নামে একজনের সঙ্গে। ডাক্তার সুরেন। যমুনা বান্ধবপুরের মেয়ে। চিনেছেন ?

না। জনাব আমি আর কথা বলতে পারতেছি না। আমারে ক্ষমা দেন।

মাওলানা ইদরিস প্রবল ঘোরে তলিয়ে গেলেন। ঘোর ভাঙলো অনেক পরে। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন একটা মেয়ে তাঁর দিকে ঝুঁকে আছে। মেয়েটা ব্যাকুল গলায় বলল, কাকু, আমাকে চিনেছেন ?

চিনেছি।

বলুন তো আমি কে ?

তুমি ললিতা। বগুড়ার।

ভালো করে আমাকে দেখে তারপর বলুন। আমি ললিতা না।

তুমি জমিদার শশাংক পালের মেয়ে ললিতা। মা কেমন আছ ? তোমার পিতা শশাংক পালের ইন্তেকাল হয়েছে।

যমুনা বলল, কাকু, আমি আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। যখন আমার কোনো আশ্রয় ছিল না তখন আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

ইদরিস ক্ষীণ স্বরে বললেন, কাঁদছ কেন ললিতা ?

কাকু, আপনাকে এই অবস্থায় দেখে কাঁদছি।

মাওলানা চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর মাথার ভেতর দিয়ে আবার ট্রেন চলাচল শুরু করেছে। একটা না, অনেকগুলো ট্রেন একসঙ্গে চলছে। ট্রেনগুলো আবার লঞ্চ ইস্টিমারের মতো ভোঁ ভোঁ শব্দে ভেঁপু বাজাচ্ছে।

যমুনার বাড়ি বাগবাজারে। দু'কামরার একতলা বাড়ি। ছোট্ট বারান্দা। বারান্দায় যমুনা আগ্রহ করে অনেক ফুলের টব রেখেছে। প্রতিটি ফুলের টবে মাধুরীলতা। এই ফুল যমুনার খুব পছন্দ। সুরেন মাধুরীলতা বলে না। সুরেন বলে যমুনা লতা।

বাড়ির দু'টি কামরার একটি যমুনা আলাদা করে রেখেছে। সেখানে তরুণ এক কংগ্রেস কর্মী থাকেন। মানুষের সেবা করার জন্যে এই মানুষটা সবসময় ব্যস্ত হয়ে থাকেন। যমুনা তাকে বড়দা ডাকে। যমুনার বড়দা লেখালেখি করেন। তিনি লেখেন মেঝেতে বসে। তাঁর সামনে থাকে মাড়োয়ারিদের ক্যাশবাক্সের মতো ছোট্ট টেবিল। যমুনা তরুণ এই লেখকের লেখার জন্যে পশমের একটি আসন নিজের হাতে বানিয়ে দিয়েছে।

এই ঘরের খাটে মাওলানা ইদরিসকে শোয়ানো হয়েছে। যমুনার বড়দা বললেন, আমার ঘর বেদখল হয়ে গেল।

যমুনা বলল, বড়দা! পৃথিবীর পাঁচজন শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে উনি একজন।

পৃথিবীটাকে এত ছোট করে দেখা কি ঠিক ?

যমুনা বলল, পৃথিবী যত বড়ই হোক, উনি পৃথিবীর পাঁচজন শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে একজন। উনার অবস্থা ভালো না। সুরেন বলেছে শ্বাসতন্ত্রে জটিল সংক্রমণ হয়েছে। বড়দা, আমি উনাকে এদেশের সবচে' বড় ডাক্তার দেখাতে চাই। তুমি বিধানচন্দ্র রায়কে নিয়ে আসবে।

সর্বনাশ উনাকে কীভাবে আনবে ?

যমুনা বলল, কীভাবে আনবে আমি জানি না। তোমাকে আনতে হবে।

বাংলার কিংবদন্তি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় রোগী দেখতে এসেছেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, রোগীর ঘরে পা দেয়া মাত্র তিনি রোগ ধরতে পারেন। রোগীর গা থেকে আসা গন্ধ তাঁকে রোগ বলে দেয়।

বিধানচন্দ্র বললেন, রোগীর অবস্থা ভালো না। নিশ্চয় রোগীর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। রোগীর দু'টা বুকেই নিউমোনিয়া, একইসঙ্গে প্রবল ম্যালিরিয়ার সংক্রমণও হয়েছে। নিউমোনিয়ার চিকিৎসা আগে হওয়া দরকার। কিন্তু আমি ম্যালেরিয়াকে আগে ধরব। রোগীকে গরম পানিতে শুইয়ে রাখতে হবে।

যমুনা বলল, উনি বাঁচবেন ?

বিধানচন্দ্র বললেন, মা, তুমি বিধানচন্দ্রকে এনেছ ? রোগী না বাঁচলে বিধানচন্দ্রের মান কি থাকে ?

মাওলানা ইদরিস তাকিয়ে আছেন। তাঁর গায়ে কম্বল। খোলা জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে কম্বলের ওপর। মাওলানা কিছুক্ষণ রোদ দেখলেন, তারপর দৃষ্টি ফেরালেন ঘরের মেঝের দিকে। সেখানে কৃশকায় কৃষ্ণবর্ণের এক যুবক মাটিতে

আসন করে এই শীতে খালি গায়ে বসেছে। তার গায়ের পৈতা ঝকঝক করছে। যুবক একমনে লিখে যাচ্ছে। একসময় এই যুবক লেখা থেকে চোখ তুললেন। তখনি মাওলানা ইদরিসের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হলো।

যুবক বললেন, আজ কি একটু ভালো বোধ করছেন ?

মাওলানা বললেন, জি জনাব। আপনার নাম ?

আমার নাম তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কী লিখছেন ?

একটা উপন্যাস লিখছি। উপন্যাসের নাম 'গণদেবতা'। *ভারতবর্ষ* নামে একটা পত্রিকা আছে সেখানে ধারাবাহিকভাবে বের হয়।

মাওলানা বললেন, আমি গল্প-উপন্যাস কোনোদিন পাড়ি নাই। হাদিস কোরান পড়েছি। কী লিখেছেন একটু পড়ে শুনাবেন ?

তারাশংকর বললেন, অবশ্যই।

> সোঁ সোঁ শব্দে প্রবল ঝড়। ঝড়ে চালের খড় উড়িতেছে, গাছের ডাল ভাঙিতেছে। বিকট শব্দে ওই কার টিনের ঘরের চাল উড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরই নামিল ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি। দেখিতে দেখিতে চারদিক আচ্ছন্ন করিয়া মুষলধারে বর্ষণ। আঃ পৃথিবী যেন বাঁচিল। ঠান্ডা ঝড়ো হাওয়ায় ভিজা মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠিতে লাগিল।

নোবেল সাহিত্য পুরস্কার কমিটির দুর্ভাগ্য, তারা বাংলার এই ঔপন্যাসিকের খোঁজ বের করতে পারেন নি। তাদের পুরস্কারের খাতায় এই মহান কারিগরের নাম উঠে নি।

হে মহান বিশ্ব ঔপন্যাসিক! আপনি 'মধ্যাহ্নে'র এক সামান্য লেখকের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা গ্রহণ করুন।

'গণদেবতা' উপন্যাসের জন্যে তারাশংকর ১৯৬৬ সনে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান।

এককড়ি ভোরবেলার কনকনে ঠান্ডায় পুকুরে মাথা ডুবিয়ে স্নান করেছেন। কোমরে লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে সাদা ধুতি পরে জলচৌকিতে বসেছেন। তাঁর পাশে অবিনাশ ঠাকুর হাতে ঘণ্টা নিয়ে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। অবিনাশ ঠাকুর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তিনি মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ করেন। চোখ বন্ধ করে উপনিষদ থেকে শ্লোক আবৃত্তি করেন। দাঁত না থাকার কারণে কথাগুলি জড়িয়ে যায়। মন্ত্র অদ্ভুত শোনায়।

> ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমাথা বলমিন্দ্রিয়ানি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম। মাইহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ; অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেহস্তু।
>
> আমার সমস্ত অঙ্গ যেন পুষ্ট হয়। তার সঙ্গে আমার প্রাণবায়ু, বাকশক্তি, দৃষ্টি, শ্রবণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও যেন শক্তিশালী হয়। ব্রহ্মার কথাই উপনিষদ বলে।

এককড়ির সামনে পিতলের থালা। থালায় জবাফুল, কিছু ধান, আম এবং বটের পাতা। লোকজন আসছে, কৌতূহলী হয়ে দেখছে। ছেলেমেয়েরা সকাল থেকেই ভিড় করে আছে। বান্ধবপুরে ছড়িয়ে গেছে— এককড়ি জোড়া পাঁঠা বলি দেবেন। সবাইকে পাঁঠার মাংস ভাগ করে দেয়া হবে।

মেয়েরা দলে দলে আসছে। এককড়ির বৃদ্ধা মা অনেক দূরে সাদা থান পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মেয়ের দল দেখলেই খনখনে গলায় চিৎকার করছেন। সাবধান, বিধবারা কেউ কাছে যাবা না। সাবধান, বিধবারা দূরে। এককড়ির মা নিজেও বিধবা। তিনিও উৎসবে থাকতে পারছেন না।

আজকের উৎসবের কারণ এককড়ির মন্দির বানানো হচ্ছে। নেত্রকোণা থেকে রাজমিস্ত্রি এসেছে। তারা আজ মধ্যদুপুর থেকে ইট গাঁথা শুরু করবে। প্রথমে তৈরি হবে দেবীর মঞ্চ। মঞ্চে দেবী স্থাপনা হবে সন্ধ্যায়। এরপরেই শুরু

হবে দেয়াল গাঁথা। মধ্যদুপুর লগ্ন শুভ। অবিনাশ ঠাকুর ছক এঁকে বের করেছেন। এই বিশেষ সময়ে মঙ্গল কৃত্তিকা নক্ষত্রে যাবে। অতি শুভ সময়।

মন্দির নির্মাণের যাবতীয় দেখাশোনা শ্রীনাথ করছেন। তাঁর আগ্রহের কোনো সীমা নাই। রামমন্দির হচ্ছে না, রাধাকৃষ্ণের মন্দিরই হচ্ছে। রাধাকৃষ্ণের মূর্তি শ্রীনাথ লাবুসের বাড়ি থেকে চাদরে জড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। তিনি এটাকে অপরাধ মনে করছেন না। দেবদেবী মুসলমান বাড়িতে অনাদরে অবহেলায় পড়ে ছিলেন। এখন পূজা পাবেন।

রাধাকৃষ্ণের এই মূর্তি হরিচরণের পরিবার পূজা করতেন। অষ্টধাতুর মূর্তি। চোখ ফেরানো যায় না এত সুন্দর।

মূর্তিটি যে চুরি গেছে লাবুসকে এই খবর দেয়া হয়েছে। খবর দিয়েছে হাদিস উদ্দিন। হাদিস উদ্দিন উত্তেজিত এবং দুঃখিত।

ছোটকর্তা, আমি হইলাম ওস্তাদ দরবার মিয়ার সাগরেদ। আমার চোখের সামনে জিনিস চুরি গেল। আমি কিছু বুঝলাম না। এই খবর শুনলে দরবার মিয়া আমার মুখে 'ছেপ' দিবেন।

লাবুস বলল, দরবার মিয়া যেহেতু শুনছেন না কাজেই তোমাকে মুখে ছেপ মাখতে হবে না।

আইজ না শুনলেন, কোনো একদিন তো শুনবেন। তখন কী উপায় হবে?

লাবুস বলল, একটা কিছু উপায় নিশ্চয়ই হবে। শান্ত হও।

ঘরের এমন দামি একটা জিনিস চুরি যাবে, আপনি কিছুই বলবেন না?

লাবুস বলল, চুরি তো যায় নাই। চোখের সামনেই থাকবে। মূর্তি দেখে সবাই আনন্দ পাবে।

হাদিস উদ্দিন বলল, কই আমি তো কোনো আনন্দ পাইতেছি না। আমার তো শইল জ্বইল্যা যাইতেছে। কপাল দিয়া গরম ভাপ বাইর হইতেছে।

লাবুস হাই তুলতে তুলতে বলল, সময়ে জ্বলুনি কমবে। এখন সামনে থেকে যাও।

সন্ধ্যাবেলা ধুমধামের সঙ্গে দেবীমূর্তি মঞ্চে স্থাপিত হলো। দেবীকে নৈবেদ্য দেয়া হলো। ভক্তরা প্রসাদ পেলেন। প্রায় সারারাত নামজপ হলো। ভোরবেলা দেখা গেল কে বা কারা মূর্তি চুরি করে নিয়ে গেছে। শুধু যে মূর্তি চুরি করেছে তা-না, যেখানে মূর্তি ছিল সেখানে এক তাল কাদা রেখে গেছে। কাদার ওপর দু'টা কাঁচকলা পাশাপাশি বসানো।

হাদিস উদ্দিনকে সকাল থেকেই খুব উৎফুল্ল দেখা গেল। সে নামাজ রোজার ধার ধারে না, কিন্তু সেদিন দুপুরে সে গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে মসজিদে জোহরের নামাজ পড়তে গেল। মসজিদে নতুন ইমাম সাহেব এসেছেন। শ্যামগঞ্জের আলীম পাশ বিরাট মাওলানা, নাম মোহম্মদ সিদ্দিক। নতুন ইমাম কেমন তা জানা প্রয়োজন।

মোহম্মদ সিদ্দিকের বয়স অল্প। সুন্দর চেহারা। গলার স্বর মিষ্টি। সমস্যা একটাই— তাঁর দাড়ি নেই। ইমাম সাহেবের দাড়ি না থাকলে কীভাবে হবে? ইমামের চাকরি দিতে গিয়ে ধনু শেখ থমকে গেলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, দুনিয়ার ইসলামি পাশ দিয়া বইসা আছ, তোমার দাড়ি কই?

ইমাম মাথা নিচু করে বলল, আমাদের বংশে দাড়ি নাই জনাব।

দাড়ি ছাড়া মাকুন্দা ইমাম লোকজন মানবে কেন?

সিদ্দিক বিনীত ভঙ্গিতে বলল, দাড়ি রাখা সুন্নত। নবীজির দাড়ি ছিল। যাদের দাড়ি হয় না তারা এই সুন্নত পালন করতে পারে না। এছাড়া আর কোনো সমস্যা নাই।

ধনু শেখ বললেন, সমস্যা যে নাই সেটা তুমি বলতেছ। সমস্যা তোমার না। সমস্যা আমার। লোকজন বলবে, ধনু শেখ ইচ্ছা কইরা মাকুন্দা নিয়া আসছে। যাই হোক, এসে যখন পড়েছ থাক। মুসুল্লিরা কেউ আপত্তি তুললে সঙ্গে সঙ্গে বিদায়।

আপত্তি তুলবে না।

আগ বাড়ায়া কথা বলবে না। আপত্তি তুলবে না তুমি জানো কীভাবে?

ইমাম সিদ্দিক চুপ করে রইল। ধনু শেখ বললেন, খাওয়া থাকা আমার বাড়িতে। বেতন দশ টাকা।

ঠিক আছে জনাব। তবে আপনার বাড়িতে থাকব না। রাতে মসজিদে থাকব।

মসজিদে কেন থাকবে?

আমি রাতে ইবাদত বন্দেগি করি। মসজিদে থাকা আমার জন্যে ভালো।

ধনু শেখ বললেন, তোমার জন্যে ভালো হলে ভালো। থাক মসজিদে, তবে সাবধানে থাকবা। এই মসজিদের কিছু দোষ আছে।

কী দোষ?

এই মসজিদের ইমামদের কিছুদিন পরই মাথা নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম ইদরিস ছিল। মাথা হয়ে গেল পুরাপুরি নষ্ট। বাজারের এক মেয়েছেলে বিবাহ

করল। এখন যে সে কোথায় আছে কেউ জানে না। তারপরে আসল করিম। বিরাট মাওলানা। সে এখন আধাপাগল হয়ে ঘুরতেছে। খবর পেয়েছি নিচুজাতের সঙ্গে এখন তার উঠাবসা। তারা চোলাই মদ বানায়, সেই মদ খায়া সে শুনেছি এইখানে সেইখানে পড়ে থাকে।

উনার কথা শুনেছি।

ধনু শেখ উগ্র গলায় বললেন, তার কথা শুনলে আমার কথাও নিশ্চয়ই শুনেছ? তার তালাক দেয়া স্ত্রীর সাথে আমার যে বিবাহ হয়েছিল এটা শুনেছ?

জি।

সেই মেয়ে যে রঙিলা নটিবাড়িতে থাকে, এটা শুনেছ?

সিদ্দিক মাথা নিচু করে ফেলল। ধনু শেখ বললেন, মাথা নিচা করলা কেন? তোমার স্ত্রী তো নটিবাড়িতে নাই। শাদি করেছ?

জি-না।

আচ্ছা এখন সামনে থেকে যাও। মিজাজ খারাপ হয়ে গেছে। আরেকটা কথা, আতর মাইখা আমার কাছে আসবা না। আতরের গন্ধে আমার মাথায় যন্ত্রণা হয়।

জোহরের নামাজ পড়তে মুসুল্লি এসেছে মাত্র একজন— হাদিস উদ্দিন। জোহর কাজকর্মের সময়। নামাজি মানুষ এমনিতেই কম আসে। তাছাড়া নতুন ইমাম এসেছে, পাঞ্জেগানা নামাজ আবার শুরু হয়েছে— এই খবর এখনো সবার কাছে পৌঁছে নি।

নামাজ শেষ করে সিদ্দিক হঠাৎ বলল, জনাব, আপনার সঙ্গে যে আল্লাহপাকের দেখা হয়েছিল এটা কি আপনার স্মরণে আছে?

হাদিস উদ্দিন হতভম্ব হয়ে বলল, এটা কী বললেন?

সিদ্দিক হাসিমুখে বলল, না জেনে বলি নাই। জেনে বলেছি।

হাদিস বলল, আপনের মাথা তো আগের দুই মাওলানার চেয়েও খারাপ।

সিদ্দিক খানিকটা ঝুঁকে এসে বলল, আল্লাহপাক মানুষ সৃষ্টির আগে মানুষের আত্মা সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তিনি সব আত্মাকে একত্র করে বললেন, বলো তোমাদের রব কে? আত্মারা সবাই একসঙ্গে বলল, আপনি আমাদের রব। এই কারণেই আপনাকে জিজ্ঞাস করলাম, আল্লাহপাকের সঙ্গে আপনার যে দেখা হয়েছিল এই ঘটনা ইয়াদ আছে কি-না? সামান্য রহস্য করে বললাম। অপরাধ নিবেন না।

হাদিস উদ্দিন নতুন ইমাম সাহেবের জ্ঞানবুদ্ধিতে এবং বিনয়ে মোহিত হয়ে গেল। সে ঠিক করল, তেমন কোনো কাজকর্ম না থাকলে মাঝেমধ্যে নামাজে আসবে। জীবনযাপন করতে গেলে দু'একটা ছোটখাটো দোষত্রুটি হয়ে যায়। নামাজের মাধ্যমে সে সব কাটান দিতে হয়।

শ্রীনাথ মূর্তি চুরির বিষয়ে কথা বলার জন্যে ধনু শেখের কাছে গিয়েছে। মূর্তি কে নিয়েছে শ্রীনাথ জানে। ধনু শেখের মতো ক্ষমতাবান মানুষ ছাড়া তা উদ্ধার করা যাবে না।

ধনু শেখ তামাক টানতে টানতে বললেন, মূর্তি কে চুরি করেছে তুমি জানো?

শ্রীনাথ গলা নামিয়ে বলল, অবশ্যই জানি। লাবুসের ইশারায় চুরিটা হয়েছে। চুরি করেছে ল্যাংড়া হাদিস উদ্দিন।

ধনু শেখ বললেন, গলা নামায়া কথা বলতেছ কেন? আশেপাশে তো কেউ নাই।

শ্রীনাথ বলল, আপনি ব্যবস্থা না নিলে জিনিস উদ্ধার হবে না।

ধনু শেখ বললেন, শুনেছি রাধাকৃষ্ণ বিরাট দেবদেবী। তারা নিজেরা নিজেদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে পারে না? ধনু শেখের সাহায্য লাগে?

শ্রীনাথ বলল, দেবদেবীরা তাদের ক্ষমতা সর্বসাধারণে দেখান না। নিজেদের কাজ অন্যকে দিয়ে করায়ে নেন। উদ্ধারের কাজটা যেমন আপনার মাধ্যমে হবে।

ধনু শেখ তামাক টানা বন্ধ করে হঠাৎ গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, শশাংক পালের ভূত দেখার গল্পটা তো তুমি শেষ কর নাই। গাছে বসে ছিল ভূত। তুমি ঝাঁকি দিয়া ফেললা। তারপরে কী হলো?

শ্রীনাথ বলল, ওই গল্প আরেকদিন শেষ করব। আপনি মূর্তির মীমাংসাটা করেন। হাদিস উদ্দিন বদমাইশটা নিয়েছে।

বুঝলা কীভাবে?

পায়ের ছাপ দেইখা বুঝতে পেরেছি। যে চুরি করতে এসেছে তার পায়ের ছাপ পড়েছে। একপায়ের ছাপ গভীর। আরেকটা পাতলা। খোঁড়া পায়ের ছাপ পাতলা।

ধনু শেখ চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, পায়ের ছাপের কারণেই আমি চুরি করতে বাইর হই না। আমি যেখানেই যাব এক ঠ্যাং-এর ছাপ পড়বে। তোমার মতো বুদ্ধিমান লোক সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলবে চোর ধনু শেখ।

শ্রীনাথ দুঃখিত গলায় বলল, জনাব, আপনি পুরা বিষয়টা নিয়া হাসি তামাশা করতেছেন। এটা হাসি তামাশার কোনো বিষয় না। শুধু যে মূর্তি চুরি করেছে তা-না। হিন্দু জাতিরে বিরাট অপমানও করেছে।

কীভাবে অপমান করেছে?

দু'টা কাঁচকলা রেখে গেছে।

ধনু শেখ বললেন, কাঁচকলার মধ্যে অপমানের কী আছে? হিন্দু বিধবারে কলা দুইটা দেও, তারা বড়া বানায়ে খেয়ে ফেলবে।

বিষয়টা নিয়া যে কত বড় সমস্যা হবে আপনি তা বুঝতে পারতেছেন না। রঙ্গতামাশা করতেছেন। এটা রঙ্গতামাশার বিষয় না।

ধনু শেখ বললেন, এখন তুমি পথে আসছ। রঙ্গতামাশার বিষয় তো অবশ্যই না। মূর্তি চুরি নিয়া হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধতে পারে। বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু মুসলমান কাটাকাটি যে শুরু করেছে এটা শুনেছ? মুসলমান পিঁয়াজ খায়, গরু খায়, এইজন্যে কাটাকাটিতে সে আগায়া আছে। এই অঞ্চলে হিন্দু যদিও বেশি, কাটাকাটি শুরু হইলে দেখবা কী অবস্থা।

শ্রীনাথ উঠে পড়ল। এই লোকের সঙ্গে কথা বলতে আসাই তার ভুল হয়েছে। উন্মাদশ্রেণীর মানুষ। কী বলে না বলে সে নিজেও জানে না। ধনু শেখ বললেন, বেয়াদবের মতো হুট কইরা উঠে দাঁড়াইলা, তার কারণ কী?

শ্রীনাথ বলল, আমার কথা শেষ, আমি চইলা যাব। বুঝেছি আপনার এখানে কোনো ফয়সালা হবে না।

কে বলেছে ফয়সালা হবে না? অবশ্যই ফয়সালা হবে। আচ্ছা শ্রীনাথ, এই মূর্তি তোমরা পাইছ কই? হরিচরণের ঠাকুরঘরে এমন মূর্তি ছিল। আমি নিজে অনেকবার দেখেছি।

শ্রীনাথ হড়বড় করে বলল, আমাদেরটা দেখতে একই রকম, কিন্তু মূর্তি ভিন্ন।

ধনু শেখ বললেন, তা হতে পারে। মানুষও একই চেহারার প্রায়ই পাওয়া যায়। এম এস বাহাদুর নামে আমার একটা লঞ্চ ছিল। সেখানে পাচক বামুন যে ছিল তার চেহারা অবিকল তোমার মতো। বিরাট চোর ছিল। একদিন তারে একশবার কানে ধরে উঠবোস করতে বললাম। বিশবার উঠবোস করে সে ধপাস করে পড়ে গেল। মিনমিন করে বলল, কর্তা আর পারব না। শ্রীনাথ শোন, মনের ভুলে কোনদিন যে তোমারেও উঠবোস করাই তার নাই ঠিক। একই রকম চেহারার কারণে ভুল হইতে পারে। মানুষ মাত্রই ভুল করে। ভালো কথা, শ্রীনাথ, তোমরার দেবদেবীরা ভুল করেন না?

শ্রীনাথ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। ধনু শেখের কাছে আসা বিরাট ভুল হয়েছে। তার উচিত ছিল মন্দিরের কাছে থাকা। রাজমিস্ত্রিদের কাজ তদারক করা। মন্দির নির্মাণ বন্ধ হয় নি। কাজ পুরোদমে চলছে।

ধনু শেখ বললেন, বেশি চালাক হওয়া ঠিক না শ্রীনাথ। আমি বেশি চালাক হয়েছিলাম, আমার ঠ্যাং চলে গেছে। ইমাম করিম বেশি চালাক হয়েছিল, তার বউ চলে গেছে। তোমার কী যায় কে জানে।

শ্রীনাথ বলল, আমার যাওয়ার মতো কিছু নাই।

তাও ঠিক। এখন গল্পটা শেষ কর।

কী গল্প ?

শশাংক পালের গল্প। এত বড় জমিদার ভূত হইয়া গাছে বসা। কী লজ্জার কথা! তারপর তুমি কী করলা ? ঝাঁকি দিয়া ভূত পাড়লা ? ভূত ধুপ্‌পুস কইরা মাটিতে পড়ল ?

ইমাম করিম মাধাই খালের পাড়ে বসে আছে। সকাল থেকেই এই জায়গায় বসে ছিল। এখন মধ্যদুপুর। কাল রাতে সে স্বপ্নে দেখেছে, কলার ভেলায় করে শরিফা খাল বেয়ে আসছে। শরিফার পরনে সুন্দর শাড়ি। বোরকা হাতে পুঁটলি পাকিয়ে ধরা। মাথায় ঘোমটাও দেয় নাই। করিম বলেছে, ছিঃ ছিঃ শরিফা, এইসব কী ? বোরকা হাতে নিয়া বইসা আছ কেন ? কতজন তোমারে দেখবে!

শরিফা বলল, দেখুক।

করিম বলল, এটা কেমন কথা বললা ? সারাজীবন তোমারে পর্দা পুশিদার কথা বলেছি।

শরিফা বলল, আপনের কথা ব্যাঙের মাথা। ভেলায় উঠেন দেখি।

করিম স্বপ্নের মধ্যেই ভেলায় উঠলেন। ভেলাটা তখন নৌকা হয়ে গেল। স্বপ্নে এই ব্যাপারগুলি এমনভাবে ঘটে যে মোটেই অস্বাভাবিক লাগে না। করিম বলল, আমরা যাই কই ?

শরিফা বলল, ভাটির দেশে যাই। ভাটির দেশে আমার স্বামী থাকে। তার সাথে ঘর করতে যাই।

তোমার স্বামী আবার কে ? আমি তোমার স্বামী।

উঁহু। আপনে আমার কেউ না।

করিম বলল, তোমারে একটা কথা বলব ?

শরিফা বলল, আপনের কথা ব্যাঙের মাথা।

করিম মাধাই খালের পাড়ে বসে আছে, একটু পরপর বিড়বিড় করে বলছে, আপনের কথা ব্যাঙের মাথা। করিম বুঝতে পারছে তার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একই কথা অসংখ্যবার বলা মাথা খারাপের প্রথম লক্ষণ।

মাথা খারাপ মানুষদের জন্যে অনেক সুবিধা আছে। তাদের জন্যে নামাজ রোজা মাফ। তারা খুন করলেও খুনের বিচার হবে না। একটা খুন করলে না, দশটা খুন করলেও না।

করিম ঠিক করে রেখেছে, পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলে সে কয়েকটা খুন করবে। পুরোপুরি পাগল সে এখনো হয় নাই। পুরোপুরি পাগল হলে গায়ে কাপড় রাখতে পারত না। পাগলের শীত-গ্রীষ্ম বোধ থাকে না। তার এখনো আছে। গা থেকে কম্বল খুলে দেখেছে শীত লাগে। পানিতে নামলে শীত লাগে। শীতের কারণে সে গোসল বন্ধ করে দিয়েছে।

করিম উঠে দাঁড়াল। ক্ষুধাবোধ হচ্ছে। কিছু খাওয়া দরকার। সে লাবুসের বাড়ির দিকে রওনা দিল। যাদের সে খুন করবে সেই তালিকায় লাবুসের নাম আছে, তারপরেও সে যায়। হাদিস উদ্দিন তাকে দেখলেই বলে— ইমাম সাব, কিছু খাবেন? হাত ধুইয়া আসেন, খানা দেই।

হাত ধুইতে পারব না, তুমি খানা দাও। হাত ধুইতে গেলে শীত লাগবে।

ময়লা হাতে খাইবেন?

মাথায় হাত মুইছা খাব। অসুবিধা নাই। পাগলের জন্যে সব মাপ।

করিম লাবুসের বাড়ির কাছাকাছি এসে মত বদলাল। ক্ষুধাটা চলে গেছে। যেহেতু ক্ষুধা নাই ওই বাড়িতে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। সে জুম্মাঘরের দিকে রওনা হলো। নতুন ইমাম এসেছে, তার সঙ্গে এখনো পরিচয় হয় নাই। পরিচয় থাকা উচিত। তাছাড়া ইমাম নতুন মানুষ। তাকে পরামর্শ দেওয়াও করিমের কর্তব্য। তাকে অঞ্চলের হাবভাব বুঝিয়ে দিতে হবে। নতুন মানুষ বিপদে যেন না পড়ে। একেক অঞ্চলের ভাব একেক রকম। রঙিলা নটিবাড়ির বিষয়টাও ইমাম সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ভুলেও যেন সেদিকে না যায়। যাওয়া দূরের কথা, ওইদিকে তাকালেও বিরাট পাপ হবে। হাবিয়া দোজখের আগুনে পুড়ে মরতে হবে। নতুন ইমাম সাহেবের জ্ঞান বুদ্ধি, হাদিস কোরানের ওপর দখল কেমন এগুলোও দেখতে হবে। আজান দিয়া নামাজ পড়াতে পারলেই ইমাম হওয়া যায় না।

ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে উঠতে গিয়ে করিম ভুরু কুঁচকে তাকাল। মনিশংকরের ছেলে শিবশংকর আসছে। করিম দ্রুত চিন্তা করল, খুন করার তালিকায় এই ছেলে আছে কি-না।

না, এই ছেলের নাম নেই। করিম হাসিমুখে এগিয়ে গেল। খুনের তালিকায় যাদের নাম নেই, তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা উচিত। করিম বলল, বাবা, কেমন আছ?

শিবশংকর বলল, বেশি ভালো না কাকু। আমার রোজ জ্বর আসছে।

ম্যালেরিয়া হয়েছে। কুইনাইন খাওয়া দরকার।

কুইনাইন খাচ্ছি।

বিসমিল্লাহ বলে খাও না তো? বিসমিল্লাহ্ বলে খেলে কাজ হবে না। ওষুধপত্র খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা নিষেধ। তখন বলতে হয় আল্লাহু শাফি। আল্লাহু কাফি।

কাকু, আমি হিন্দু।

সেটা তো জানি। জানব না কেন? পুরাপুরি পাগল তো হই নাই। যেদিন হব সেদিন হিন্দু-মুসলমান ভেদ থাকবে না। তখন আমার কাছে হিন্দুও যা, মুসলমানও তা।

শিবশংকর দুঃখিত চোখে তাকিয়ে আছে। করিম বলল, বাবা এখন যাই। পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। যদিও আমার কথা হলো ব্যাঙের মাথা। শরিফা এরকম বলে। শরিফাকে চিনেছ তো? আমার স্ত্রী। সম্পর্কে তোমার চাচি হয়। এখন সে আছে রঙিলা নটিবাড়িতে। ঠিক করেছি একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। টাকা-পয়সার জোগাড় হচ্ছে না বলে যেতে পারছি না। তাড়াহুড়াও কিছু নাই। তোমার চাচি তো আর পালায়া যাচ্ছে না। রঙিলাবাড়িতে একবার কেউ ঢুকলে পালাতে পারে না। বাকিজীবন ওইখানে কাটাতে হয়।

নয়া ইমাম মোহম্মদ সিদ্দিকের জ্ঞান-বুদ্ধিতে করিম সন্তুষ্ট হলো। সব প্রশ্নের জবাব নতুন ইমাম ঠিকঠাক দিলেন। করিম এতটা আশা করে নি।

করিম বলল, ইমাম সাহেব, বলেন দেখি হাবুতি সনটা কী? বাংলা সন, হিজরি সনের কথা সবাই জানে। হাবুতি সনের কথা জানে জ্ঞানীজন। চট করে বলেন হাবুতি সন কী?

মোহম্মদ সিদ্দিক বললেন, হযরত আদম (আঃ)-এর বেহেশত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের দিন থেকে হাবুতি সন শুরু।

করিম বললেন, হয়েছে। মাশাল্লাহ। এখন বলেন নবীদের মধ্যে সবচে' দীর্ঘ আয়ু কে পেয়েছেন, স্বল্প আয়ু কে পেয়েছেন?

সবচে' দীর্ঘ আয়ু পেয়েছেন দুই নবী। হযরত নুহ (আঃ) এবং হযরত আয়ুব (আঃ), দুইজনই ১৪০০ বছর বেঁচেছেন। আর অল্প আয়ু পেয়েছেন

দুইজন। হযরত ঈসা (আঃ), উনি বেঁচেছেন মাত্র ৩৩ বৎসর। আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদও (দঃ) অল্প আয়ু পেয়েছিলেন। তিনি বেঁচেছেন মাত্র ৬৩ বৎসর।

মাশাল্লাহ। শেষ প্রশ্ন, এটা না পারলেও ক্ষতি নাই। হযরত আদমের বংশধরদের তালিকা বলেন। নবীবংশ বললেই হবে।

মোহম্মদ সিদ্দিক চোখ বন্ধ করে তালিকা বলা শুরু করলেন— *

(১) হযরত আদম (আঃ)
(২) হযরত শীশ (আঃ)
(৩) হযরত ইয়াসিন (আঃ)
(৪) হযরত কাইনান (আঃ)
(৫) হযরত মাহলীল (আঃ)
(৬) হযরত ইয়ারত (আঃ)
(৭) হযরত ইদরিস (আঃ)
(৮) হযরত আখিমুখ (আঃ)
(৯) হযরত শালিখ (আঃ)
(১০) হযরত লামক (আঃ)
(১১) হযরত নুহ (আঃ)
(১২) হযরত সাম (আঃ)
(১৩) হযরত আরফাক শাম (আঃ)

করিম বললেন, আর বলতে হবে না। মাশাল্লাহ। আপনার জ্ঞানে আমি মুগ্ধ। আসেন কোলাকুলি করি।

মোহম্মদ সিদ্দিক বললেন, আপনার সঙ্গে আমি কোলাকুলি করব না। আপনার শরীর এবং কাপড় নোংরা। আপনি কতদিন গোসল করেন না কে জানে।

শীতের কারণে গোসল করতে পারতেছি না। তাছাড়া সাবানও নাই। সাবান ছাড়া গোসল করে ফয়দা কী ?

সিদ্দিক বললেন, আমি গরম পানি আর সাবানের ব্যবস্থা করলে গোসল করবেন ? গোসল করা উচিত। আমাদের নবী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।

গরম পানি কোথায় পাবেন ?

---

* এই তালিকার সঙ্গে লুক লিখিত সুসমাচারের অদ্ভুত মিল আছে। শুধু কিছু নামের বানান ভিন্ন। —লেখক

আমি ব্যবস্থা করব।

গোসলের পর পরব কী ?

আমি লুঙ্গি, পাঞ্জাবির ব্যবস্থা করব।

করিম বেশকিছু সময় চিন্তা করে বললেন, গোসল করতে রাজি আছি।

মোহম্মদ সিদ্দিক গরম পানির সন্ধানে গেলেন। গরম পানি, সাবান, পরিষ্কার ধোয়া কাপড় নিয়ে ফিরে এসে দেখেন— করিম নেই।

সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রথমে গুড়িগুড়ি কুয়াশার মতো পড়ছিল। যতই রাত বাড়তে লাগল বৃষ্টিও বাড়তে লাগল। একসময় শিল পড়তে শুরু করল। শীতের দিনে এমন শিলাবৃষ্টি অনেক দিন এই অঞ্চলে হয় নি। ধনু শেখ আগ্রহ নিয়ে শিলপড়া দেখছেন। পা ভালো থাকলে ছোটবেলার মতো শিল কুড়াতেন। মাটির গোল সরায় শিল জমা করতেন। কিছুক্ষণ পর সরা ভাঙলে পাওয়া যেত বরফের গোল বল। ধনু শেখ ডাকলেন, সদরুল।

সদরুল দৌড়ে এলো।

ধনু শেখ বললেন, আমি আবছামতো দেখেছি করিম কদম গাছের নিচে দাঁড়ায়ে আছে। বৃষ্টিতে ভিজতেছে। মাথার মধ্যে শিল পড়তেছে।

তাড়ায়া দিয়া আসি ? যদি বলেন বাড়ি দিয়া ঠ্যাং ভাঙ্গব। বড় ত্যক্ত করতেছে।

ধনু শেখ বললেন, না। তারে ধইরা নিয়া আস। সাবান ডইল্যা গরম পানি দিয়া গোসল দেও। শুকনা কাপড় দেও। আইজ তারে সঙ্গে নিয়া খানা খাব। তারে দেইখা হঠাৎ মায়া লাগল।

সদরুল বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল।

ধনু শেখ বললেন, এইভাবে তাকায়া আছ কেন ? আমার কথা বুঝতে পার নাই ?

বুঝেছি।

তাহলে দৌড় দেও।

সদরুল কদম গাছের দিকে ছুটে গেল।

করিম জলচৌকিতে ঝিম ধরে বসে আছে। সদরুল তার গায়ে সাবান ডলছে। অন্য একজন লোটায় করে মাথায় পানি ঢালছে। করিম লজ্জায় মরে যাচ্ছে। খালি গায়ে তাকে গোসল দেয়া হচ্ছে— এই কারণে লজ্জা না। আতর নামের

মেয়েটা দূর থেকে তাকে দেখছে এটাই লজ্জা। খুন করার তালিকায় এই মেয়েটা আছে কি-না করিম মনে করতে পারছে না। মনে হয় আছে। মেয়েটাকে সে একটা চিঠি দিয়েছিল। চিঠিটা সে শরিফাকে দেয় নি। যদি দিত অবস্থা ভিন্ন হতো। এই অপরাধ গুরুতর। এই অপরাধের জন্যে অবশ্যই তাকে খুন করা যায়। তবে এ মেয়েছেলে এবং বয়স অল্প। অল্পবয়েসি মেয়েছেলের কারণে তাকে কি ক্ষমা করা যায়? করিম চিন্তা করে কূল পাচ্ছে না।

আতর আজ তার বাবার কিছু অপরাধ ক্ষমা করেছে। বাবা যে মমতা ইমাম করিমকে দেখিয়েছে সেই মমতার হয়তো অন্য অর্থ আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে মমতাটাই চোখে পড়ছে। অন্যকিছু না। আতর ছাতি মাথায় দিয়ে শিল কুড়াতে শুরু করল।

করিম মুগ্ধ হয়ে আতরের শিল কুড়ানো দেখছে। শরিফাও শিল কুড়াত। গ্লাসে জমা করে রাখত। শরিফার একটা কাজ আতর করছে, এইজন্যে করিম আতরকে ক্ষমা করে দিল। এবং কোমল গলায় বলল, আম্মাজি, ভালো আছেন?

আতর বলল, এখন থেকে আপনি আমাদের বাড়িতে থাকবেন। পথেঘাটে ঘুরবেন না।

করিম বলল, কেন?

আতর বলল, আপনি আমাকে আম্মাজি ডেকেছেন এইজন্যে।

করিমের চোখে পানি এসে গেছে। তার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে বলে চোখের পানি আলাদা করা যাচ্ছে না।

শীতে ধনু শেখের শরীর জমে যাচ্ছে। বিলাতি পানিতে শীত কমবে। একা একা এই পানি খেয়ে মজা নাই। রঙিলা বাড়িতে যাওয়া যায়। ঝড়বৃষ্টিতে পথ কাদা হয়ে আছে। পাল্কি বরদাররা পা পিছলে পাল্কি নিয়ে পড়লে অবস্থা কাহিল হবে। ধনু শেখ কী করবেন মনস্থির করতে পারছেন না। রঙিলা বাড়িতে গেলে শরিফার সঙ্গে দেখা হবে। এর আলাদা আনন্দ। নতুন জায়গায় মেয়েটা কেমন আছে স্বচক্ষে দেখা। তার ঘটনা কী জানা। ধনু শেখ ডাকলেন, সদরুল।

সদরুল ছুটে এলো।

শীত কেমন নামল বলো দেখি?

ভালো নামছে।

বুড়াবুড়ি যা আছে এই শীতে শেষ হবে কি-না বলো? শীত হলো বুড়া মরার কাল। ঠিক বলেছি না?

অবশ্যই ঠিক বলেছেন।

আমি নিজেও তো বুড়ার দলে। শীতে আমারও মরণের কথা।

আপনে কী যে কন!

ধনু শেখ বললেন, আমার শীত কমানোর ব্যবস্থা কর। শীত না কমলে আমি শেষ।

সদরুল মাথা চুলকাচ্ছে। শীত কীভাবে কমাবে বুঝতে পারছে না। সে ইতস্তত করে বলল, আগুন করব?

ধনু শেখ বললেন, এটা মন্দ না। শীতের আসল ওষুধ আগুন। বড় করে আগুন কর, কয়েকটা হিন্দু বাড়ি জ্বালায়া দাও।

সদরুল বলল, কথাটা বুঝলাম না।

ধনু শেখ বললেন, কথা না বুঝার কী আছে? সব জায়গায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চলতেছে। এইখানে কিছুই নাই। হিন্দুস্থান পাকিস্তান ভাগাভাগি যখন হবে, তখন দেখা যাবে বান্ধবপুর পড়েছে হিন্দুস্থানে। সেটা ভালো হবে?

জে না।

হিন্দু কিছু কমাইতে হবে। ভোটাভুটিরও ব্যাপার আছে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন কিছু হিন্দু কমে, কিছু দেশ ছাইড়া পালায়।

আইজ আগুন দেওয়া সমস্যা। বৃষ্টিতে সব ভিজা।

ধনু শেখ হতাশ গলায় বললেন, তোমরার বুদ্ধি গরু-ছাগলের বুদ্ধি। পেট্রল ঘরে রাখা আছে না? পানির সাথে মিশলে পেট্রল ভালো জ্বলে। বুঝেছ?

জি।

ঠান্ডা আর ঝড়বৃষ্টির কারণে লোকজন সব থাকবে ঘরে। আগুনের কারিগররে কেউ দেখবে না। কথা ঠিক বলেছি?

জি বলেছেন।

এককড়ির দোকানটা অবশ্যই জ্বালাইবা।

জি আচ্ছা।

জুম্মাঘরে আগুন দিতে ভুলবা না কিন্তু।

কথাটা বুঝলাম না।

ধনু শেখ ঠান্ডা গলায় বললেন, দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরে ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট আসবে। পুলিশ সুপার আসবে। তারা স্বচক্ষে দেখবে মুসলমানের পবিত্র ধর্মস্থান হিন্দুরা কীভাবে জ্বালায়ে দিয়েছে। এখন বুঝেছ?

বুঝেছি। আপনার বুদ্ধির কোনো সীমা নাই।

বুদ্ধি অনেকেরই আছে। সবে বুদ্ধি ব্যবহার করে না। আমি করি। পাল্কি ঠিক করতে বলো। রঙিলা বাড়িতে যাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শীত কমানোর ব্যবস্থা।

আগুনের ব্যবস্থা কি এখনই করব?

অবশ্যই। আগুন দেখতে দেখতে যাব।

প্রায় একই সঙ্গে কয়েকটা জায়গায় আগুন জ্বলল। এককড়ির দু'টা দোকান। ভরদ্বাজের বাড়ি। মনিশংকরের বাংলাঘর এবং জুম্মাঘর। বান্ধবপুর অঞ্চল জুড়ে হৈচৈ ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। বাচ্চাদের কান্নাকাটি শোনা যাচ্ছে। অনেক হিন্দু বাড়িতে শঙ্খ বাজানো শুরু হয়েছে। ভয়াবহ দুর্যোগে শঙ্খ বাজানোর নিয়ম।

ধনু শেখ পাল্কি করে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন শ্রীনাথ দৌড়ে যাচ্ছে। তিনি ডাকলেন, শ্রীনাথ, যাও কই?

শ্রীনাথ থমকে দাঁড়াল। জবাব দিল না। ধনু শেখ বললেন, যেখানেই যাও ধীরেসুস্থে যাও। রাস্তা পিছল। পিছল রাস্তায় সাবধানে হাঁটতে হয়। বুদ্ধিমান মানুষ সাবধানে হাঁটে। তোমারে বুদ্ধিমান জানতাম।

শ্রীনাথ কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলাল। ধনু শেখ বললেন, শশাংক পালের ভূতের বিষয়টা শুনলাম না। ঝাঁকি দিয়া ভূতটারে তুমি যখন নিচে ফেললা তখন কী হইল? আচ্ছা থাক, পরে শুনব। মনে হয় আইজ তুমি সামান্য ব্যস্ত।

ধনু শেখের পাল্কি এগুচ্ছে। শ্রীনাথ কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। আগুন বাড়ছে। বাতাসের কারণে দ্রুত ছড়াচ্ছে।

মালেকাইন ধনু শেখের যত্নের চূড়ান্ত করছেন। বিলাতি পানি আনা হয়েছে। হুক্কায় আম্বুরী তামাক পুড়ছে। পিতলের বড় মালসায় কাঠকয়লার আগুন করে ধনু শেখের পাশে রাখা হয়েছে। হাত গরম করার ব্যবস্থা। ধনু শেখ বললেন, একটা পা না থাকার কারণে আমার এখানে আসা-যাওয়ার বড়ই অসুবিধা। আসতে ইচ্ছা করলেও আসতে পারি না।

মালেকাইন বললেন, আহা আহা!

ধনু শেখ বললেন, আমার এই অসুবিধা আপনি সহজেই দূর করতে পারেন।

মালেকাইন বললেন, অবশ্যই। আমার চার বেহারার পাল্কি আছে। আপনি খবর দিলেই পাল্কি যাবে। আদবের সাথে আপনাকে নিয়ে আসবে।

ধনু শেখ বললেন, পাল্কি আমারও আছে।

মালেকাইন বললেন, তাও ঠিক।

ধনু শেখ তামাকে লম্বা টান দিয়ে বললেন, আমার সমস্যা দূর করার সহজ উপায় রঙিলা বাড়ির যাকে আমার পছন্দ তারে পাল্কি দিয়া আমার কাছে পৌছায়ে দেয়া।

মালেকাইন বললেন, সেটা সম্ভব না। এই বাড়ির কিছু নিয়ম আছে। অনেক দিনের পুরনো নিয়ম। বাড়ির মেয়ে কোনোখানে পাঠানো যাবে না। এরা থাকবে আলাদা। কোনোখানে যাবে না।

দিনের সাথে নিয়ম পাল্টায়। ইংরেজ আমলের নিয়ম আর স্বরাজ আমলের নিয়ম এক না।

মালেকাইন বললেন, স্বরাজ এখনো হয় নাই। যখন হবে তখন দেখব। তবে রঙিলা বাড়ির নিয়ম তখনো বহাল থাকবে।

ধনু শেখ বললেন, আপনার প্রয়োজন টাকা। নিয়মের আপনার প্রয়োজন নাই। আমি যখন কাউকে নিজের বাড়িতে নিয়া রাখব ডাবল টাকা দিব।

তিনগুণ টাকাতেও হবে না।

ধনু শেখ বললেন, না হলে কী আর করা। আমি নিজেও নিয়ম মানা মানুষ। নিয়মের বাইরে যাই না। বান্ধবপুরের বিভিন্ন জায়গায় আগুন লেগেছে। এই খবর কি পেয়েছেন?

পেয়েছি।

আগুন নিয়ম মানে না। সে তার ইচ্ছায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। আপনি সাবধানে থাকবেন যেন রঙিলা বাড়িতে আগুন না ধরে। রঙিলা বাড়ি পুইড়া ছাই হয়ে গেলে আপনার আমার সবেরই অসুবিধা।

মালেকাইন ধনু শেখের গ্লাসে বিলাতি পানি ঢালতে ঢালতে চিন্তিত গলায় বললেন, আপনি কাকে নিজের বাড়িতে নিতে চান?

ধনু শেখ বললেন, শরিফাকে।

আজই নিতে চান?

হুঁ।

রাখবেন কত দিন?

জানি না।

মালেকাইন বললেন, ঠিক আছে নিয়া যান।

ধনু শেখ বললেন, আপনার অনেক মেহেরবাণী।

শরিফা আলাদা পাল্কিতে ধনু শেখের বাড়িতে যাচ্ছে। তাকে চিন্তিত বা দুঃখিত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সে ক্লান্ত। যেন অনেক দিন শান্তিমতো ঘুমাচ্ছে না। সে পাল্কিতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বান্ধবপুরের আগুনে পাঁচজন মানুষ মারা গেল। এদের মধ্যে মুসলমান একজন। জুম্মাঘরের নতুন ইমাম মোহম্মদ সিদ্দিক। আগুন লাগার পর সে দরজা খুলে বের হতে পারে নি। দরজা খুঁজে পায় নি। মসজিদের ভেতর ছোটাছুটি করেছে এবং চিৎকার করেছে— ইবলিশ শয়তান। ইবলিশ। ইবলিশ। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার ধারণা ছিল— ইবলিশ শয়তান কিছু একটা করছে। ইবলিশের মায়া। আসলে আগুন-টাগুন কিছুই লাগে নি।

গৌরাঙ্গ এককড়ির দোকানেই ঘুমাত। আগুন লাগার পর সে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। দোকানের ক্যাশবাক্স উদ্ধারের জন্যে সে আবার দৌড় দিয়ে জ্বলন্ত ঘরে ঢুকে। তখনি ঘরের চাল তার ওপর পড়ে। ক্যাশবাক্সে ছিল ছয় টাকা সাত আনা।

বাকি তিনজন শিশু। ভরদ্বাজের তিন মেয়ে— সুশিলা, সরজুবালা এবং দুর্গা। উদ্ধারের পর দেখা যায় তিনবোন জড়াজড়ি করে আছে।

বান্ধবপুরে বুনকা বুনকা ধোঁয়া উড়ছে। আগুন জ্বলছে। কিছু জায়গায় এখনো আগুন নেভানোর চেষ্টা হচ্ছে। ধনু শেখ আগ্রহ নিয়ে আগুনের খেলা দেখছেন।

আরো একজন আগুনের খেলা দেখছেন তাঁর গোপন বাংকারে বসে। তাঁর নাম হিটলার। হিটলারের সামনে বৃদ্ধ এক জিপসি। সে দেয়াশলাইয়ের কাঠিতে আগুন জ্বালিয়ে ভবিষ্যৎ বলতে পারে। জিপসির নাম ইয়ান'র। তাঁর চেহারা সাধু সন্তের মতো। লম্বা দাড়ি, লম্বা চুল। ঘন নীল চোখ।

ইয়ান'র একের পর এক কাঠি জ্বালাচ্ছে। কাঠির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে। দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে। নিজের মনে বিড়বিড় করছে। তার সামনে বিশ্বের অতি ক্ষমতাধর একজন বসে আছে। এই ঘটনা তাকে তেমন আলোড়িত করছে বলে মনে হচ্ছে না।

হিটলার দেয়াশলাইয়ের কাঠির আগুনে জার্মান বাহিনীর ভবিষ্যৎ দেখতে চাচ্ছেন। ভবিষ্যৎ দেখা খেলা তাঁর পছন্দের। টেরট কার্ড দিয়ে ভবিষ্যৎ বলার কিছু পদ্ধতি তিনি নিজেও জানেন। কার্ড দেখে যুদ্ধে জার্মানির ভবিষ্যৎ বলার খেলা মাঝেমধ্যে তিনি তাঁর বান্ধবী ইভা ব্রাউনের সঙ্গে খেলেন।

হিটলার বললেন, কী দেখলে ?

জিপসি শিতল গলায় বলল, বরফ পড়ছে।

শীতকালে বরফ পড়বে। শীতকালে আকাশ থেকে কমলা বৃষ্টি হবে না। ভালো করে দেখে বলো, রাশিয়াতে আমার বাহিনীর অবস্থা কী ?

বরফ পড়ছে। জার্মানবাহিনী বরফের কাছে পরাজিত।

হিটলার বললেন, বরফ শুধু জার্মানবাহিনীর ওপর পড়ছে না। রুশদের ওপরও পড়ছে।

জার্মানবাহিনী বরফের হাতে পরাজিত। রুশবাহিনী না, রুশরা বরফের সঙ্গে পরিচিত।

তোমার দেশ কোথায় ?

আমি জিপসি। আমার কোনো দেশ নেই।

জন্মেছ কোথায় ?

মস্কোর কাছে, ভলগা নদীর তীরে।

জার্মানবাহিনী রুশদের কঠিন শিক্ষা দিয়েছে, এই গল্প তুমি জানো। জার্মানদের প্রতি ক্রোধের কারণে জার্মানবাহিনী সম্পর্কে এধরনের কথা বলছো।

আমি জিপসি, কারো প্রতি আমার কোনো ক্রোধ নেই।

হিটলার উঠে দাঁড়ালেন। জিপসি তখনো বসে। এখনো তার হাতে দেয়াশলাইয়ের কাঠি। হিটলার নির্দেশ দিলেন ইহুদিদের সঙ্গে জিপসিদেরও যেন নির্মূল করা হয়। আধুনিক জার্মানি হবে ইহুদি এবং জিপসিমুক্ত।

লেনিনগ্রাদ অবরুদ্ধ। জার্মানরা এই শহরকে একটা মৃত শহরে পরিণত করেছে। চব্বিশ ঘণ্টাই কামানের গোলাবর্ষণ হচ্ছে। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী রেলস্টেশন তিখভিন জার্মানদের দখলে। বোমা এবং কামানের আঘাতে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি মোটামুটি ধ্বংস। শহরে খাদ্য নেই বললেই হয়। কলকারখানার শ্রমিকরা গ্রিজ, কারখানার তেল খাচ্ছে। কাঠের গুড়ি দিয়ে রুটি তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। ক্ষুধার্ত মানুষজন কুকুর-বিড়াল সিদ্ধ করে খাচ্ছে। নরমাংস খওয়ার ঘটনাও ঘটছে।

অবিরাম তুষারপাত হচ্ছে। বসতবাড়িতে বিদ্যুৎ দেয়া হচ্ছে না। সামান্য বিদ্যুৎ যা তৈরি হচ্ছে চলে যাচ্ছে কলকারখানাতে। শীতে জমে যাওয়া মানুষজন ঘরের কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র পুড়িয়ে চেষ্টা করছে শরীর উষ্ণ রাখতে। শহরে শিশুখাদ্য শেষ। কর্তৃপক্ষ প্রতিটি শিশুর জন্যে সপ্তাহে ছয়গ্রাম চিনি বরাদ্দ করেছেন। সেই চিনির জন্যে দীর্ঘ লাইন।

জার্মানরা শহরটিতে কোনো খাদ্য আসতে দিচ্ছে না। সব পথ বন্ধ। একটা পথ অবশ্যি খোলা আছে। লাগোদা হ্রদের ওপর দিয়ে ট্রাকে করে খাদ্য নিয়ে আসা। ট্রাক আসার জন্যে হ্রদের পানি জমে কম করে হলেও দু'শ মিলিমিটার পুরো হতে হবে। তার জন্যে আরো তুষারপাত প্রয়োজন। বন্দি লেনিনগ্রাদবাসী শীতে কাঁপতে কাঁপতে প্রার্থনা করছে আরো দুর্দান্ত শীতের। তুষারপাতের। যেন লাগোদা হ্রদ জমে লোহার মতো শক্ত হয়ে যায়।

২৬ নভেম্বর (১৯৪২) আটটা ট্রাক লেনিনগ্রাদ থেকে বের হয় এবং লাগোদা হ্রদ পার হয়ে খাদ্য নিয়ে শহরে ফিরে আসে। খাদ্যের পরিমাণ ৩৩ টন।

একই সঙ্গে জাবেরি নামের শহরের সঙ্গে লেনিনগ্রাদের যোগাযোগের জন্যে রাস্তা বানানো হয়। জাবেরি থেকে খাদ্য আনার ব্যবস্থা। মাত্র ২৭ দিনে তৈরি হয় দুশ মাইল রাস্তা। এই সড়কই বিখ্যাত 'রোড টু লাইফ'। ডিসেম্বরের ছয় তারিখ তিনশ' ট্রাক খাদ্য নিয়ে লেনিনগ্রাদের দিকে যাত্রা করে।

রুশরা জার্মানদের হাত থেকে দখল করে নেয় রেলস্টেশন তিখভিন। রুশবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে জার্মানির ওপর।

জার্মানদের পরাজয়ের স্বাদগ্রহণের পালা শুরু হয়।

জুলেখা কলিকাতা বেতার ভবনের একটা ঘরে অনেকক্ষণ হলো বসে আছে। ঘরটির বাইরে সাইনবোর্ডে লেখা— মহিলাদের বিশ্রাম কক্ষ। তিন-চারজন পুরুষ মানুষকে দেখা যাচ্ছে। তারা আসছে যাচ্ছে।

ঘরের মেঝেতে ফরাস পাতা। হারমোনিয়াম তবলা আছে। হারমোনিয়ামের পাশেই বিরাট এক পিকদান। কেউ কেউ পানের পিক ফেলার জন্যেই ঘরে ঢুকছেন। পিক ফেলে চলে যাচ্ছেন।

জুলেখা এসেছে, আজ তাকে একটি গানের সুর দেখিয়ে দেয়া হবে। সে গলায় গান তুলবে। কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ইসলামি গান। ইসলামি গানের এখন খুব কদর হয়েছে। 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' গানটির রেকর্ড আছে সব মুসলমানের বাড়িতে। আব্বাসউদ্দিনের সুরেলা গলা এইক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে।

জুলেখা যে গান গাইবে তার কথা—

ভালোবাসা পায় না যে জন
রসুল তারে ভালোবাসে।
উম্মতেরে ছেড়ে কভু
বেহেশতে যায় না সে॥
যে জন বেড়ায় পিয়াস লয়ে
দ্বারে দ্বারে নিরাশ হয়ে
সবুরেরি মেওয়া নিয়ে
নবীজি তাঁর সামনে আসে॥
যে খেটে খায় হালাল রুজি
তারি দুনিয়াদারি
মোর নবীজি কমলিওয়ালা
সহায় যে হন তারি
সংসারে যে নয় উদাসীন
খোদার কাজে যে রহে লীন

রসুল তারে বক্ষে বাঁধেন
রহমতেরি বাহুর পাশে। *

জুলেখাকে গানের কথা দেয়া হয়েছে। সুর বলা হয় নি। কাজী নজরুল ইসলাম তাকে সুর দেখিয়ে দেবেন এবং গলায় গান তুলে দেবেন। এই আলাভোলা মানুষটার সঙ্গে জুলেখার পরিচয় আছে। তিনি যখন রেকর্ড কোম্পানিতে চাকরি করতেন তখনি পরিচয়।

কাজী নজরুল রেকর্ড কোম্পানির কাজ ছেড়ে রেডিওতে যোগ দিয়েছেন। রেডিওকে বলা হচ্ছে 'আকাশবাণী'। রবীন্দ্রনাথের দেয়া নাম। আকাশবাণীতে যোগ দেয়ার পর থেকে কবি নজরুল অন্যমনস্ক। কথাবার্তা এলোমেলো। হঠাৎ হঠাৎ বিচিত্র সব কথা বলেন। কাজে কোনো মন নেই। বনগাঁ সাহিত্য সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে তিনি হঠাৎ বললেন, দুদিন আগে যেমন করে যে ভাষায় বলতে পারতাম, সে ভাষা আমি ভুলে গেছি। যদি আর বাঁশি না বাজে আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন।

কবি নজরুল তার অতি ঘনিষ্ঠদের অদ্ভুত অদ্ভুত কথাও বলেছেন। যেমন আল্লাহর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। অনেক গূঢ় বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। মা কালীর সঙ্গেও কথা হয়েছে। মা কালীর কণ্ঠস্বর অতি মধুর ও সুরেলা।

জুলেখা কয়েকবার রেডিও অফিসে খোঁজ নিয়েছে। কাজীদা আসেন নি। সম্ভবত আজ আর গান তোলা হবে না। জুলেখা চলে যাবার জন্যে মন ঠিক করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজী নজরুল ঢুকলেন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। গলায় গেরুয়া চাদর। কবি সরাসরি হারমোনিয়ামের সামনে বসে জুলেখাকে ডাকলেন।

জুলিয়া, ভালো আছ ?

জুলেখা কবির সামনে বসল। কবি তাকে জুলিয়া ডাকেন। জুলেখা নামটা না-কি তাঁর মাথায় থাকে না। পাতলা হয়ে জুলিয়া হয়ে যায়।

জুলিয়া, তুমি এই গান গাইবে বেণুকা রাগিণীতে। বেণুকা আর দোলনচাঁপা এই দু'টা রাগিণী আমার তৈরি, তোমাকে বলেছি না ?

জুলেখাকে এই বিষয়ে কাজী নজরুল কখনো কিছু বলেন নি, তবু জুলেখা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার প্রধান চেষ্টা সময় নষ্ট না করে গানটা গলায় তুলে নেয়া। একবার দেখিয়ে দিলেই সে পারবে। গান দেখিয়ে দেবার সময় কি কবির হবে ? তিনি ছটফট করছেন।

---

* সূত্র : *নজরুল গীতি অখণ্ড*, আব্দুল আজিজ আল আমান। হরফ প্রকাশনী। কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা।

জুলিয়া, আমি যে হাত দেখতে পারি তুমি জানো ?

না।

এসো তোমার হাত দেখে দেই। গান পরে হবে। কবি জুলেখার হাত টেনে নিলেন। গভীর আগ্রহ নিয়ে হাতের রেখা দেখতে দেখতে বললেন, তোমার হাতের রেখা ভালো। বৃহস্পতিতে ত্রিশুল চিহ্ন আছে। বৃহস্পতিতে ত্রিশুল থাকা অত্যন্ত শুভ। গানবাজনায় নাম করবে। অবশ্যি নাম তো এখনই করেছ। পারিবারিক জীবন শুভ। স্বামীভাগ্যে তুমি ভাগ্যবতী।

জুলেখা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। কবি নিঃশ্বাসের অর্থ ধরতে পারলেন না।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে অনেক কাটাকুটি। স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। প্রায়ই নানান অসুখবিসুখ হবে। হয় না ?

জুলেখার অসুখবিসুখ তেমন হয় না। তারপরেও হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। আজ মনে হয় গান তোলা হবে না। সময় কেটে যাবে হাত দেখাদেখিতে।

কবি বললেন, তুমি কি আমার ঐ গানটা শুনেছ ? 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী দেব খোঁপায় তারার ফুল।'

জি শুনেছি।

গান লেখার ইতিহাসটা শোন। জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। হঠাৎ আব্বাসউদ্দিন বলল, এক লক্ষ টাকা যদি লটারিতে পাওয়া যায়, তাহলে প্রিয়ার জন্যে কে কী উপহার কিনবে ? একেকজন একেক কথা বলছে, আমি করলাম কী হারমোনিয়াম টেনে গান ধরলাম— 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানি দেব খোঁপায় তারার ফুল।' হা হা হা। একটা পয়সা খরচ হলো না। প্রিয়া তার উপহার পেয়ে গেল। হা হা হা।

জুলেখা তাকিয়ে আছে। তার মন বলছে মানুষটা ভালো নেই।

কবি হঠাৎ গলা অস্বাভাবিক নিচু করে বললেন, কাউকে যদি না বলো তাহলে তোমাকে অতি গোপন একটা কথা বলব।

কাউকে বলব না।

তোমার চেহারার সঙ্গে নার্গিসের চেহারার মিল আছে। সেও তোমার মতো রূপবতী।

নার্গিস কে ?

আমার প্রথম স্ত্রী। কুমিল্লার মেয়ে। বিয়ের রাতেই আমি তাকে ফেলে চলে আসি।

কেন ?

সেটা তো তোমাকে বলব না। শৈলজানন্দ আমার অতি প্রিয়জন। তাকেও বলি নি।

কবি গলার স্বর নিচু করে বললেন, তবে আল্লাহর সঙ্গে আমার কী কথাবার্তা হয়েছে সেটা বলব। বাতেনী কথা, অর্থাৎ অতি গূঢ় রহস্যের কথা। তিনি আমাকে ডেকেছেন 'চিরকবি' নামে। যে কারণে আমি যখন অটোগ্রাফ দেই তখন লিখি— চিরকবি নজরুল। দেখি তোমার গানের খাতা। চিরকবি নজরুল লিখে দেই।

জুলেখা গানের খাতা এগিয়ে দিল। কাজী নজরুল লিখলেন—

জুলিয়া
আমারে যেও না ভুলিয়া।
চিরকবি কাজী নজরুল ইসলাম।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই কবি চিরদিনের জন্যে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। কবি তাঁর একটি গানে লিখেছিলেন— 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।' তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশেই তাঁর কবর।

মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই॥
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজিরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে।
গোর আজাব থেকে এ গুনাহ্‌গার পাইবে রেহাই।
কত পরহেজগার খোদার ভক্ত নবীজির উম্মত
ঐ মসজিদে করে রে ভাই কোরান তেলাওত।
সেই কোরান শুনে যেন আমি পরান জুড়াই।
কত দরবেশ ফকির রে ভাই মসজিদের আঙিনাতে
আল্লাহর নামে জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে॥
আমি তাদের সাথে কেঁদে কেঁদে
আল্লাহর নাম জপিতে চাই। *

* হিজ মাস্টার্স ভয়েসের রেকর্ড। গায়ক মোঃ কাশেম। রেকর্ড নাম্বার N 17476

বার্লিন আর্মি হেড কোয়ার্টারের বিশেষ এক বাঙ্কারে হিটলার নৈশভোজ শুরু করেছেন। নৈশভোজে কিছুটা আড়ম্বর আছে। কারণ আজ অনেকদিন পর হিটলারের বান্ধবী ইভা ব্রাউন উপস্থিত আছেন।

পুরনো রেড ওয়াইনের বোতল খোলা হয়েছে। হিটলার এক চুমুক রেড ওয়াইন খেয়ে মাথা নাড়লেন। তাঁর পছন্দ হয়েছে। দু'রকমের স্যুপ দেয়া হয়েছে। বেবী কর্ন-এর একটি প্রিপারেশন আছে। আলুভাজা আছে। মাখন মাখানো মাশরুম আছে। শূকরের মাংসের সসেজ এবং লাল করে পোড়ানো খরগোসের মাংস আছে। মাংসের বাটিগুলির ঢাকনা খোলা হয় নি। হিটলার নিরামিষ খাবার পছন্দ করেন, তবে কিছুদিন আগে জেনারেলদের এক সম্মেলনে এক টুকরা খরগোসের মাংস মুখে দিয়েছিলেন বলে বিশেষ আয়োজনের দিনে তাঁর টেবিলে মাংস রাখা হয়। মাছের কোনো আইটেম নেই। ইভা ব্রাউন মাছের গন্ধ পছন্দ করেন না।

একটু দূরে গ্রামোফোনে মোৎসার্ট বাজছে। ডাইনিং টেবিলে মোমবাতির আলো। পরিবেশ চমৎকার। হিটলারকে প্রসন্ন দেখাচ্ছে। যুদ্ধের ভালো কোনো খবর পেলে তিনি প্রসন্ন বোধ করেন। ভালো খবর পাওয়ার তেমন কারণ নেই। ভয়াবহ দুঃসংবাদ একের পর এক আসছে। তারপরেও যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত অঘটন ঘটে। ইভা ব্রাউনের ধারণা তেমন কোনো ঘটনা ঘটেছে।

ইভা ব্রাউন ওয়াইন গ্লাস তুলে টোস্ট করলেন— জার্মানির মৃত্যুঞ্জয়ী বীরসৈনিকদের। হিটলারও গ্লাস তুললেন। গ্লাসে গ্লাসে শব্দ হলো। সেই শব্দও সঙ্গীতের মতোই। হিটলার ইশারা করলেন, গ্রামোফোন যেন বন্ধ করা হয়। তিনি ডিনার নীরবেই করেন, তবে মাঝে মাঝে তার কথা বলতে ইচ্ছা করে। আজ সে রকম একটা দিন।

হিটলার আলুভাজা মুখে দিতে দিতে বললেন, জার্মান ফিল্ড মার্শালদের বিশেষত্ব কী তুমি জানো ?

ইভা ব্রাউন বললেন, তারা ধীমান বীর। মহান যোদ্ধা। সাহসী।

ঠিকই আছে, তবে তাদের প্রধান বিশেষত্ব হলো তারা কখনোই জীবিত অবস্থায় শত্রুর কাছে ধরা পড়ে না। আত্মসমর্পণ করে না। মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। প্রয়োজনে আত্মহত্যা করবে, কিন্তু ধরা দেবে না।

ইভা ব্রাউন বললেন, ফিল্ড মার্শালদের এই বিষয়টি জানতাম না।

হিটলার অহংকারের সঙ্গে বললেন, এখন পর্যন্ত কোনো জার্মান ফিল্ড মার্শালকে কেউ জীবিত অবস্থায় বন্দি করতে পারে নি।

ইভা ব্রাউন রেড ওয়াইনের গ্লাস আবারো উঁচু করে বললেন, মহান ফিল্ড মার্শালদের উদ্দেশে।

হিটলার বললেন, তুমি জার্মান ফিল্ড মার্শাল বলো নি।

ইভা ব্রাউন বললেন, ভুল হয়েছে। সরি। মহান জার্মান ফিল্ড মার্শালদের উদ্দেশে।

হিটলার গম্ভীর গলায় বললেন, এ ধরনের ভুল আমার পছন্দ না।

সময় ১৯৪৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাস। তারিখ দুই। হিটলার তখনো জানেন না তাঁর ফিল্ড মার্শালদের একজন, ফিল্ড মার্শাল পাউলাস, স্টেলিনগ্রাদে সোভিয়েতদের কাছে হাত তুলে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর সঙ্গে আত্মসমর্পণ করেছে ৯১ হাজার জার্মান সৈন্য। তারা বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত। শীতে এবং ক্ষুধায় কাতর।

ফিল্ড মার্শাল পাউলাসকে সোভিয়েত মার্শাল জর্জি ঝুকভের তাঁবুতে নেয়া হলো। তাঁবুতে পেতলের কড়াইয়ে আগুন জ্বলছিল। ঝুকভ হাতের দস্তানা খুলে আগুনের সামনে হাত মেলে রেখেছেন। ফিল্ড মার্শাল পাউলাসের সঙ্গে তিনি হ্যান্ডশেক করতে করতে বললেন, আগুনের আরো কাছে এসে দাঁড়ান, শরীর গরম হোক।

পাউলাস কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর দৃষ্টি ভাবলেশহীন।

ঝুকভ বললেন, গরম এক মগ সামরিক কফি কি দেব? কফি শীত কাটাতে সাহায্য করে। আপনি ক্ষুধার্ত?

পাউলাস হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নৈশভোজ সারব। আপনি ভাগ্যবান। আপনার জন্যে আমরা দু'বোতল জার্মান রেড ওয়াইন জোগাড় করতে পেরেছি। আমাদের যেমন ভদকা, আপনাদের তেমন রেড ওয়াইন। আমার খুব শখ বার্লিনে বসে আপনাদের রেড ওয়াইন খেয়ে দেখব। যেখানকার জিনিস সেখানে বসেই খাওয়া উচিত।

'মার্শাল ঝুকভের তাড়া খাইয়া জার্মানবাহিনী বার্লিনের উদ্দেশে ছুটিতেছে...'

এককড়ির দোকানে খবর পড়া হচ্ছে। আজ দু'টা পত্রিকা পড়া হবে। *কলিকাতা সমাচার* এবং *ঢাকা প্রকাশ*। যুদ্ধের খবর এক পত্রিকায় পড়ে মজা পাওয়া যায় না। শ্রোতারা আরো জানতে চায়। যুদ্ধের ফলাফল কী ? এখনো পরিষ্কার না। *ঢাকা প্রকাশ* লিখেছে— তুরুপের তাস এখনো হিটলারের হাতে। তুরুপের তাসটা কী তাও বোঝা যাচ্ছে না।

খবর পাঠক মাথা দুলিয়ে বলল, হিটলারের বিচি তো মাথায় উঠছে। এই বিচি আর নামব না। খবর পাঠকের নাম দেবু। সে গৌরাঙ্গের ভঙ্গিতে খবর পড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেরকম হচ্ছে না। পাখি উড়ে গেলে তার পালক পড়ে থাকে। গৌরাঙ্গ মারা গেছে কিন্তু তার খবর পাঠ রেখে গেছে।

এককড়ি বললেন, অসভ্য অশ্লীল কথা বলবা না।

এক শ্রোতা বলল, ঘটনা সত্য, বলতে অসুবিধা কী ?

এককড়ি বললেন, তুমি জানো ঘটনা সত্য ? যুদ্ধ তুমি করতেছ ? পুরাটাই হিটলারের কৌশল।

কী কৌশল ?

এমন ভাব করতেছে যে পরাজিত। রওনা দিয়েছে বার্লিনের দিকে। পিছনে পিছনে আসতেছে রুশরা। ফাঁদে পা দিয়েছে। জার্মান বিমান যখন ঝাঁপ দিয়া পড়ব তখন বুঝব।

ঘটনা এইরকম আপনেরে বলেছে কে ? হিটলার সাব তো আপনের সাথে পরামর্শ করে নাই।

হিটলারকে যে চিনে সে জানে ঘটনা এইরকম। হিটলার সাগু খাওয়া জিনিস না। অন্য জিনিস।

এইটা অবশ্য ঠিক।

হিটলার তো একলা না, তার সাথে আছে মুসৌলিনি। আরেক ধাইন্যা মরিচ। আছে জাপানিরা। জাপানিরা কী এখনো বুঝ নাই ? কলিকাতা খালি কইরা সব পালাইছে কোন সুখে ? জাপানিরা যখন বোমা ফেলতে শুরু করব আমরার বান্ধবপুর বাদ থাকব এরকম চিন্তা করবা না।

দর্শকরা আগ্রহ নিয়ে নড়েচড়ে বসল। দেবু বলল, একটা বিষয় কেউ বুঝতেছে না। মহাবিপদ আমরার সামনে।

এক শ্রোতা বলল, বুঝায়া বলো বিপদটা কী ?

জাপানিরা বার্মা দিয়া ঢুকবে চিটাগাং। সেখান থেকে ময়মনসিংহ-ঢাকা। ময়মনসিংহ-ঢাকা জয় হয়ে গেলে তারা রওনা দিবে কলিকাতা। বান্ধবপুরের উপর দিয়া যেতে হবে। এরা যেদিকে যায় ছারখার করে দিয়ে যায়। যুবক সব মেরে ফেলে। অল্পবয়স্ক মেয়ে সব নিজের দেশে চালান করে দেয়।

কেন ?

দেবু বিরক্ত হয়ে বলল, একেকটা প্রশ্ন এমন করেন! মেয়ে ধইরা নিয়া যাবে কেন বুঝেন না ? মা ডাকার জন্য নিবে না।

একুকড়ি বললেন, বাজে আলাপ বন্ধ। কাগজ পড়। দেশের মেয়ে নিয়া যাওয়া সহজ না। নেতাজি স্বয়ং আছেন। নেতাজিও সাগু খাওয়া লোক না।

খবর পাঠ চলতে থাকে।

ভয়াবহ কিছু ঘটতে যাচ্ছে, এই চিন্তার মধ্যে কি কোনো আনন্দ আছে ? হয়তো আছে। খবর শুনতে আসা মানুষদের আনন্দিত মনে হয়। মানুষ বড়ই বিচিত্র জীব।

ধনু শেখও খবর শুনছেন। তাঁকে পড়ে শোনাচ্ছে আতর। ধনু শেখ খাটে হেলান দিয়ে বসেছেন। পায়ের ওপর কম্বল চাপা দেয়া। হাতে তামাকের নল। চোখে চশমা। এমনিতে তিনি চশমা পরেন না। যখন খবর শুনতে বসেন তখন আয়োজন করে চশমা চোখে দেন। ধনু শেখের বাড়িতে যে কাগজ আসে তার নাম *যুদ্ধ সংবাদ*। সেখানে যুদ্ধের খবর ছাড়া আর কোনো খবর থাকে না। এই ভালো। যুদ্ধের খবর ছাড়া আর সব খবরই এখন গুরুত্বহীন।

খবর পড়া শেষ হয়েছে। আতর চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। ধনু শেখ বললেন, একটু বসো। কথা আছে।

আতর বসল।

অনেক দিন ধরে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাস করব বলে ভেবেছি। জিজ্ঞাস করা হয় নাই।

জিজ্ঞাস করেন।

শরিফারে বাড়ি থেকে পালাবার ব্যবস্থা কি তুমি একাই করেছ ? না-কি আরো কেউ তোমার সঙ্গে ছিল ?

আমি একাই করেছি।

যে কাজটা করেছ তাতে শরিফার লাভ হয়েছে, না ক্ষতি হয়েছে ? ভালোমতো চিন্তা কইরা উত্তর দাও।

ক্ষতি হয়েছে।

অল্প ক্ষতি, না বড় ক্ষতি?

বড় ক্ষতি।

এতে কী প্রমাণিত হয়েছে বলো?

আতর চুপ করে আছে। সে বুঝতে পারছে না তার বাবা কী উত্তর শুনতে চাচ্ছেন। তিনি যে উত্তর শুনতে চাচ্ছেন সেই উত্তর ছাড়া অন্য কোনো উত্তরেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন না।

ধনু শেখ হুক্কার নলে লম্বা টান দিয়ে বললেন, এতে প্রমাণিত হয়েছে— 'নারী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী'। ভবিষ্যতে আর কখনো নিজের বুদ্ধিতে কিছু করবা না।

আচ্ছা।

এখন বলো আমারে তুমি কি অপছন্দ কর?

করি।

অল্প অপছন্দ কর, না বেশি?

বেশি।

ঘিন্না কর?

হুঁ।

যারে ঘিন্না কর তারে সব সময় চোখের সামনে দেখা তো ভালো কথা না। কাজেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমার বিবাহ দিব। এক ছেলের পিতার সঙ্গে আগে কথা হয়েছিল। তাকে পত্র দিয়েছিলাম ছেলে এবং ছেলের পিতা যেন তোমাকে দেখে যায়। পত্রের উত্তর এসেছে। দুই-একদিনের মধ্যে তারা আসবে। সন্ধ্যাকালে 'কন্যা' দেখানো হবে। যদি পছন্দ হয় তাহলে বিবাহের দিন এবং কাবিন ধার্য হবে। এই বিষয়ে কিছু বলতে চাও।

না।

তোমার পাড়াবেড়ানি অভ্যাস আছে আমি জানি। আগামীকাল থাইকা যেন ঘরের বাইরে পা না যায়।

আচ্ছা।

যার সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা হয়েছে তার বিষয়ে কিছু জানতে চাও?

না।

ধনু শেখ বললেন, জানতে না চাইলেও আমার জানানো কর্তব্য। ছেলের পারিবারিক অবস্থা ভালো না, তবে ছেলে উচ্চশিক্ষিত। এম.এ পরীক্ষা দিয়েছিল। পাশ হয় নাই। আবার দিবে। বুঝেছ?

হুঁ।

গোটা বান্ধবপুরে এম. এ পরীক্ষা দেওয়া কেউ নাই, এটা খেয়াল রাখবা। ছেলের গাত্রবর্ণ কালো। তবে পুরুষমানুষের কালো গাত্রবর্ণ শুভ। ছেলের নাম শাহনেয়াজ। এখন সামনে থেকে বিদায় হও।

আমগাছের চারপাশে শিবশংকর ঘুরছে। তাকে দেখেই মনে হচ্ছে সে অসুস্থ। গত রাতে তার জ্বর এসেছে। এখন জ্বর নেই, তবে মনে হচ্ছে জ্বর আসবে। মাথা ফাঁকা লাগছে। জ্বর আসার আগে এরকম লাগে।

শিবশংকর ঠিক করেছে শরীর যখন ঠিক থাকবে, মন ভালো থাকবে, তখন সে clockwise ঘুরবে। আবার শরীর যখন খারাপ থাকবে, মনও ভালো থাকবে না, তখন ঘুরবে Anti clockwise. এখন সে এন্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরছে।

আতর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মাথায় ওড়না। ওড়নার রঙ গাঢ় হলুদ। তার পরনের শাড়ির রঙ নীল। সে শাড়ি দিয়ে মাথায় ঘোমটা দেয় নি। ওড়না দিয়ে দিয়েছে। আতর আজ একা আসে নি। হামিদাকে নিয়ে এসেছে। হামিদা যথারীতি বোরকা পরা। সে আতরের মাথায় ছাতা ধরে রেখেছে। হামিদার কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ। আতর, হামিদাকে দাঁড়া করিয়ে এগিয়ে গেল। শিবশংকর বলল, আমি তোমার জন্য সুন্দর একটা নাম খুঁজে বের করেছি।

আতর নামটা কি সুন্দর না?

হ্যাঁ সুন্দর। কিন্তু তারচে'ও সুন্দর। নামটা বলব?

না। এখন পর্যন্ত আতর নামটাই আমার পছন্দ। যেদিন পছন্দ হবে না আপনার কাছ থেকে নতুন নাম নেব।

তোমার সঙ্গে বোরকা পরা উনি কে?

আমার পাহারাদার। আপনি কি আমার একটা কাজ করে দেবেন?

অবশ্যই। কী কাজ?

একটা চিঠি লিখে দিবেন? আমি একজনকে একটা চিঠি পাঠাব। জরুরি চিঠি। আজই পাঠাতে হবে।

তুমি তো লিখতে পার।

আমি চাই না যাকে চিঠি লিখব সে আমার হাতের লেখা দেখে আমাকে চিনে ফেলুক।

কাগজ-কলম তো আনি নাই।

কাগজ-কলম আমার সঙ্গে আছে। দিব?

দাও। আমার হাতের লেখা কিন্তু ভালো না। তবে বানান ভুল হবে না।

আতর হামিদার কাছ থেকে কাগজ এবং কলম এনে দিল। শিবশংকর চিঠি লিখতে বসেছে। আতর পাশে দাঁড়িয়ে।

শিবশংকর বলল, সম্বোধন কী লিখব?

আতর বলল, সম্বোধন লাগবে না। লিখেন—

> আমার খুব ইচ্ছা আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। এটা কি সম্ভব? যদি সম্ভব মনে করেন তবে বাড়ির সামনে একটা খুঁটি পুঁতবেন। খুঁটি দেখে বুঝব।
>
> আপনার চিরদিনের দাসী আতর

শিবশংকর বলল, দাসী লিখব কেন?

আতর বলল, আমার দাসী লিখতে ইচ্ছা করতেছে। দাসীর চেয়েও নিচে যদি কিছু থাকত তাই লিখতে বলতাম।

শিবশংকর বলল, যাকে তুমি এই চিঠি লিখছ সে যে কী খুশি হবে। কয়েকটা খুঁটি পুঁতবে।

আতর বলল, আমাকে বিয়ে করলে খুশি হবে কেন?

কারণ তুমি ভালো মেয়ে। দেখতেও সুন্দর। সবাই সুন্দর পছন্দ করে।

আপনি করেন?

না।

আপনি কী পছন্দ করেন?

বুদ্ধি।

আতর বলল, আচ্ছা যাই।

শিবশংকর বলল, চিঠিটা নিয়ে যাও। আতর বলল, চিঠিটা আপনার জন্যে। আতর ছোট ছোট পা ফেলে যাচ্ছে। সে একবারও পেছনে তাকাল না।

শিবশংকর চিঠি হাতে নিয়ে বসে আছে। তার মুখ ছাইবর্ণ। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। যে জ্বর আসব আসব করছিল সে জ্বর এসে গেছে। চোখ জ্বালাপোড়া করছে। রোদের দিকে তাকাতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে যে-ই তাকে দেখছে সে-ই বুঝে ফেলছে ঘটনা কী। শিবশংকর চিঠিটাকে গুটি পাকিয়ে বলের মতো করেছে। সেই বল হাতের মুঠিতে লুকানো। চিঠিটা সে খুবই গোপন কোনো জায়গায় লুকিয়ে রাখবে। এমন কোনো গোপন জায়গা যেন কেউ কোনোদিন খুঁজে না পায়। সে চিঠি নিয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা হবে। গহীন জঙ্গলে ঢুকে পড়বে। বড় কোনো

গাছ খুঁজে বের করবে। বড় বড় গাছের কাণ্ডে কাঠবিড়ালি গর্ত তৈরি করে, চিঠিটা রাখতে হবে এমন কোনো গর্তে। কাঠবিড়ালির তৈরি করা গর্তে কখনো বৃষ্টির পানি ঢোকে না।

গোপীনাথ বল্লভ শিবশংকরের খোঁজে এসেছেন। তাঁর ছাত্রের শরীর ভালো না। এই অসুস্থ শরীরেও সে যেন কোথায় কোথায় ঘোরে। তিনি খবর পেয়েছেন শিবশংকর মাঝে মাঝে জঙ্গলে ঢোকে। জঙ্গলে বুনো শূকরের উপদ্রব হয়েছে। দাঁতাল শূকর নমশুদ্র পাড়ার একজনকে দাঁত বসিয়ে জখম করেছে। গোপীনাথ বল্লভ বললেন, তুমি এখানে?

হুঁ।

কী কর?

কিছু করি না। একটু আগে হাঁটছিলাম, এখন বসে আছি।

তোমার জ্বর কি বেড়েছে? চোখমুখ লাল। চল বাড়িতে চল।

না।

এখানে বসে থাকবে?

এখানে বসেও থাকব না। আমি জঙ্গলে ঢুকব। জঙ্গলে আমার কিছু কাজ আছে। কাজ শেষ করে বাড়িতে যাব।

জঙ্গলে কী কাজ?

সেটা আপনাকে বলব না।

গোপীনাথ শিবশংকরের হাত ধরলেন। শিবশংকরের মনে হলো, তার হাতের চিঠি কেড়ে নিতে যাচ্ছে। সে এক ঝটকায় হাত সরাল। কঠিন গলায় বলল, আমার কাছে আসবেন না।

তোমার কাছে আসব না কেন?

আপনাকে নিষেধ করেছি এই জন্যে। এখন থেকে আমি আপনার কোনো কথা শুনব না। আপনি একজন মূর্খ। স্বাস্থ্যবিদ্যার কিছুই জানেন না। আয়ুর্বেদ চিকিৎসারও কিছু জানেন না।

তোমার হয়েছে কী?

শিবশংকর উঠে দাঁড়াল। গোপীনাথ চিন্তিত মুখে বললেন, যাও কই?

জঙ্গলে যাই। আপনি আমার পেছনে পেছনে আসবেন না। যদি আসেন আমি ভয়ঙ্কর কাণ্ড করব।

আমার তো মনে হয় তোমাকে ভূত-পেত্নিতে ধরেছে।

শিবশংকর হঠাৎ দৌড়াতে শুরু করল। তার হাতের মুঠায় চিঠি। পেছনে পেছনে দৌড়ালেন গোপীনাথ। তবে তিনি শিবশংকরের নাগাল পেলেন না। সে গহীন জঙ্গলে ঢুকে গেল।

দুপুরের পর অনেক ঝামেলা করে তাকে উদ্ধার করা হলো। সে অনেক উঁচুতে একটা কড়ই গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে জ্বরের ঘোরে কাঁপছিল। বান্ধবপুরে ছড়িয়ে পড়ল মনিশংকরের ছেলে শিবশংকরকে ভূতে ধরেছে। ভূত তাকে কড়ই গাছের মাথায় নিয়ে তুলেছিল। ভূত নামানের জন্যে ভূতের ওঝা আনতে লোক ছুটল।

ধনু শেখের বাড়িতে কনে দেখার লোকজন উপস্থিত। দু'একদিনের মধ্যে তাদের আসার কথা, তারা আজই চলে এসেছে। আজ দিনটা না-কি বিশেষ শুভ। বর শাহনেয়াজ এসেছে। তার বাবা, বড় চাচা এবং এক মামা এসেছেন। তাদেরকে সমাদর করে বসানো হয়েছে। মুরুব্বিরা অপেক্ষা করছেন 'কন্যাসুন্দর আলো'র জন্য। এই আলোয় কুরূপা মেয়েকেও অপরূপ মনে হয়।

শাহনেয়াজ হালকা পাতলা গড়নের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের যুবক। লাজুক স্বভাবের। সহজে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। বেশির ভাগ সময়ই তার দৃষ্টি জানালার দিকে। জানালা দিয়ে বড় গাঙের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। আতর যখন হামিদার হাত ধরে ঘরে ঢুকল তখনো শাহনেয়াজ জানালা দিয়ে তাকিয়ে।

আতরকে বেশ কিছু পরীক্ষা দিতে হলো। যেমন, গামলায় দু'পা ডুবিয়ে মেঝের ওপর হেঁটে যাওয়া পরীক্ষা। মেঝেতে পায়ের পাতার ছাপ কী রকম পড়ছে তা দেখাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। মেঝেতে ছাপ যত কম পড়বে তত ভালো। এরপর শুরু হলো সুতা পরীক্ষা। পায়ের কোনো আঙুল জোড়া কিনা তা সুতা ঢুকিয়ে দেখা।

ছাপ পরীক্ষার পর ধর্মজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা। যেমন, বেতরের নামাজের নিয়ত কী? অজুর নিয়ত কী?

ধর্ম পরীক্ষার পর সাধারণ বুদ্ধি পরীক্ষা। যেমন, একসের বেগুন ডুবাতে কত সের পানি লাগবে?

সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার সময় শাহনেয়াজ বিরক্ত হয়ে বলল, যথেষ্ট হয়েছে, আর কত! বেগুন পানিতে ডুবানোর দরকার কী?

প্রশ্নকর্তা শাহনেয়াজের চাচা। তিনি বললেন, দরকার আছে। তুমি যা বুঝ না তা নিয়া কথা বলবে না। মুরুব্বিদের সঙ্গে কথা বলতে হয় আদবের সঙ্গে। তোমার মধ্যে আদবের অভাব দেখলাম। যাই হোক, মা আতর এখন বলো কোন জিনিস বিহনে খাদ্য প্রস্তুত হবে না?

আতর বলল, আগুন।

হয় নাই। শশা লবণের ছিটা দিয়া খাওয়া যায়। আগুন লাগে না।

আতর বলল, লবণ ?

না, লবণ না। চিন্তা-ভাবনা করে বলো। যা মনে আসে তাই বলবা না।

শাহনেয়াজ বলল, চাচা, আপনিও চিন্তা-ভাবনা করে প্রশ্ন করেন। এইসব কী প্রশ্ন ?

শাহনেয়াজের বড় চাচা উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন গলায় বললেন, তোমার এই বেয়াদবি তো আমি নিব না। সবার সামনে অপমান করেছ। নিজেকে তুমি কী ভাবো ? তাকে বসানোর চেষ্টা করা হলো। সব চেষ্টাই বিফলে গেল। তিনি এই মুহূর্তেই নৌকা নিয়ে গ্রামে ফিরবেন। বিরাট হট্টগোল শুরু হলো। এই হট্টগোলের মধ্যে শাহনেয়াজ আতরকে স্পষ্ট গলায় বলল, মেয়ে দেখার নামে আমরা যে অপমান তোমাকে করেছি তার জন্যে কিছু মনে করো না।

ধনু শেখ শাহনেয়াজের বড় চাচাকে ফেরাবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর লোকজন গিয়ে পায়ে ধরে তাকে ফেরত আনল। গ্রামের মানুষজনের কাছে পায়ে ধরা অনেক বড় জিনিস।

বড় চাচার মাধ্যমেই জানা গেল যে, কন্যাকে সবারই অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে। সুলক্ষণা কন্যা। এখন সবচে' ভালো হয় মাওলানা ডাকিয়ে বিয়ে পড়িয়ে দিলে। পছন্দ হবার পর বিয়ে ফেলে রাখতে হয় না। কন্যার ওপর জিনের নজর পড়ে। বিয়ে পড়ানো হয়ে গেলে জিন নজর দিতে পারে না। বিবাহিত মেয়েদের বিষয়ে জিনের কোনো আগ্রহ নাই।

শিবশংকরের ভূত নামানোর ওঝা চলে এসেছে। উঠানে আগুন করা হয়েছে। আগুনের সামনে জলচৌকিতে বসানো হয়েছে শিবশংকরকে। তার চোখ রক্তবর্ণ। মুখ দিয়ে বাচ্চাদের মতো লালা পড়ছে। আগুনে হলুদ পুড়তে দেয়া হয়েছে। ওঝা মন্ত্রপাঠ করছেন—

কালীঘাটে কালী মা
হায় আলি হায় ফাতেমা
পুবে গুনাই ঘট
রাখিলাম জঙ্গল পট
বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদস্ক শূলপানি। ইত্যাদি.....

মন্ত্রপড়া শেষ করে শুকনা মরিচপোড়া শিবশংকরের নাকের কাছে ধরা হলো। ওঝা কঠিন গলায় বললেন, তুই কে? তোর নাম কী? তুই থাকস কই? না বললে বান মাইরা কী করব তার নাই ঠিক। বল কই থাকস?

শিবশংকর গোঙাতে গোঙাতে বলল, গাছে থাকি।

তুই নারী না পুরুষ, এইটা বল। নারী?

হুঁ।

ওঝা তৃপ্তির হাসি হেসে বলল, যা ভেবেছিলাম তাই। পেতত্নিতে ধরেছে। জঙ্গলায় তিন চাইরটা পেতত্নি থাকে— সব কয়টা দুষ্টের সেরা। এই তোর নাম বল। নাম না বললে মরিচপুড়া নাকের ভিতর ঢুকায়ে দিব।

শিবশংকর বিড়বিড় করে নাম বলল।

পরিষ্কার করে বল। সবাই যেন শুনে, এইভাবে বল। তোর নাম কী?

হরিদাসী।

দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। কারণ অল্প কিছুদিন আগেই হরিদাসী মারা গেছে। তাকে শশ্মানে পুড়িয়ে তার ছাই পাঠানো হয়েছে গঙ্গায় ফেলার জন্যে। তার যে গতি হয় নাই, সে প্রেতযোনী প্রাপ্ত হয়েছে, এটা বান্ধবপুরের লোকজন জানত না।

আতর তার স্বামীর সঙ্গে বিশাল রেলিং দেয়া খাটের এক কোণে জড়সড় হয়ে আছে। মেঝেতে আতরের দাসী হামিদা বসে আছে। প্রথম বাসরের এই নিয়ম। স্বামী যেন স্ত্রীর খুব কাছে যেতে না পারে তার জন্যে পাহারার ব্যবস্থা। সারারাত সে এখানেই থাকবে।

শাহনেয়াজ নিচু গলায় বলল, আমি যে কবিতা লেখি এটা বোধহয় তুমি জানো না। আমার তিনটা কবিতা *সওগাত*-এ ছাপা হয়েছে। *সওগাত* পত্রিকার নাম শুনেছ?

আতর না-সূচক মাথা নাড়ল।

বাংলা পড়তে পার?

আতর হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

শরৎ বাবুর উপন্যাস পড়েছ?

আতর না-সূচক মাথা নাড়ল।

'আনোয়ারা' পড়েছ?

আতর আবারো না-সূচক মাথা নাড়ল। শাহনেয়াজ বলল, এখন থেকে গল্প-উপন্যাস পড়বে। আমি জোগাড় করে দিব। সাহিত্যবোধ তৈরি না হলে আমার কবিতা বুঝতে পারবে না। এখন তোমাকে বিদ্যাসুন্দর পড়ে শোনাব। মন দিয়ে শোন, বুঝতে পার কি-না দেখ। বিদ্যার রূপ বর্ণনা পড়ব। বিদ্যা ছিল তোমার মতোই রূপবতী। তার রূপের বর্ণনা এবং তোমার রূপের বর্ণনা একই। বুঝেছ?

আতর আবার না-সূচক মাথা নাড়ল, তবে তার ধারণা সে মানুষটাকে বুঝতে পারছে। পাগলা ধরনের মানুষ। পাগলা না হলে বইখাতা নিয়ে কেউ স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে আসে না।

শুন রাজা সাবধানে পূর্বে ছিল এই স্থানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিতিবে যেই
পতি হবে সেই যে তাহার।
রাজাপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কী হবে ইহার॥

শাহনেয়াজ মুগ্ধ হয়ে পড়ছে। আতর তাকিয়ে আছে। আতরের হঠাৎ মনে হলো তার জীবনটা মনে হয় সুখেই কাটবে। আজ ভোরেই সে শিবশংকরকে একটা চিঠি দিয়েছে, এই ভেবে এখন খারাপ লাগছে।

বই থেকে চোখ তুলে শাহনেয়াজ বলল, আতর।

জি।

কী পড়ছি বুঝতে পারছ তো?

পারছি।

লোচন অর্থ কী বলো? ওই যে লাইনটা—

বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে
তাহার লোচনে কিবা ফল?

আতর বলল, লোচন অর্থ আমি জানি না।

লোচন হলো চক্ষু। লাইন দু'টার অর্থ হলো, বিধি যাকে চোখ দিয়েছেন সে যদি সেই চোখে না দেখে তাহলে চোখ দিয়ে লাভ কী? বুঝেছ?

জি।

বুঝতে না পারলে বলবে, আমি বুঝিয়ে দেব। হাসে কে ? কে যেন হাসল।

হামিদা হাসে। আপনার কথা শুনে মজা পেয়ে হাসে।

শাহনেয়াজ বই থেকে চোখ তুলে মেঝেতে বসে থাকা হামিদার দিকে তাকাল। হামিদা মাথা নিচু করে প্রায় পুঁটলির মতো হয়ে গেল। শাহনেয়াজ বলল, প্রতিশব্দ বলে একটা বিষয় আছে। একই জিনিসের দু'টা তিনটা করে নাম। প্রতিশব্দ শিখতে হবে। কবিতা লেখার জন্য অত্যন্ত জরুরি। বুঝেছ ?

আতর বলল, কথাটা কারে বললেন ?

শাহনেয়াজ বলল, তোমাকে বলেছি।

হামিদার দিকে তাকায়া বলেছেন তো, এই জন্যে ভাবলাম তাকে বলেছেন।

তোমাকেই বলেছি। এখন তুমি বলো দেখি 'দুপুর'-এর প্রতিশব্দ কী ?

জানি না।

হুট করে জানি না বলবা না। চিন্তা-ভাবনা করবা। চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে। আচ্ছা দেখি আমি কয়টা বলতে পারি।

শাহনেয়াজ চোখে থেকে চশমা খুলল। চোখ বন্ধ করে গড়গড় করে প্রতিশব্দ বলতে থাকল।

দুপুর
মধ্যাহ্ন
দ্বিপ্রহর
মাঝবেলা
দিবামধ্য
মধ্যদিন
যোহর

আতরের হাসি আসছে। সে হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছে। শাহনেয়াজ বলল, এখন আসো রাতের প্রতিশব্দ কী জানো বলতে থাক। আতর অনেক ভেবেচিন্তে বলল, নিশা।

শাহনেয়াজ বলল, হয়েছে। আরো বলো।

আর পারব না। আপনি বলেন।

শাহনেয়াজ গড়গড় করে প্রতিশব্দ বলে যাচ্ছে—

রাত
রাত্রি
নিশীথ

রজনী
যামিনী
বিভাবরী
তামসী
ক্ষণদা
নক্ত
অসুরা
যামবতী

আতর খিলখিল করে হেসে ফেলল। শাহনেয়াজ বন্ধ চোখ খুলে বিরক্ত হয়ে বলল, হাসো কেন ?

আতর বলল, আপনার যা মনে আসতেছে আপনে বলতেছেন।

কী বললা তুমি ? আমি ডিকশনারি মুখস্থ করা লোক। ডিকশনারি মুখস্থ করতে গিয়ে প্রথমবার এম এ সেকেন্ড পার্ট পরীক্ষায় ফেল করেছি।

ও আচ্ছা।

তোমাদের বাড়িতে কি ডিকশনারি আছে ?

না।

ডিকশনারি থাকলে তোমার কাছে পরীক্ষা দিতাম।

আতর বলল, পরীক্ষা দিতে হবে না। রাত অনেক হয়েছে, ঘুমাবেন না ?

শাহনেয়াজ বলল, রাতে আমি ঘুমাই না। যারা কবি-সাহিত্যিক তাদের জন্যে রাতের ঘুম হারাম। কবি-সাহিত্যিকরা রাতে চিন্তা-ভাবনা করেন। দিনে ভাব আসে না। ভাব আসে রাতে।

আপনি ঘুমান কখন ?

দিনে। বলতে গেলে সারাদিনই ঘুমাই। আতর, একটা কলম এনে দাও তো। দেখি কিছু লেখা যায় কি-না। তোমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখে রাখি। কবিতার নামটা মাথায় চলে আসছে— 'মানস প্রিয়া'। মানস প্রিয়া অর্থ কী বুঝেছ ? যে প্রিয়া মনে বাস করে।

আমি তো মনে বাস করি না। আমি বান্ধবপুরে বাস করি।

শাহনেয়াজ বিরক্ত হয়ে বলল, বান্ধবপুর কবির মনের বাইরের কোনো জায়গা না। এখন তুমি বলো মনের কী কী প্রতিশব্দ জানো।

আমি কেনোটাই জানি না। আপনি বলেন।

শাহনেয়াজ আগ্রহ নিয়ে প্রতিশব্দ বলছে। প্রতিশব্দ বলার সময় সে চোখ বন্ধ করে থাকে। কাজেই হামিদা ঘোমটা তুলে আতরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

মন
চিত্ত
অন্তর
মানস
হৃদি
মর্ম
হিয়া
আঁত
দিল
পরান
অন্তকরণ
চিত্তপট
মনোমন্দির

শাহনেয়াজ চোখ মেলে বলল, আরো তিন চারটা আছে, এখন মনে পড়ছে না। এসব হচ্ছে চর্চার ব্যাপার। অভ্যাসের ব্যাপার। অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস। যাও কাগজ-কলম নিয়ে আস। না-কি তোমাদের বাড়িতে কাগজ-কলমের ব্যবহার নাই?

হামিদা কাগজ-কলম আনতে গেল। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে সে ফিরছে না। শাহনেয়াজ বলল, ব্যাপার কী?

আতর বলল, হামিদা ফিরবে না।

কেন?

তার বুদ্ধি বেশি এইজন্যে ফিরবে না।

এখানে বুদ্ধি বেশির কি আছে?

আতর বলল, সে ফিরবে না যাতে আপনি আমারে নিয়া ভাব ভালোবাসা করতে পারেন। খাট থেকে নামেন। দরজা বন্ধ করেন। বাতি নিভান।

কবি শাহনেয়াজ খাট থেকে নামতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আতর তাকে টেনে তুলল। আতরই দরজা বন্ধ করল, বাতি নেভাল।

শাহনেয়াজ বলল, তোমার নাম আতর না হয়ে 'হিয়া' হলে ভালো হতো।

কেন?

অনেক মিল পাওয়া যেত। আতরের সঙ্গে মিলে আতর কাতর পাথর। আর কিছু না। হিয়ার সঙ্গে অনেক কিছু মিলে যেমন—

হিয়া
প্রিয়া
নিয়া
দিয়া

আতর বলল, চুপ করেন তো।

শাহনেয়াজ বলল, বাতিটা একটু জ্বালাও। আমি অন্ধকারে থাকতে পারি না। ভয় লাগে।

কিসের ভয়?

ভূতের। আমাদের বাড়িতে তিন-চারটা ভূত আছে। এর মধ্যে একটা খুবই দুষ্ট। তোমাদের এই বাড়িতে কি ভূত আছে?

আতর হেসে ফেলল। শাহনেয়াজ বলল, রাতে হাসবা না। ভূত প্রেত রাতে হাসির শব্দে আকৃষ্ট হয়। চুম্বক যেমন লোহা টানে— মেয়েদের হাসি তেমন ভূত টানে। কই বাতি জ্বালাতে বললাম না?

আতর বাতি জ্বালালো। *

* 'মধ্যাহ্ন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছিলাম, মনিশংকরের পুত্র শিবশংকর পরিণত বয়সে মারা যান। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার এবং পরে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার। একটি ব্যাপার বলা হয় নি— তিনি চিরকুমার ছিলেন। তাঁর Ph.D গবেষণাপত্র *An Introduction to Tantric Buddhism* তিনি উৎসর্গ করেছিলেন একজন মুসলমান কিশোরীকে। তার নাম আতর।

বড়গাঙ থেকে এক-দেড়শ' হাত দূরে নমশুদ্র পাড়া। বাঁশের খুঁটির ওপর ছনের ছাউনি। শুকানো কলাপাতা এবং চটের বেড়া। কৈবর্তরা থাকে উত্তরে। এদের বাড়িঘরের অবস্থা আরো শোচনীয়। বাড়িঘর নৌকার ছইয়ের মতো। এদের জীবিকা মূলত মাছধরা। শুকাতে দেয়া ছেঁড়া জাল দেখলেই এটা বোঝা যায়। কয়েক ঘর চামার এবং ঢুলি বাজারের কাছাকাছি থাকে। তাদের কারো ঘরেই চাল নেই। ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করে এদের অভ্যাস আছে। খাদ্য সংগ্রহের প্রধান দায়িত্ব মেয়েরা পালন করে। জঙ্গল খুঁড়ে বনআলু নিয়ে আসে। কচুশাক সিদ্ধ খাদ্য হিসেবে অনেকদিন থেকেই চালু। কচুশাকের অভাব হয় নি। নমশুদ্ররা আগে শামুক ঝিনুক খেত না। হাঁসের খাবার মানুষ কেন খাবে? ইদানীং খাচ্ছে।

কৈবর্ত নরেশ পড়েছে বিপদে। তার মেয়ে লক্ষ্মী ভাত খাবে। সে না-কি স্বপ্নে দেখেছে, সোনার থালায় করে শিং মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাচ্ছে। স্বপ্ন দেখার পর থেকেই তার মুখে ভাত ছাড়া অন্য কথা নেই। লক্ষ্মীর বয়স আট। নরেশের ন্যাওটা। সারাক্ষণ বাবার সঙ্গে আছে। বাবা যেখানে যাবে সে সঙ্গে যাবে। লক্ষ্মী গত পাঁচদিন ধরেই ভাত খেতে চাচ্ছে। তার না-কি শুধু একবার ভাত খেলেই হবে। আর ভাত চাইবে না। সোনার থালা লাগবে না। কলাপাতায় দিলেই হবে। নরেশ বলেছে, তোরে বুধবারে ভাত খাওয়ামু যা।

নরেশের স্ত্রী বলেছে, বুধবারে ভাত কই পাইবেন?

নরেশ বলেছে, সেটা আমার বিষয়।

আজ বুধবার। নরেশ মেয়েকে বলেছে, চল দেখি।

লক্ষ্মী বাবার হাত ধরে যাচ্ছে। তার চোখমুখ উজ্জ্বল। কতদিন সে ভাত খায় না। আজ ভাত খাবে ভাবতেই শরীর ঝিমঝিম করছে। মুখ লালায় ভর্তি হয়ে আসছে। লক্ষ্মী বলল, ভাত কী দিয়া খামু বাপজান? শিং মাছ দিয়া?

নরেশ বলল, ভাত এমন জিনিস যে ভাতের উপরে লবণ ছিটা দিয়া খাইলেও অমৃত। একটা কাঁচামরিচ যদি থাকে তাইলে তো কথাই নাই। এক নলা ভাত মুখে দিয়া কাঁচামরিচে কামুড়।

লক্ষ্মী বলল, দেশের ভাত কই গেছে বাপজান ?

নরেশ বলল, যুদ্ধের কারণে দেশে ভাত নাই। যুদ্ধ শেষ হইলেই ভাত পাইবি। তখন কত ভাত খাইবি খা।

তখন আমি পুরা এক পাতিল ভাত খামু।

আচ্ছা যা খাবি।

যুদ্ধ শেষ হইব কবে ?

সময় ঘনায়া আস্‌ছে।

বাপজান, আমারে ঘাড়ে তোল।

নরেশ মেয়েকে ঘাড়ে উঠিয়ে নিল। লক্ষ্মীর মুখে হাসি। বাবার কাঁধে চড়তে তার এত ভালো লাগে। ইস্‌ সে যদি সারাজীবন বাবার ঘাড়ে বসে থাকতে পারত!

নরেশ মেয়েকে এককড়ির দোকানঘরের সামনে ঘাড় থেকে নামাল। এককড়ির এই দোকানঘরটা নতুন। আগের দু'টা ঘর আগুনে পুড়ে যাবার পর এই ঘর বানানো হয়েছে। এককড়ি ক্যাশবাক্সের সামনে বসে ছিলেন। নরেশ দোকানে ঢুকল না। ঢোকার নিয়ম নেই। যেহেতু কৈবর্তরা জল চল জাত না। তারা ঘরে ঢোকা মানে ঘরে রাখা সমস্ত পানি নষ্ট হওয়া।

কর্তা, একটা কথা ছিল।

এককড়ি বিরক্ত মুখে তাকালেন।

নরেশ হাতজোড় করে বলল, এক ছটাক চাউল দেন। মেয়েটা ভাত খাইতে চায়।

এককড়ি বললেন, দেশে কি চাউল আছে যে তোরে দিব ? আমি নিজে একবেলা রুটি খাই। গলা দিয়া রুটি নামে না। তারপরেও খাই।

মেয়েটারে বলেছিলাম বুধবার ভাত খাইতে দিব। একটা সপ্তাহ মেয়েটা অপেক্ষা করেছে। কর্তা, আমার বড়ই আদরের সন্তান।

এককড়ি বললেন, পুলাপান অবুঝ হইলে তারারে বুঝ দিতে হয়। তারে বুঝায়া বল যে দেশে চাউল নাই। আদর দিয়া নষ্ট করিস না। আদরে হয় বাঁদর।

নরেশ বলল, কর্তা, একটু ব্যবস্থা করেন।

আইজ তরে এক ছটাক চাউল দিলাম, কাইল আসব পঞ্চাশজন। তখন উপায় ? আমি কি কুবীর ? আমার কুবীরের ভাণ্ডার নাই। দোকানপাট গেছে আগুনে পুইড়া। মন্দির বানায়েছি। ট্যাকা গেছে জলের মতো।

নরেশ হাত কচলাতে কচলাতে বলল, দোকানের কাউরে গিন্নিমার কাছে পাঠান। উনারে বললেই ভাত আসব। মেয়েটা দোকানের সামনে বইসা খাইব। নুনের ছিটা দিয়া চাইরটা ভাত।

এককড়ি জবাব দিলেন না। কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। খেরো খাতার হিসাব দেখতে লাগলেন। এককড়ি নিশ্চিত নরেশ ঘণ্টাখানিক অপেক্ষা করে চলে যাবে। এদের পেছনে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না।

লক্ষ্মী ফিসফিস করে বলল, ভাত কি দিব বাপজান?

নরেশ জোরগলায় বলল, অবশ্যই দিব। কর্তার ম্যালা কাজ আমি করছি। সাহায্য কোনোদিন চাই নাই। আইজ প্রথম চাইলাম। চল ছায়াতে বসি, আইজ রইদও পড়ছে কড়া।

পিতা-কন্যা কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসা। এখান থেকে এককড়ির নতুন মন্দির দেখা যায়। মন্দিরের চূড়া উঁচু হয়ে উঠে গেছে। চূড়ায় পিতলের ত্রিশূল। রোদে ঝকমক করছে। নরেশ মন্দিরের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করল। বাবার দেখাদেখি লক্ষ্মীও করল। সব দেবদেবীকে তুষ্ট রাখা দরকার। দেবদেবীদের যে-কোনো একজন বিরূপ হলে মহাবিপদ।

ভাত মনে হয় আসবে। নরেশ দেখল এককড়ি তার দোকানের এক কর্মচারীকে নিচুগলায় কী যেন বললেন। সে দোকান থেকে বের হয়ে এককড়ির বাড়ির দিকে যাচ্ছে। নরেশ হৃষ্টচিত্তে বিড়ি ধরাল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাত আসতাছে। ভাতের জন্যে লোক গেছে।

লক্ষ্মী বলল, কলাপাতা কাইট্যা আনবা না?

নরেশ বলল, আগে ভাতটা আসুক। কলাপাতা কাটতে কতক্ষণ?

যে কর্মচারী দোকান থেকে বের হয়েছিল সে ফিরল দেড় ঘণ্টা পর। তার হাতে ভাতের গামলা নেই। হিসাবের কিছু খাতাপত্র।

নরেশ মেয়েকে নিয়ে উঠে পড়ল। তার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। ভয়ঙ্কর কিছু করতে ইচ্ছা করছে। ভয়ঙ্করটা কী বুঝতে পারছে না। সে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, চল বাড়িত যাই। ভাতের চিন্তা বাদ।

লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে বলল, আচ্ছা।

জগতে কাকতালীয় কিছু ব্যাপার সবসময় ঘটে। বিশ্বাসীরা এইসব ঘটনায় অলৌকিকত্ব আরোপ করতে পছন্দ করেন। একটা কাকতালীয় ঘটনা নরেশের জীবনে ঘটল। তার সঙ্গে দেখা হলো লাবুসের। লাবুস ছাতা মাথায় দিয়ে হনহন করে আসছিল।

নরেশকে দেখে ছাতা বন্ধ করে বলল, মেয়েটাকে নিয়ে চল আমার ঘরে। ভাত খাবে।

নরেশ ভাবল সে ভুল শুনছে। ভাতের চিন্তায় অস্থির হয়েছে বলেই ভাতের কথা শুনছে। নরেশ বলল, কর্তা কী কইলেন?

লাবুস বলল, ভাত খেতে বলেছি। মুসলমানের ঘরে খেতে সমস্যা আছে?

নরেশ কিছু বলার আগেই লক্ষ্মী বলল, সমস্যা নাই।

লাবুস বলল, মা, বাপের ঘাড় থেকে নামো। আমার হাত ধর। গল্প করতে করতে যাই।

ঘটনা যতটা কাকতালীয় মনে হচ্ছে ততটা না। এর মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব নেই। এককড়ির দোকানের সামনে এক নমশুদ্র ভাত খাবে বলে বসে আছে, এই খবর লাবুসকে দিয়েছে হাদিস উদ্দিন। সে বাজারে এসেছিল মশুর ডাল কিনতে। তখনি ঘটনা দেখেছে।

লাবুস বলল, ভাত কি দিয়েছে?

হাদিস উদ্দিন বলল, জানি না। বাপ বেটিতে খুঁটি গাইড়া য্যামনে বসছে ভাত না দিয়া উপায় আছে? লাবুস সঙ্গে সঙ্গেই ছাতা নিয়ে বের হয়েছে।

পিতা এবং কন্যা দু'জনকেই খাবার দেয়া হয়েছে। অ্যালমুনিয়ামের গামলাভর্তি ভাত। ভাতের উপর গাওয়া ঘি। একপাশে ডিমের সালুন। আলাদা বাটিতে ডাল। ঘিয়ের গন্ধে জায়গাটা ম ম করছে। নরেশ খাচ্ছে না। হাত গুটিয়ে বসে আছে। লাবুস বলল, নরেশ, তুমি খাবে না?

নরেশ বলল, না কর্তা।

খাবার তো আছে। খাবে না কেন?

লক্ষ্মীর মা পনেরোদিন ধইরা ভাত খায় না। তারে থুইয়া আমি খাব না।

লাবুস কিছু বলল না। লক্ষ্মী ডানহাতে ভাত খাচ্ছে, বামহাতে ডিমটা ধরে আছে। যেন কেউ হঠাৎ এসে ডিমটা নিয়ে যাবে। ডিম রক্ষা করা দরকার। নরেশ মেয়ের পিঠে হাত রেখে বলল, আস্তে আস্তে খাও গো মা।

সব আমি একলা খামু বাপজান?

পারলে খাইবা। পারবা?

হুঁ।

লাবুস বলল, নমশুদ্রপাড়ার সবারই কি তোমার মতো অবস্থা?

জে কর্তা। ভাতের কষ্ট বিরাট কষ্ট।

লক্ষ্মী খাওয়া শেষ করেছে। সে সামান্যই খেতে পেরেছে। ডিমটা খায় নি। এখনো হাতে ধরা। সে জেদ ধরেছে গামলার সব ভাত বাড়িতে নিয়ে যাবে। নরেশ কঠিন গলায় বলেছে, না।

বিদায় নেবার সময় নরেশ হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। লক্ষ্মী তার বাবার কাঁদার কারণ কিছুই বুঝতে পারছে না। সে তার ছোট ছোট হাতে বাবাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে।

সন্ধ্যাবেলা লাবুস হাদিসকে ডেকে পাঠাল। হাদিস যথারীতি জ্বলন্ত কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে হুক্কা এনে লাবুসের সামনে রাখল। সে নিশ্চিত কোনো এক বিশেষ দিনে ছোটকর্তা হুক্কায় টান দেবেন। কিছুই বলা যায় না সেই বিশেষ দিনটা আজই হতে পারে।

হাদিস উদ্দিন! আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি ব্যবস্থা কর।

অবশ্যই ব্যবস্থা করব। সিদ্ধান্তটা কী?

বড়গাঙের পাড়ে আমি একটা লঙ্গরখানা দিব।

কী দিবেন?

লঙ্গরখানা। সেখানে যারা খেতে পায় না তারা একবেলা ভরপেট খাবে।

ছোটকর্তা, পাগলের মতো এইসব কী বলতেছেন! কাঙালের গোষ্ঠী খাওয়ায়া আপনার লাভ কী?

হাদিস উদ্দিন, আমি তো ব্যবসায়ী না যে লাভ লোকসান দেখব।

মাগনার হোটেল চালু করবেন, দুনিয়ার কাঙাল ভিড় করব। কী জন্যে কাজটা করবেন?

লাবুস হাদিস উদ্দিনকে অবাক করে দিয়ে হুক্কার নল টেনে নিল। গুড়ুক গুড়ুক শব্দ হচ্ছে। আম্বুরী তামাকের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। লাবুস বলল, আমি যে হুক্কা খাচ্ছি তুমি দেখে আনন্দ পাচ্ছ না?

হাদিস উদ্দিন মুগ্ধ গলায় বলল, ছোটকর্তা, খুবই আনন্দ পাইতেছি। এই দেখেন আমার চউক্ষে পানি।

লাবুস বলল, ক্ষুধার্ত মানুষরা যখন আরাম করে খিচুড়ি খাবে, সেই দৃশ্য দেখে আমিও আনন্দ পাব। আনন্দে আমার চোখে পানি আসবে। এরচে' বড় কিছু আছে?

জে না। তামাক খায়া মজা পাইতেছেন?

পাচ্ছি।

আপনার জন্যে নেত্রকোনা থাইকা আরো ভালো তামাক আনায়ে দিব।

আচ্ছা।

একটা টান দিবেন বান্ধবপুর জুইড়া বাস ছাড়ব।

ভালো তো।

লাবুস হুক্কা টানছে। গুড়ুক গুড়ুক শব্দ হচ্ছে। হাদিস উদ্দিনের এই দৃশ্যটা দেখে এত ভালো লাগছে। যেন তার দীর্ঘদিনের সাধনা সফল হয়েছে। তার চোখে আবারো পানি এসে গেছে।

ধনু শেখ দুপুরের খাওয়া শেষ করেছেন। এখন একটা চমচম খেয়ে দুপুরের খাবারের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। পানদানিতে পান নিয়ে অপেক্ষা করছে সদরুল। পান মুখে দিয়ে তিনি বাংলাঘরে পাটি পেতে শুয়ে থাকবেন। সদরুল নরম হাতে পিঠে ইলিবিলি করে তাকে ঘুম পাড়াবে। এই সময় পাংখাবরদার সারাক্ষণ টানা পাখায় তাকে বাতাস দিবে। এক মুহূর্তের জন্যেও থামতে পারবে না। থামা মানেই চাকরি শেষ। এর আগে দুইজনের এইভাবে চাকরি গেছে।

আতরের জন্যে ধনু শেখের মন মাঝে মাঝে খারাপ লাগে। এই মন খারাপকে তিনি পাত্তা দেন না। মন ভালো করার নানান বুদ্ধি তাঁর কাছে আছে। তাছাড়া তাঁর মেয়ে ভালো আছে এবং সুখে আছে, এই খবর তিনি পেয়েছেন। মেয়েকে তিনি একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। মেয়ে তার উত্তরে এক লাইন লিখেছে— 'আমি ভালো আছি।' এই যথেষ্ট। মেয়ে নিয়ে এত চিন্তার কিছু নাই। পৃথিবীতে চিন্তার অনেক বিষয় আছে।

গল্পগুজব করার জন্যে একজন কেউ থাকলে ভালো হতো। শরিফাকে তিনি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাকে কি আজ আবার আনাবেন? শরিফার জবুথবু ভাব কেটে গেছে। রঙিলা বাড়ির শিক্ষা। সে এখন কথার পিঠে কথা বলা শিখেছে। গুনগুন করে গানও গায়। ধনু শেখ মোটামুটি বিস্মিত হয়ে বললেন, গান কবে শিখলা?

শরিফা বলল, দিন তারিখের প্রয়োজন আছে? গান শুনতে চাইলে বলেন, শুনায়া দিব।

গান ছাড়া আর কিছু শিখেছ?

ভাব ভালোবাসা দিয়া অচেনা পুরুষের মন ভুলাইতে শিখেছি।

দেখি কেমন শিখেছ ? আমারে দেখাও। আমার মন ভুলাও।

আপনেরে ভুলাইতে পারব না। আপনের মন নাই। আপনের আছে শরীর। তাও পুরাটা নাই। এক ঠ্যাং বাদ।

কটকটি ধরনের কথা। শুনতে খারাপ লাগে না। ধনু শেখ মাথা থেকে শরিফার বিষয় দূর করার চেষ্টা করতে লাগলেন। সারাক্ষণ এক 'নটিবেটি'র কথা ভাবলে দিন চলবে না।

পানের পিক ফেলতে ফেলতে ধনু শেখ বললেন, শুনলাম লাবুস বড়গাঙের পারে লঙ্গরখানা দিয়েছে ?

সদরুল বলল, ঠিকই শুনছেন। বিরাট মচ্ছব বসছে। দুপুর থাইকা খিচুড়ি রান্ধা হয়। চাইরটার সময় খানা দেওয়া হয়। দুই লাইনে খাওয়া। পুরুষ একদিকে, মেয়েছেলে আর পুলাপান আরেকদিকে।

খাওয়ায় কী ?

চাইলে ডাইলে খিচুড়ি। সঙ্গে সবজি থাকে। লাবুস সাব নিজেও সবের সাথে বইসা খান।

বলো কী ?

উনি আগে থাইকাই শুনেছি একবেলা খান।

লঙ্গরখানায় লোক কেমন হয় ?

দুনিয়ার মানুষ। আশেপাশে থাইকাও খবর পাইয়া আসতেছে। মিনি মাগনার খাওয়া।

হিন্দু-মুসলমান আলাদা ?

না, একত্রেই খায়।

লাবুস এই লঙ্গরখানা কতদিন চালাইব ?

অতি অল্পদিন। মানুষ যেভাবে আসতেছে রাজার রাজত্বও ফুরায়া যাবে।

ঘুম জড়ানো গলায় ধনু শেখ বললেন, এরে বলে পরের ধনে পোদ্দারি। একটা পয়সা লাবুসের নিজের রোজগার না। হরিচরণের পয়সা। উড়াইতাছে লাবুস।

সদরুল বলল, কথা সত্য।

ধনু শেখ হাই তুলতে তুলতে বললেন, তুমি দশ বস্তা চাউল আইজ লঙ্গরখানায় পাঠায়া দিবা।

সদরুল ভুল শুনল কি-না বুঝতে পারল না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতে সাহসে কুলালো না। ধনু শেখ চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন। মনে হয় ঘুমে। সদরুলের কথা শুনে কাঁচাঘুম ভাঙলে বিরাট সমস্যা হবে।

ধনু শেখ শুধু একা যে সাহায্য পাঠালেন তা-না। বিশেষ এক জায়গা থেকে তিন হাজার টাকা চলে এলো। জায়গার নাম রঙিলা নটিবাড়ি। টাকা নিয়ে এসেছেন রঙিলা বাড়ির মালেকাইন নিজে। বোরকায় তার সারা শরীর ঢাকা। শুধু সুরমা পরা চোখ দেখা যায়।

মালেকাইন বললেন, পাপ মানুষের মধ্যে লেখা থাকে। টাকাতে পাপ লেখা থাকে না। আপনি কি আমাদের টাকা নিবেন?

লাবুস বলল, নিব।

শুনেছি এখানকার খিচুড়ি খুব ভালো হয়। আমার মেয়েগুলার খুব ইচ্ছা, একবার খিচুড়ি খায়।

আমি খিচুড়ি পাঠায়ে দিব।

মালেকাইন বললেন, আপনার অনেক মেহেরবানি। আমার মেয়েগুলি বলে দিয়েছে, তাদের সবার হয়ে যেন আমি আপনাকে প্রণাম করি।

লাবুস কিছু বলার আগেই মালেকাইন মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

লঙ্গরখানায় শ্রীনাথ খুব ঝামেলা করার চেষ্টা করছে। তার বক্তব্য, হিন্দু হয়ে যবনের খাদ্য খাওয়া মহাপাতক হওয়ার ব্যবস্থা। জাত শেষ।

নরেশ বলল, আমরা নমশুদ্র, আমরার আবার জাত কী?

শ্রীনাথ বলল, ইহকালের জাত না, পরকালের জাত।

পরকালেও জাত আছে জানতাম না তো।

এখন জানলা। রৌরব নরকে পুড়তে হবে খিয়াল রাখ।

নরেশ বলল, রৌরব নরকে আমরা একলা যাব না। আপনিও যাবেন। লাবুস সাহেবের বাড়িতে আপনি ম্যালা দিন ছিলেন। মুসলমানের খানা খেয়েছেন।

না জেনে কথা বলবা না। আমি স্বপাক খেয়েছি। নিজের রান্না নিজে রেঁধেছি।

এইখানেও তো একই ব্যবস্থা। নিজেদের রান্না আমরা নিজেরা রান্দি। ওই দেখেন। দেখছেন ? এখন বিদায় হন। আরেকবার যদি লঙ্গরখানায় আপনেরে দেখি তাইলে ঘটনা আছে।

কী ঘটনা ? কী করবা তুমি ?

নরেশ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, পাছা দিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি ঢুকায়া দিব।

শ্রীনাথ ঝাঁপিয়ে পড়ল নরেশের ওপর। কিল ঘুসি চড় থাপ্পড় চলতে থাকল। নরেশ চুপ করেই রইল। ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তোলা যায় না। নিচু জাতের কেউ ব্রাহ্মণের শরীরে হাত তোলা আর ভগবানের গায়ে হাত তোলা একই ব্যাপার। শ্রীনাথকে অনেক কষ্টে থামালেন মনিশংকর।

মনিশংকর ছেলেকে নিয়ে লঙ্গরখানা দেখতে এসেছিলেন। শিবশংকরকে নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত। তার শরীর পুরোপুরি গেছে। মাথায়ও মনে হয় কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। প্রায় দেখা যায় সে বাড়ির সামনে খুঁটি পুঁতে ঝিম ধরে বসে থাকে।

আজ তিনি ছেলেকে বুঝিয়ে সুজিয়ে এনেছেন।

মনিশংকর লঙ্গরখানার কর্মকাণ্ড মুগ্ধ হয়ে দেখলেন। শিবশংকর হঠাৎ শরীরের ক্লান্তি এবং অসুস্থতা ঝেড়ে ফেলল। তাকে দেখা গেল একটা কাগজ এবং পেনসিল নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘুরছে। মোট কতজন খাবে, তাদের মধ্যে কতজন শিশু, কতজন মহিলা, সব গুছিয়ে লিখছে। এই কাজটা সে কেন করছে বোঝা যাচ্ছে না। তবে কাজটা করে সে যে আনন্দ পাচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে। মনিশংকর লাবুসকে ডেকে আড়ালে নিয়ে গেলেন। তিনি তাকে গোপন কিছু কথা বলবেন।

মনিশংকর বললেন, আমি গত রাতে শেষপ্রহরে একটা স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নটা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব।

লাবুস তাকিয়ে আছে। স্বপ্ন নিয়ে তার সঙ্গে কী আলাপ তা সে বুঝতে পারছে না।

শিবশংকর বললেন, আমি স্বপ্ন দেখেছি হরিচরণ বাবুকে। তিনি যেন ঘরে এসেছেন। আমি ঘুমাচ্ছিলাম। আমাকে জাগালেন। বিছানায় বসলেন। শিবশংকরের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, ছেলের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তিনি বললেন, তাকে কাজে ব্যস্ত রাখ, শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বললাম, কী কাজে ব্যস্ত রাখব ?

উনি বললেন, লঙ্গরখানার কাজ।

তখন ঘুমটা ভেঙে গেল। আমি শিবশংকরকে নিয়ে এসেছি। তুমি তাকে কাজে লাগাও। সে খুব গোছানো ছেলে। যে কাজটা তাকে করতে দিবে সে গুছিয়ে করবে।

লাবুস হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। মনিশংকর বললেন, তুমি যে কর্মকাণ্ড শুরু করেছ তাতে জলের মতো টাকা যাওয়ার কথা। যাচ্ছে না?

যাচ্ছে।

শিবশংকরের মা তার পিতৃধন হিসেবে কিছু টাকা পেয়েছিল। এই টাকাটা কলিকাতায় শিবশংকরের নামে জমা আছে। আমি টাকাটা আনিয়ে তোমাকে দিব। আমার অর্থ গ্রহণ করতে তোমার আপত্তি নাই তো?

জি-না। আপনি দুর্গা পূজা উপলক্ষে আমার মা'কে একটা লাল শাড়ি দিয়েছিলেন। মা কী যে খুশি হয়েছিলেন! উনি শাড়িটা আমার গায়ে জড়ায়ে দিয়ে বলেছিলেন, কী সুন্দর শাড়ি, তুই একটু পরে দেখ।

তোমার মায়ের কোনো সন্ধান তোমার কাছে আছে?

না।

মনিশংকর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, বাবা, একটা কথা মনে রাখবে। মায়ের গায়ে কোনো দোষ লাগে না। ছেলে কখনো মায়ের ত্রুটি দেখবে না। অন্যরা দেখলে দেখবে, সন্তান কখনো না। মনে থাকবে?

থাকবে।

খাবার দেয়া শুরু হয়েছে। একটা খিচুড়ির গামলা শিবশংকরের হাতে। সে মহাউৎসাহে খিচুড়ি দিয়ে যাচ্ছে।

লাবুস খেতে বসেছে। তার একপাশে মীরা, অন্যপাশে নরেশের মেয়ে লক্ষ্মী।

লক্ষ্মীর পাশে বসেছে ইমাম করিম। করিম বলল, এই মেয়ে, গতকাল দেখলাম বিসমিল্লাহ্ না বলে ভাত মুখে দিলা। আজকেও যদি ভুল হয় তাহলে কী যে করব তার নাই ঠিক।

লক্ষ্মী বলল, আমি তো হিন্দু।

হিন্দু হও আর যাই হও বিসমিল্লাহ্ বলবা।

যদি না বলি আপনে কী করবেন?

করিম গম্ভীর গলায় বলল, আমি না খায়া উঠে যাব।

সত্যিই?

অবশ্যই। আমি এককথার মানুষ।

লক্ষ্মী বলল, বিসমিল্লাহ্‌।

আঠারোজনের একটা নতুন দল এসেছে নিশাপুর থেকে। শিবশংকর তাদের কাছে গেল। গম্ভীর গলায় বলল, পরিশ্রম করে এসেছেন, এক্ষুণি খেতে বসবেন না। হাত মুখ ধুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবেন। আগন্তুক দলের অতি বৃদ্ধ একজন বলল, বাবা, খাওয়া থাকব তো?

অবশ্যই থাকবে।

শুনেছি পাচক মুসলমান। মুসলমানের রান্না তো বাবা খাব না। আমি ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ পাচকের রান্নাও আছে। আপনার অসুবিধা হবে না।

যিনি খাওন দিচ্ছেন তাঁর জাত কী?

তাঁর মতো বড় ব্রাহ্মণ খুব কমই আছে।

বৃদ্ধের সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলল, ঠাকুরে কিন্তু ভেজাল থাকে।

বৃদ্ধ বললেন, তা থাকে। তবে 'বিপদে নিয়ম নাস্তি'।

সবাই এই কথায় একমত হলো।

বৃদ্ধ বলল, তাইলে আর অসুবিধা কিছু দেখি না।

প্রায় দুইশ' মানুষ একসঙ্গে খাচ্ছে। লাবুস কিছুক্ষণের জন্যে খাওয়া বন্ধ করে চারদিক দেখল। একই সময়ে গভীর আনন্দ এবং গভীর বেদনায় তার হৃদয় পূর্ণ হলো। শুধু মানুষের পক্ষেই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দু'টি আবেগ ধারণ করা সম্ভব।

সনটা বলি। ১৯৪৩, জুন মাস। ভারতবর্ষ মানুষের তৈরি করা দুর্ভিক্ষে কাতর। গান্ধিজি আগা খান প্রাসাদে তাঁর সমর্থকদের নিয়ে বন্দি। বাপুজিকে ছাড়াই চলছে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। ইংরেজকে ভারত ছাড়তেই হবে। ইংরেজ সরকার নির্বিকারে কংগ্রেস কর্মী গ্রেফতার করে জেলে ঢোকাচ্ছে।

কোলকাতার পথে পথে থালা হাতে নিরন্ন মানুষ। তাদের কাছে ভারত ছাড় আন্দোলন, স্বরাজ, স্বাধীনতা, সব অর্থহীন। তারা ভাত চায়, আর কিছু না। ভাত ভিক্ষা চাইতেও এখন তাদের সংকোচ। তারা ক্ষীণ গলায় বলে, একটু ফ্যান দিবেন মা-জননী?

এক মা তার কংকালসার শিশুকন্যা নিয়ে ডাস্টবিন ঘাঁটছেন। খাদ্য অনুসন্ধান। একটা নাদুসনুদুস কুকুর আগ্রহ নিয়ে এই দৃশ্য দেখছে। তাদের খাবারে ভাগ বসাতে আসা মানুষ দেখে সে অভ্যস্ত না। ডাস্টবিনে একটা কাক বসে আছে। সেও বিস্মিত হয়ে দৃশ্যটি দেখছে।

কোলকাতার পথেঘাটের অতি সাধারণ একটি দৃশ্য। এই সাধারণ দৃশ্যই এক তরুণ যুবক হাঁটু গেড়ে বসে আঁকছে। তরুণের ভরসা হাতে তৈরি কাগজ, পেন্সিল এবং কাঠকয়লা। তার কাঁধের ঝুলিতে চায়নিজ ইংকের কৌটা এবং তুলিও আছে। যুবকের হাতের টান স্পষ্ট এবং ঋজু। সে মুহূর্তের মধ্যেই দৃশ্যটা কাগজে নিয়ে এলো। যুবকের পাশে বসে থাকা বৃদ্ধ বললেন, বাহ্ !

যুবক বলল, ছবি আপনার পছন্দ হয়েছে ?

বৃদ্ধ বলল, জি জনাব মাশাল্লাহ্।

বৃদ্ধকে আমরা চিনি। তিনি কোরানে হাফেজ মাওলানা ইদরিস। তার শরীর এখন কিছুটা সেরেছে। মাঝে মধ্যে তিনি কোলকাতা শহর দেখতে বের হন। বেশিদূর যান না, যমুনার বাড়ির আশেপাশেই থাকেন। এই শহর তাঁর পরিচিত না।

ইদরিস যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, জনাব, আপনার নাম ?

তরুণ বলল, আমার নাম জয়নুল আবেদিন।

মুসলমান ?

জি।

ইদরিস দুঃখিত গলায় বললেন, তাহলে তো জনাব বিরাট পাপ হয়েছে। যাদের জীবন আছে তাদের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ।

জয়নুল আবেদিন কপালের ঘাম মুছলেন। আজ তীব্র গরম পড়েছে। ইদরিস বললেন, মহিলা এঁকেছেন তার জন্যে পাপ হবে। তার কোলের শিশুটার জন্যে পাপ হবে। কুকুর এবং কাক আঁকার জন্যে পাপ হবে। এদের জীবন আছে।

জয়নুল আবেদিন বললেন, সবচে' কম পাপ মনে হয় কাকটা আঁকার জন্য হবে। সবচে' ছোট প্রাণ।

আল্লাহপাকের কাছে প্রাণের কোনো ছোট বড় নাই। তার কাছে সব প্রাণ মূল্যবান।

আপনি মাওলানা ?

জি জনাব। আমি কোরানে হাফেজ। আমার নাম ইদরিস। একটা কাজে বগুড়া যাওয়া ধরেছিলাম। জমিদার শশাংক পালের কাজ। আল্লাহপাক আমাকে কলিকাতা নিয়ে এসেছেন। উনার ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা।

জয়নুল বললেন, আপনি হাফেজ মানুষ। মনে হচ্ছে বিরাট মাওলানা। আপনার দাড়ি নাই কেন ?

মাওলানা ইদরিস লজ্জায় পড়ে গেলেন। লজ্জা এবং দুঃখ মেশানো গলায় বললেন, দাড়ি ছিল। শিয়ালদা ইস্টিশনে অসুখ হলো, তখন চুল দাড়ি সব পড়ে গেল। মনে হয় আমার কোনো পাপের শাস্তি।

আপনি পাপের শাস্তি ভয় পান। সারা দুপুর আমার ছবি আঁকা দেখেছেন, আপনার পাপ হয় নাই ?

এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানা নাই। প্রাণীর ছবি অংকন করা পাপ। অংকন দেখা পাপ কি-না জানি না।

আগ্রহ করে ছবি আঁকা দেখলেন, এর কারণ কী ?

চক্ষের নিমিষে এমন সুন্দর ছবি আঁকলেন। মন ভরে গেছে। মাশাল্লাহ।

এই ছবির কোনটা আপনার ভালো লেগেছে ?

কাকটা।

জয়নুল বিস্মিত হয়ে বললেন, কাক! কেন ?

ইদরিস বললেন, কাকটা দেখে মন হয় এক্ষণ উড়াল দিবে।

বাহ, ভালো বলেছেন তো!

ইদরিস ইতস্তত করে বললেন, জনাব, আরেকটা কাক কি আঁকবেন ?

অবশ্যই। এই ছবিতেই আরেকটা কাক দিয়ে দেই। একটা উড়াল দেয়ার জন্যে তৈরি, আরেকটা তাকিয়ে আছে ডাস্টবিনের দিকে।

দেখতে দেখতে আরেকটা কাক তৈরি হলো। মাওলানা ইদরিস বললেন, সুবাহানাল্লাহ্। জনাব, কাক কীভাবে আঁকেন ?

আপনি কি কাক আঁকা শিখতে চান ?

জি জনাব।

জয়নুল বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন ?

আমার একটা মেয়ে আছে, নাম মীরা। তারে কাক এঁকে দেখাব। সে খুশি হবে। পুলাপানরা এইসব জিনিস দেখলে খুশি হয়।

সত্যি সত্যি কাক আঁকা শিখতে চান ?

জি জনাব। যদি আপনার তকলিফ না হয়।

জয়নুল ছবির খাতা বের করলেন। কাঠকয়লা বের করলেন। তিনি ছাত্রকে বসালেন তার পাশে।

মাওলানা সাহেব, কাকটা দেখতে পাচ্ছেন না ?

জি জনাব।

এক কাজ করি, কাকের ঠোঁটটা এঁকে ফেলি। ঠোঁট তীক্ষ্ণ। একটু বাঁকা না ?

জি।

দেখুন তো হয়েছে ?

জি।

ঠোঁট হয়ে গেছে, এখন ঠোঁটের মাপে শরীর। ঠোঁট বড় শরীর ছোট হলে তো হবে না। এখন মনে মনে মাপটা ঠিক করে ফেলি। মাপ ঠিক করে লেজটা আঁকি। এখান থেকে শুরু করি লেজ। হবে না ?

মাওলানা বললেন, না লেজটা বড় হয়ে যাবে।

ঠিক ধরেছেন। তার মানে আমি কী বলছি বুঝতে পারছেন। লেজটা একটু ছোট করে দিলাম। এখন আঁকব পাখা। কাকের পাখার রঙ কী ?

কালো।

পুরোপুরি কালো না। দাঁড়কাক হয় কুচকুচে কালো। যেন চাইনিজ ইংক। এই কাকগুলোর কালোর সঙ্গে সামান্য সাদা আছে। আমি কালো দিয়েই আঁকব, তারপর ঘাড়ের কাছে রঙটা বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষে পাতলা করে দিব।

কাক আঁকা শেষ হয়েছে। জয়নুল পাতাটা ছিঁড়ে মাওলানার হাতে দিয়ে বললেন, নিয়ে যান।

ইদরিস বললেন, জনাব শুকরিয়া।

জয়নুল বললেন, পান খাবেন ? আমি এখন জর্দা দিয়ে একটা পান খাব। পান সিগারেট খাবার বিরাট বদঅভ্যাস হয়েছে।

ইদরিস বলল, আগে পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। একদিন মনে হলো, কী সর্বনাশ, আমাদের নবীজি তো পান খান না। তাঁর দেশে তো পান সুপারি নাই।

আপনি নবীভক্ত মানুষ ?

জি।

আপনার মতো আরেকজন নবীভক্ত মানুষ ছিলেন। তিনিও কোরানে হাফেজ। বিরাট কবি ছিলেন। শিরাজ নগরে ছিল তাঁর বাড়ি। আমার পছন্দের কবি। তাঁর কবিতার বইয়ের নাম 'দিওয়ান-ই-হাফিজ'। কবি হাফিজের নাম শুনেছেন ?

জি-না। আমি বিরাট মূর্খ।

আমরা সবাই মূর্খ। বলেই জয়নুল ব্যাগ থেকে পানের কৌটা বের করে পান মুখে দিলেন। আয়োজন করে পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, এখন আপনার পরীক্ষা।

কী পরীক্ষা ?

আপনি হচ্ছেন আমার জীবনের প্রথম ছাত্র। কাক আঁকা শিখিয়েছি। ছাত্র কাক আঁকতে পারল কি-না দেখব না ? ওই কাকটা দেখে দেখে একটা কাক আঁকুন। এই নিন কাগজ। এই যে কয়লা। কয়লাটা শক্ত করে ধরবেন। কয়লাকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। কয়লা আপনাকে কামড়াবে না।

মাওলানা কোনোরকম অস্বস্তি ছাড়াই আঁকতে বসলেন।

আমি যদি পা দু'টা আগে আঁকি অসুবিধা আছে ?

না। পা যেহেতু কাকের মাঝখানে, পা দিয়ে শুরু করাই ভালো হবে। Proportion ঠিক করা সহজ হবে।

কী বললেন বুঝলাম না।

আপনাকে বুঝতে হবে না। আপনি ছবি আঁকুন।

মাওলানা কাক এঁকে শেষ করলেন। লজ্জিত চোখে তাকালেন তার তরুণ শিক্ষকের দিকে। জয়নুল বললেন, আপনার কি ধারণা হয়েছে ?

মাওলানা ক্ষীণ গলায় বললেন, হয়েছে।

জয়নুল বললেন, আমি আপনাকে দিলাম দশে আট। আমি ভালো শিক্ষক। ছাত্রকে ভালো নাম্বার দেই। কাকটার নিচে দশে আট লিখে জয়নুল নিজের নাম সই করলেন। করে বললেন, এই কাকটা আমি রেখে দেব। পরীক্ষার খাতা টিচারের কাছে থাকে এই নিয়ম। *

ইদরিস বাসায় ফিরলেন আনন্দ নিয়ে। তাঁর শরীর পুরোপুরি সারে নি। রাত করে জ্বর আসছে। শরীর কাঁপিয়ে ভয়ঙ্কর জ্বর। জ্বরের সময় তাঁর মনে হয় পৃথিবীর অতি শীতলতম স্থানে কেউ তাকে নিয়ে যাচ্ছে। যে শীত দোজখের আগুনের চেয়েও ভয়াবহ। এটা কি মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ? মৃত্যুর আগে আগে মানুষ কি শীতের জগতে প্রবেশ করে ? মৃত্যু কি চরম শৈত্য ? জ্বরের ঘোরে তিনি লম্বা সাদা টুপি পরা কিছু মানুষজন দেখেন। তাদের মাথার টুপি যেমন লম্বা তারাও লম্বা। তাদের সবার গায়ে ভারী কম্বল। সেই কম্বলের রঙও সাদা। তিনি যেমন শীতে কষ্ট পাচ্ছেন তারাও পাচ্ছে। লোকগুলি নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে। ইদরিস তাদের কথা শুনতে পারেন না, তবে তারা যখন মুখ নাড়ে তখন তাদের মুখ দিয়ে সাদা কুয়াশার মতো বের হয়।

* ১৯৬০ কিংবা '৬৫-র দিকে জয়নুল আবেদিনের এই কাক এক ভক্ত অনেক টাকা দিয়ে মাদ্রিদে কিনে নিল। জয়নুলের নাম সই আছে। যে বিখ্যাত কাক বেচারা কিনল তা জয়নুল আবেদিনের আঁকা ছিল না। (সূত্র : অসমর্থিত)

মাওলানা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলেন না। তাঁর লজ্জা লাগে। জ্বর বিকারে মানুষ অনেক কিছু দেখে, তা নিয়ে আলাপ করার কিছু নাই। অবশ্য মাঝে মাঝে গোপালনগর স্কুলের একজন শিক্ষকের সঙ্গে এই বিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়। শিক্ষকের নাম বিভূতিভূষণ। ব্রাহ্মণ। পদবি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শিক্ষক হঠাৎ হঠাৎ যমুনাদের বাড়িতে আসেন। তারাশংকর বাবুর সঙ্গে নানান বিষয়ে কথা বলেন। একসময় ভূতের গল্প শুরু করেন। তখন তারাশংকর বিরক্ত গলায় বলেন, আপনার মতো লেখক যদি ভূতপ্রেত নিয়ে থাকেন তাহলে কি হয়? সাহিত্য জীবননির্ভর। ভূতনির্ভর না।

বিভূতিভূষণ আলাভুলা ধরনের মানুষ। খাওয়াদাওয়ার গল্প করতে খুব পছন্দ করেন। একদিন ইদরিসকে বললেন, শিং মাছের ডিমের পাতুরি কখনো খেয়েছেন?

ইদরিস বললেন, জি-না জনাব।

একদিন খেয়ে দেখবেন। অসাধারণ। কীভাবে রাঁধবেন বলে দেই? খুব সহজ।

জি বলুন।

শিং মাছের ডিমের সঙ্গে সামান্য মসলা দেবেন। কাঁচামরিচ লাগবে। পিঁয়াজ দেবেন না। কলাপাতা দিয়ে ডিম মুড়ে ভাতের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। মনে থাকবে?

জি জনাব থাকবে।

কচ্ছপের ডিমের একটা রন্ধন প্রণালি আমার কাছে আছে। আপনাকে দেব?

জি-না জনাব। আমি মুসলমান। কচ্ছপ খাই না।

আপনি মুসলমান আমি জানি। আমাদের এলাকার অনেক মুসলমান কচ্ছপ খান বলেই বলেছি। কিছু মনে করবেন না।

কিছুই মনে করি নাই।

বিভূতিভূষণ বললেন, আপনাদের যেমন এক ঈশ্বরবাদ, আমাদেরও কিন্তু এক অর্থে তাই। বেদান্ত গ্রন্থে আছে 'একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' এর অর্থ— ব্রহ্মা এক, তিনি ব্যতীত আর উপাস্য কেউ নেই।

মাওলানা জ্বরের সময় তাঁর অভিজজ্ঞতার কথা এই জ্ঞানী মানুষকে বলেছেন। বিভূতিভূষণ বলেছেন, মৃত্যুর আগে আগে সমস্ত মানুষকেই তার মৃত্যুসংবাদ দেয়া হয়। কেউ বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারে না।

ইদরিস বললেন, এটা কি মৃত্যুসংবাদ?

বিভূতিভূষণ বললেন, হতে পারে। তবে আপনি ভয় পাবেন না। মৃত্যুর পরের জগৎ অতি আনন্দময়। সেই আনন্দ যে কী তা আমাদের ধারণা করা সম্ভব না।

শুধুই আনন্দ ? দুঃখ নাই ?

আমার মনে হয় নাই। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের কষ্ট দেবেন তা আমি মনে করি না। মৃত্যুর পর তিনি আমাদের তাঁর জগৎ, তাঁর সৃষ্টিরহস্য দেখার সুযোগ করে দেবেন। পরকাল নিয়ে আমার একটা লেখা আছে। নাম 'দেবযান'। আপনি কি পড়তে চান ?

ইদরিস বললেন, জি-না জনাব। গল্পকাহিনী আমার ভালো লাগে না। কাছাছুল আম্বিয়ার কাহিনী ভালো লাগে। অন্যকিছু ভালো লাগে না।

যমুনার কাছে 'দেবযান' বইটা আছে। যদি পড়তে ইচ্ছা করে পড়বেন।

জি আচ্ছা জনাব। তবে পড়তে ইচ্ছা করবে না।

বিভূতিভূষণ হেসে ফেললেন। *

* এই মহান ঔপন্যাসিক বান্ধবপুর এসেছিলেন। যথাসময়ে সেই গল্প করব। সেপ্টেম্বরের এক তারিখ ১৯৫১ সনে তিনি মারা যান। মৃত্যুর তিনদিন আগে তাঁর ভয়ঙ্কর এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তখন সন্ধ্যাকাল। তিনি বাড়ি ফিরছেন। হঠাৎ দেখলেন একদল শ্মশানযাত্রী শব নিয়ে যাচ্ছে। তিনি কৌতূহলী হয়ে তাকালেন এবং অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলেন, যে শব নিয়ে যাচ্ছে সে আর কেউ না। তিনি নিজে। বিভূতিভূষণ এই দৃশ্য দেখেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তৃতীয়দিনের দিন মারা গেলেন।

আষাঢ় মাসের ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মাওলানা ইদরিস গ্রামে ফিরছেন। তাঁর মন বিষণ্ন। বাড়ি ফেরার আনন্দ পাচ্ছেন না। যে কাজে বের হয়েছিলেন তা শেষ করতে পারেন নি। শশাংক পালের মেয়ে ললিতার খোঁজ বের করতে পারেন নি। যমুনা তাঁকে বগুড়া যেতে দেয় নি, তবে নিজে লোক পাঠিয়েছিল। সেই লোক বিফল হয়ে ফিরেছে।

ইদরিস লঞ্চঘাটায় নেমে হাঁটতে শুরু করেছেন। বৃষ্টি পড়ছে বলেই তাকে কেউ সেভাবে লক্ষ করছে না। তিনি তাতে খুব স্বস্তি বোধ করছেন। সারাজীবন পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পাঞ্জাবি পরেছেন। আজ তাঁর পরনে হাফ হাতা, সাইড পকেটওয়ালা নীল রঙের সার্ট। কালো প্যান্ট। যমুনা তাকে একজোড়া চামড়ার কাবলি স্যান্ডেল কিনে দিয়েছে। কাদার মধ্যে বারবার স্যান্ডেল আটকে যাচ্ছে।

ইদরিসের মাথায় কংগ্রেসি টুপি। যমুনার স্বামী সুরেন এই টুপি তাকে পরিয়ে দিয়েছে। টুপির রঙ কটকটে হলুদ। একজন আগ্রহ করে নিজে মাথায় পরিয়ে দিয়েছে বলে খুলতেও পারছেন না। মাথার টুপি হবে সাদা কিংবা কালো। ইদরিসের হাতে গান্ধিজির লাঠির মতো একটা লাঠি। লাঠিতে ভর দিয়ে খানিকটা কুঁজো হয়ে তিনি লাবুসের বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন। অনেক পরিচিতজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কেউ তাঁকে চিনতে পারে নি।

মীরা পুকুরঘাটে খেলছিল। পুকুরঘাটে আসা তার নিষেধ। আজ বাড়িতে কেউ নেই বলে সে চলে এসেছে। কয়লা দিয়ে ঘর কেটে এক্কাদোক্কা খেলছে। এই খেলাটা একটু অন্যরকম। চাড়া ফেলার সময় সুর করে ছড়া পড়তে হয়—

আমি সতী ভাগ্যবতী
আমি যাব স্বামীর বাড়ি
আমার স্বামীর নাই ঘর
আমারে নিয়া রওনা কর।

'আমারে নিয়া রওনা কর' বলেই চোখ বন্ধ করে উল্টোদিক ফিরে চাড়া ফেলতে হয়। মীরা তাই করল। তার অনুমানে ভুল হলো। চাড়া গিয়ে পড়ল

পুকুরে। চাড়াটা পানিতে ভাসছে। মীরা একধাপ পানিতে নামলেই চাড়া হাতে পাবে। সে সাবধানে একধাপ নিচে নামল। পানিতে ঢেউ ওঠায় চাড়া সামান্য সরে গেছে। তাকে আরো একধাপ নামতে হবে। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। চাড়াটা তার পছন্দের। মীরা যখন ঠিক করল সে আরো একধাপ নামবে তখনি মাওলানা ইদরিস কাদায় মাখামাখি হওয়া পা ধুতে পুকুরঘাটে এলেন। মীরা তার দিকে তাকিয়ে টনটনে পরিষ্কার গলায় বলল, বাবা, তোমার দাড়ি গেল কই?

মেয়ে রাম বলছে না। টর টর করে পরিষ্কার কথা বলছে। ইদরিসকে হতভম্ব করে মীরা বলল, বাবা, তোমার হাতের লাঠি কি সাপমারা লাঠি? বাড়িতে হাদিস চাচা একটা সাপ মেরেছে, এক হাজার হাত লম্বা।

মাওলানা মেয়ের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। শিয়ালদা রেলস্টেশনে যখন পড়ে ছিলেন তখন এই মেয়ের সঙ্গে যে আবার দেখা হবে তিনি কল্পনাও করেন নি। একসময় আল্লাহপাককে ডেকে বলেওছিলেন, হে গাফুরুর রহিম! মেয়েটাকে তোমার হাতে সোপর্দ করলাম।

মীরা বলল, বাবা, কাঁদো কেন?

ইদরিস জবাব না দিয়ে পুকুরঘাটে শোকরানা নামাজ পড়ার জন্যে অজু করতে বসলেন। আল্লাহপাকের কাছে সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। যদিও বান্দার কৃতজ্ঞতায় বা অকৃতজ্ঞতায় তাঁর কিছুই যায় আসে না।

মীরা হাঁটুপানিতে দাঁড়িয়ে বাবাকে দেখছে। মাঝে মাঝে চাড়াটার দিকে তাকাচ্ছে। চাড়াটা বাতাস পেয়ে এখন তার দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে মনে হয় আরেক ধাপ নিচে নামতে হবে না।

নামাজ শেষ করেই মাওলানা কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ থেকে কাগজ এবং কয়লা বের করলেন। বৃষ্টি থেমে গেছে। পুকুরঘাটেই এখন কাক আঁকা যাবে। মেয়েটাকে মুগ্ধ করতে হবে।

মীরা চোখ বড় বড় করে বাবার কাণ্ড দেখছে।

কী কর বাবা?

তাকায়া থাক। দেখ কী করি।

চিঠি লেখ?

হুঁ।

কারে চিঠি লেখ?

ইদরিসের কাক আঁকা শেষ হয়েছে। তিনি কাগজটা মেয়ের সামনে ধরলেন। মীরা চিৎকার দিয়ে বলল, ও আল্লা, কাউয়া!

মাওলানা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত 'কাউয়া' আঁকলেন। মীরার আনন্দের সীমা রইল না। একসময় সে বলল, বাবা, কাউয়া ছাড়া তুমি আর কিছু আঁকা জানো না?

না। একটাই আঁকতে শিখেছি।

কে তোমারে শিখায়েছে? আল্লাহ্।

ঠিকই ধরেছ। উনিই শিখায়েছেন, তবে অন্যের মাধ্যমে।

মাধ্যম কী?

মাওলানা বিপদে পড়লেন। মাধ্যম মেয়েকে বুঝাবেন কীভাবে? এত কথা সে কীভাবে বলে এটাও রহস্য।

বাবা, আরো কাউয়া বানাও।

মাওলানা মেয়ের আনন্দ দেখে অভিভূত হলেন। তিনি মনে মনে বললেন, আল্লাহপাক, তুমি আনন্দ তৈরির কারিগর। আমার মেয়েটার মনে তুমি যে আনন্দ তৈরি করেছ তার জন্যে তোমার পাক দরবারে শুকরিয়া।

মাওলানা ইদরিসের মতো আরেকজন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরেই হাতজোড় করে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মূর্তির সামনে বসে আছেন। তিনি বিড়বিড় করে বলছেন, ঠাকুর, আমার পুত্র এখন সর্ব রোগব্যাধি থেকে মুক্ত। ঠাকুর, এই কাজ হরিচরণের মাধ্যমে তোমারই করা। আমার আনন্দের সীমা নাই।

তিনি ঠাকুরকে ফুল নিবেদন করলেন। তারপর শিবশংকরকে ডেকে পাঠালেন।

বাবা, তোমার শরীর কেমন?

শরীর ভালো।

সব সময় খেয়াল রাখবে ঋষি হরিচরণ তোমার দিকে লক্ষ রাখছেন। উনার নির্দেশমতো কাজ করায় আজ তুমি নীরোগ।

শিবশংকর বলল, স্বপ্ন কোনো বিষয় না বাবা। মানুষ যা ভাবে তাই স্বপ্ন দেখে। সারাক্ষণ তোমার মাথায় ঋষি হরিচরণ থাকে বলে তুমি উনাকে স্বপ্নে দেখ।

মূর্খের মতো অন্যায় কথা বলেছ। ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাও।

শিবশংকর বলল, আমি ঠাকুরদেবতা মানি না বাবা। আমি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য। আমি স্বামীজির মতো নাস্তিক।

বিবেকানন্দ নাস্তিক?

হুঁ। উনি বলেছেন, 'যে ঈশ্বর ক্ষুধায় পৃথিবীর মানুষকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি পরকালে আমাদের পরম সুখে রাখিবেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না।'

মনিশংকর হতভম্ব গলায় বললেন, স্বামীজি এই কথা বলেছেন ? ভগবান রামকৃষ্ণের একনম্বর ভক্ত এই কথা বলেছেন ?

শিবশংকর বলল, বইয়ে লেখা আছে। আমার কাছে বই আছে, দেখাব ?

না, দেখাতে হবে না। আমি আগামী দুইদিন তোমার মুখ দর্শন করব না।

পুত্রের পাপের ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে মনিশংকর ঠিক করলেন, আগামী দুই দিন তিনি নিরম্বু উপবাস করবেন। ঠাকুরঘর থেকে বের হবেন না। একমনে জপ করবেন—

পুত্রকে ক্ষমা কর ঠাকুর।
অবোধকে ক্ষমা কর।
নির্বোধকে ক্ষমা কর।
মূর্খকে ক্ষমা কর।

এককড়ি তাঁর নিজস্ব ঠাকুরঘরে বসে আছেন। সম্পূর্ণ নিজের আলাদা ঠাকুর থাকার আনন্দ এখন বোধ করছেন। তাঁর নিজের ঠাকুর এখন তাকেই দেখবেন, অন্যকে না।

আজ এককড়ির মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত। শ্রীনাথের কারণে বিক্ষিপ্ত। সে না-কি নমশুদ্রদের সাথে মারামারি করে এসেছে। কাজটা ভুল হয়েছে। ছোটজাতকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে হয়। ছোটজাতকে কখনো খেপিয়ে তুলতে নেই। এরা থাকে দলবদ্ধ। সব একসঙ্গে হলে বিরাট ঝামেলা করতে পারে। তাঁর চালের গুদাম লুট করতে পারে। আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। কিছুদিন আগে বাজারের দোকানে আগুন লাগল। এই আগুনের পেছনে নমশুদ্রের দল থাকতে পারে। ছোটলোকরা ধনবানদের দেখতে পারে না।

বান্ধবপুরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা যেটা হয়েছে তার পেছনে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ আছে, এটা তার মনে হয় না। ঠিকমতো তদন্ত হলে সব বের হতো। তদন্ত ঠিকমতো হচ্ছে না। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ ময়মনসিংহ সদর থেকে এসপি সাহেব আসেন নাই। ইংরেজ এসপি এসে একটু হম্বিতম্বি করলে থলের বিড়াল বের হয়ে যেত। এসেছে কে ? ঘোড়ায় চড়ে কেন্দুয়া থানার ওসি। ওসি মুসলমান। নাম হায়দার। এককড়ির উঠানে বসে ডাব খেতে খেতে বলেছেন, এককড়ি বাবু, মসজিদটা পুড়ায়ে দিয়ে ভালো করেন নাই।

হতভম্ব এককড়ি বললেন, মসজিদ পুড়ায়ে দিয়েছি, এটা কী বললেন ?

ওসি সাহেব বললেন, মসজিদের ইমাম সাহেব মারা গিয়েছেন, সেটা বড় কথা না। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় মানুষ মরবেই। কিন্তু মসজিদ— ধর্মস্থান পুড়ায়ে দেয়া বিরাট গর্হিত কাজ হয়েছে। হিসাবে ভুল করেছেন।

এককড়ি হতাশ গলায় বললেন, আমি কী ভুল করলাম! মসজিদ আমি জ্বালায়ে দিব কোন দুঃখে?

দারোগা সাহেব গম্ভীর ভঙ্গিতে গোঁফে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, আমাদের কাছে খবর আছে। থানাওয়ালাদের খুশি করার ব্যবস্থা করেন, দেখি কী করা যায়। আপনি ব্যবসায়ী মানুষ হয়ে হিসাবে কীভাবে ভুল করলেন বুঝলাম না।

এককড়ি থানাওয়ালাদের খুশি করার জন্যে পাঁচশ' টাকা দিলেন।

দারোগা সাহেব চোখ কপালে তুলে বললেন, এই টাকা তো এসপি সাহেবকেই পাঠায়ে দিতে হবে। লালমুখ ইংরেজ সাহেব। পাঁচশ' টাকা হাজার টাকা ছাড়া তাদের সামনেই যাওয়া যায় না।

এককড়ি আরো পাঁচশ' দিলেন।

ঘটনা এইখানেই শেষ হবে বলে এককড়ির মনে হচ্ছে না। থানাওয়ালারা তাঁতের মাকুর মতো আসা-যাওয়া করতেই থাকবে। প্রতিবারই তাদের খুশি করতে হবে।

এককড়ি হাতজোড় অবস্থায় চোখ বন্ধ করে আছেন। মন কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করছেন। রাধাকৃষ্ণকে একমনে কিছুক্ষণ ডাকতে হবে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ স্তব, তারপর শ্রীরাধিকা স্তব পাঠ করতে হবে। অবিনাশ ঠাকুর দু'টি স্তবই লিখে দিয়ে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্তব মুখস্থ হয়েছে। শ্রীরাধিকারটা এখনো হয় নি। এককড়ি স্তব শুরু করলেন—

রক্ষ রক্ষ হরে মাং চ নিমগ্নং কামসাগরে
দুষ্কীর্ত্তিজল পূর্ণে চ দুষ্পারে বহু সংকটে
ভক্তি বিস্মৃতি বীজে চ বিপৎ সোপানদুস্তরে
অতীব নির্মল জ্ঞান চক্ষুঃ প্রচ্ছন্নকারিনে...

খুট করে শব্দ হলো। এককড়ির ধ্যান ভঙ্গ হলো। শ্রীনাথ দরজা খুলে ঢুকেছে। এককড়ি বললেন, ধ্যানে যখন থাকি হুটহাট শব্দ কর, এটা কেমন কথা!

শ্রীনাথ বলল, আপনি ধ্যানে আছেন বুঝব ক্যামনে? দরজা বন্ধ। তারচে' বড় কথা, সামান্য শব্দে যে ধ্যান ভাঙে সেই ধ্যান কোনো ধ্যানের মধ্যেই পড়ে না।

এককড়ি বললেন, তুমি অতিরিক্ত মাতব্বর হয়ে গেছ শ্রীনাথ। তালেবরের মতো কথা বলা শুরু করেছ। শুনেছি তুমি নমশুদ্রর সাথে মারামারি করেছ।

শ্রীনাথ বলল, নরেশ আমারে অপমান করেছিল, আমি তারে দুই চারটা থাপ্পড় দিয়েছি। এটা কোনো বিষয় না। শ্রীরামচন্দ্র কী করেছিলেন শুনেন— শম্বুক নামের এক শূদ্র 'রাম রাম' বলে উঠল। শূদ্রের মুখে রামনাম নিষিদ্ধ। কাজেই শ্রীরাম চন্দ্র নিজের হাতে শম্বুককে হত্যা করলেন।

এককড়ি বললেন, তুমি কি রামচন্দ্র ? তুমি রামচন্দ্র না। তুমি শ্রীনাথ। বিরাট চোর।

চোর ?

অবশ্যই চোর। তুমি লাবুসের বাড়ি থেকে কৃষ্ণমূর্তি চুরি কর নাই ?

করেছি। আপনার জন্যে করেছি। নিজের জন্যে করি নাই।

এককড়ি বললেন, আমার মন বলতেছে— নানান দুষ্কর্ম তুমি ভবিষ্যতে করবা এবং পরে বলবা— কাজটা আপনার জন্যে করেছি। কাজেই তুমি বিদায়।

কী বললেন ?

বললাম, বিদায়। আজ থেকে তুমি আমার সঙ্গে নাই।

আমি যাব কই ? খাব কী ?

তুমি রামচন্দ্ররে ডাক। উনি ব্যবস্থা করে দিবেন। এখন সামনে থেকে যাও।

এককড়ি ধ্যানে মন দিলেন—

হে নাথ করুণাসিন্ধু
দীনবন্ধু কৃপাং করো
ত্বং মহেশ মহাজাতা
দুঃস্বপ্নং মাং ন দর্শয়॥

শ্রীনাথ ধনু শেখের কাছে গিয়েছে। ধনু শেখ লঞ্চের জন্যে নতুন টিকেট বাবু নেবেন। কাজটা যদি পাওয়া যায়।

ধনু শেখ বললেন, অবশ্যই তোমারে চাকরি দিব। লঞ্চের টিকেট বাবুর জন্যে চতুর লোক লাগে। তোমার মতো চতুর তো সচরাচর পাওয়া যায় না। গরু-ছাগল পাওয়া যায়। নির্বোধ পাওয়া যায়। চতুর পাওয়া যায় না।

শ্রীনাথ বিড়বিড় করে বলল, বিরাট কষ্টে আছি। বলতে পারেন না খায়া আছি।

এককড়ি বললেন, না খায়া কেন থাকবা ? লাবুসের লঙ্গরখানা আছে না ? সেখানে ভর্তি হয়ে যাও। একবেলা ভরপেট খিচুড়ি।

শ্রীনাথ বলল, সেটা সম্ভব না। একটা চাকরি দেন— আমি বাকি জীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকব।

বলেছি তো চাকরি দিব। একটা শর্ত আছে। কঠিন কিছু না।

শ্রীনাথ বলল, যে শর্ত দেন সেটাই মানব।

ধনু শেখ বললেন, আমি ঠিক করেছি স্বজাতি ছাড়া চাকরি দিব না। মুসলমান হয়ে যাবে। জটিল কিছু না। তিনবার কলিমা পড়লেই হবে।

শ্রীনাথ হতাশ হয়ে তাকিয়ে আছে। এখন মনে হচ্ছে, এই আধাপাগল মানুষটার কাছে আসাই ভুল হয়েছে।

ধনু শেখ পান মুখে দিতে দিতে বললেন, কলিমা পড়ার পর তোমার 'ধন' কাটা হবে। সামান্য রক্তপাত, তবে অনেকের 'ধন' জন্ম থেকে কাটা থাকে। তাদের কাটা লাগে না।

শ্রীনাথ বলল, এইগুলা কী বলতেছেন ?

ধনু শেখ বললেন, ধুতি খুলে তোমার ধনটা আমারে দেখাও। আমি দেখলেই বলতে পারব তোমার কাটা লাগবে কি-না।

শ্রীনাথ দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ধনু শেখ মনের আনন্দে অনেকক্ষণ হাসলেন। একটা বয়সের পর সহজে আনন্দ পাওয়া যায় না। আনন্দ খুঁজে খুঁজে নিতে হয়। জগতে আনন্দই সত্য। আর সব মিথ্যা।

তিনি গোপনে একটা আন্দোলন শুরু করেছেন। এই আন্দোলনের নাম 'বান্ধবপুর ছাড়'। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ছোটটা। কায়দা করে এই অঞ্চল থেকে হিন্দু দূর করা। দেশ ভাগাভাগি হবে বোঝাই যাচ্ছে। বান্ধবপুর হবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল।

ধনু শেখের মনে হচ্ছে গান্ধিজি যেমন জেল থেকে ছাড়া পেয়েই নিজগ্রামে ফিরে গেছেন, ঠিক সেরকম আরেক গান্ধিও বান্ধবপুরে এসেছে। তার নাম মাওলানা ইদরিস। চুল দাড়ি ফেলে হাতে লাঠি নিয়ে উপস্থিত। হাঁটছেও কুজো হয়ে। দিনরাত নাকি কাকের ছবি আঁকছে। কলিকাতা থেকে এই বিদ্যা নিয়ে এসেছে।

সদরুল।

কর্তা বলেন।

ঝিমায়া বইসা আছ কেন ? কিছু কর।

কী করতে বলেন ?

সব আমাকে বলা লাগবে কেন ? বুদ্ধি খাটায়া কিছু বের কর।

সদরুল বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু বের করতে পারছে না। ধনু শেখ কী চাচ্ছেন বুঝতে পারছে না। গুরুত্বপূর্ণ কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারলে হতো। সে কারো সঙ্গে আলাপও করতে পারছে না। একবার ভাবল লাবুসের সঙ্গে আলাপ করবে। লাবুস মানুষটা শুধু যে গুরুত্বপূর্ণ তা-না। ভালোমানুষও। ভালোমানুষের চিন্তা হবে ভালোমানুষের মতো। সেই চিন্তা কি ধনু শেখের পছন্দ হবে ?

শিবশংকর লঙ্গরখানা নিয়ে কঠিন পরিশ্রম করছে। জঙ্গল থেকে রান্নার খড়ি আনার মতো কাজও করছে। লাবুস তাকে বাধা দিচ্ছে না। মনিশংকর বলে দিয়েছেন,

ছেলে যা করতে চায় তাই যেন তাকে করতে দেয়া হয়। আমার ছেলের কোনো একটা বড় সমস্যা হয়েছে। কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকলে যদি সেই সমস্যাটা কাটে।

বাড়ির সামনে খুঁটি পুঁতে রাখার বিষয়েও তিনি ছেলের সঙ্গে কথা বলেছেন। ছেলে উত্তর দিয়েছে, সেই উত্তরের কোনোই অর্থ হয় না।

বাবা, খুঁটি কেন পুঁতে রাখ? আমাকে বলতে যদি অসুবিধা না থাকে তাহলে বলো।

আমাকে একজন পুঁততে বলেছে।

সে তোমার পরিচিত?

হুঁ।

হিন্দু না মুসলমান?

বাবা, আমার ধর্মে বিশ্বাস নাই। আমি হিন্দু-মুসলমান আলাদা করি না।

যে তোমাকে খুঁটি পুঁততে বলেছে সে ছেলে না মেয়ে?

মেয়ে।

তোমার পরিচিত কেউ?

হ্যাঁ।

জীবিত না মৃত?

বাবা সে মৃত।

এটা কি ভৌতিক কোনো ব্যাপার?

জানি না।

মনিশংকর হরিদ্বার থেকে রক্ষাকবচ এনে ছেলেকে পরিয়েছিলেন। একদিন দেখেন সেই রক্ষাকবচ খুঁটির মাথায় লাগানো। মনিশংকর ছেলেকে ডেকে বললেন, কাজটা কেন করেছ?

শিবশংকর বলল, কবচে আমার বিশ্বাস নাই।

কিসে তোমার বিশ্বাস?

কিসে বিশ্বাস সেটা আমি জানি। কিন্তু আপনাকে বলব না।

কেন বলবে না?

কারণ আপনি বুঝতে পারবেন না।

মনিশংকর ঠিক করেছেন ছেলেকে বান্ধবপুর থেকে কোলকাতা নিয়ে যাবেন। জাপানিরা বোমা ফেললে ফেলবে। কী আর করা। বোমার চেয়েও জরুরি ছেলের চিকিৎসা। ছেলেকে বড় বড় ডাক্তার দেখিয়ে সুস্থ করতে হবে। তিনি এই মুহূর্তে কাজটা করছেন না, কারণ খুঁটি পুঁতার সমস্যা ছাড়া ছেলে ভালো আছে। বিপুল

উৎসাহে লঙ্গরখানার কাজ করে যাচ্ছে। ইমাম করিমের সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। কাজকর্মের ফাঁকে দু'জনে নানান কথা বলে।

করিম তার মনের অতি গোপন পরিকল্পনার কথাও শিবশংকরকে বলেছে। তার পরামর্শ চেয়েছে।

করিম ফিসফিস করে বলেছে, তিনজন মানুষকে খুন করা ফরজ হয়ে গেছে। বুঝেছ, ফরজ হয়ে গেছে।

শিবশংকর বলল, ফরজ কী?

করিম বলল, ফরজ হলো অবশ্য কর্তব্য। তিনজনের মধ্যে একজন হলো ধনু শেখ।

বাকি দু'জনের নাম বলবেন না?

না। দেখি তুমি অনুমান করে বার করতে পার কি না।

তারা কি পুরুষ?

একজন পুরুষ। আরেকজন মহিলা।

তাদের বয়স কত?

ইমাম বলল, থাক বেশি চিন্তার দরকার নাই। আমি নাম বলতেছি। গোপন রাখবা। পুরুষের নাম লাবুস।

লাবুস?

হুঁ। আর মেয়েটার নাম আতর।

আতর? সে তো খুব ভালো মেয়ে।

ইমাম অবাক হয়ে বলল, আতরের কারণে আমার স্ত্রী থাকে নটিবাড়িতে। ভালো কীভাবে হয়?

আতরকে কীভাবে খুন করবেন? সে তো বান্ধবপুরে থাকে না। বিয়ে হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়িতে থাকে।

করিম বলল, শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা বের করেছি, সেখানে যাব।

মানুষ খুন করবেন, আপনার পাপ হবে না?

হবে না। আমি পাগল তো— পাগলের পাপ নাই।

আপনার কথাবার্তা তো পাগলের মতো না।

করিম বলল, কথাবার্তা পাগলের মতো না। কিন্তু হাসি পাগলের মতো। এই দেখ আমি হাসব— পাগলের হাসি।

করিম শরীর দুলিয়ে বিকট শব্দে হাসতে লাগল।

শিবশংকর বলল, পাগলের কি ধর্ম আছে?

করিম বলল, না। পাগলের ধর্ম নাই। তার কাছে আল্লাহ ভগবান সব এক।

কিন্তু আপনি তো নামাজ পড়েন। পাঁচ বেলাই পড়েন। তার অর্থ আপনি পুরোপুরি পাগল হন নাই। কিছু বাকি আছে।

কথা খারাপ বলো নাই।

এখন খুন করলে বিরাট পাপ হবে।

তাও ঠিক।

শিবশংকর বলল, পুরাপুরি পাগল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করেন।

করিম বলল, এছাড়া উপায় কী?

শিবশংকর বলল, আতরের ঠিকানাটা আমাকে দিবেন?

তুমি ঠিকানা দিয়া কী করবা?

একটা চিঠি লিখব।

আচ্ছা ঠিকানা দিব, কোনো সমস্যা নাই। ঠিকানা তোমার কাছে থাকাই ভালো। আমি হারায়ে ফেলতে পারি।

শিবশংকর আতরকে চিঠি লিখেছে। চিঠিটা লিখেছে সংকেতে। তার ধারণা আতর সংকেত ধরতে পারবে। শিবশংকরের চিঠি—

A ১০০১২—দণ্ড—৩২০১—দণ্ড
৮৮৮৯—Pok—৫৫২—০১—N
MAGO TREE. ২১১—০০০
৬১১৯৩৭২ অ—আ—শ

আতর তার শ্বশুরবাড়িতে সুখেই আছে। তাদের বাড়িটা টিনের। বেশ বড় বাড়ি। বাড়ির পেছনে পুকুর। এই পুকুর মেয়েদের। মেয়েরাই শুধু সেখানে স্নান করবে, ধোয়া পাকলার কাজ করবে। পুরুষদের সেখানে যাওয়া নিষেধ। পুকুরের পেছনে ঘন বাঁশঝাড়। বাড়ির সামনে বড় উঠান। উঠানে কয়েকটা আমগাছ। একটা আমগাছে দোলনা টানানো। এই দোলনা কবি শাহনেয়াজের জন্যে। মাঝে মাঝে কবি সাহেব দোলনায় দোল খেতে খেতে কবিতা লিখতে পছন্দ করেন। এতে না-কি ছন্দের হিসাব রাখতে সুবিধা হয়।

আতরের দিন শুরু হয় তার শ্বশুর আব্দুল গনির গজগজানি দিয়ে। তিনি পুত্রকে দীর্ঘক্ষণ গালাগালি না করে তাঁর দিন শুরু করতে পারেন না। শাহনেয়াজ বাবার গালাগালি কিছুই শোনে না। কারণ সূর্য ওঠার পর পরই সে ঘুমাতে যায়। তার ঘুম ভাঙে দুপুরে। ঘুম ভাঙার পরপর দুপুরের খাবার খেয়ে আবার ঘুম। এই ঘুমের নাম ভাত ঘুম। ভাত ঘুম ভাঙে বিকালে। শাহনেয়াজ তখন গোসল সারে, দাঁত মাজে, ইস্ত্রি করা একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে তার দিন শুরু করে।

শাহনেয়াজের বাবা আব্দুল গনি তাঁর দিন শুরু করেছেন। পুত্রকে নিয়ে গজগজানি শুরু হয়েছে— বিদ্বান গাধা এখন ঘুমে। বিদ্যার খেতায় আগুন। এমন বিদ্যার প্রয়োজন নাই। মূর্খ ভালো। টেকা পয়সা খরচ কইরা যে পুলারে বিদ্বান বানায় সে গাধা। তার বাপ গাধা। তার দাদা গাধা। তার চৌদ্দগুষ্ঠি গাধা। তার মাতুল বংশ গাধা। ইত্যাদি।

আতরের শাশুড়ি মোসাম্মত আমিনা বেগম নামাজ কালাম নিয়ে থাকেন। তার হাতে এক হাজার গুটির তসবি। একজন দাসী সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে থাকে এবং তসবির একটা মাথা ধরে থাকে। এই তসবি এক পীরসাহেব তাকে দিয়েছেন।

আমিনা বেগম অবসর সময় বাড়ির পেছনে পুকুরঘাটে বসে থাকেন। তিনি যেখানে সেখানে ভূত দেখেন। ভূতের গল্প বলায় তার আগ্রহ সীমাহীন। শ্রোতা হিসাবে আতরকে পেয়ে তিনি খুশি। তিনি তাঁর ছেলের বউকে ভূতবিষয়ক শিক্ষায় পুরোপুরি শিক্ষিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। এই দায়িত্ব তিনি আগ্রহ এবং আনন্দের সঙ্গে পালন করছেন।

বৌমা শোন। ভূত পেতনি আর জিন কিন্তু এক না। ভূত পেতনি এক কিসিম, জিন আরেক কিসিম। জিনরার দেশ আছে। রাজত্ব আছে। রাজা আছে। ভূত পেতনির এইসব কিছু নাই। বুঝলা ঘটনা?

জি আম্মা বুঝলাম।

ভূত পেতনি আবার দুই কিসিমের। শুকনার ভূত। এরা গাছে থাকে, মানুষের বাড়িঘরে থাকে। আরেক কিসিম হইল পাইন্যা ভূত। এরা থাকে পানিতে—খালে, বিলে, হাওরে। বুঝলা ঘটনা?

জি আম্মা বুঝলাম। এই বাড়িতে কি ভূত আছে?

অবশ্যই আছে। ভূত ছাড়া কি বাড়ি হয়? তিন চাইরটা আছে, এর মধ্যে একটা বড়ই বজ্জাত— নাম 'হাম্বর'।

ভূতদের নাম থাকে?

অবশ্যই থাকে।

আম্মা, 'হাম্বর' ছেলে না মেয়ে?

ছেলে। সন্ধ্যাবেলা বাঁশঝাড়ের কাছে হাম্বর বলে ডাক দিও, দেখবা ঘটনা।

কী ঘটনা?

বাতাস নাই কিছু নাই দেখবা সমানে বাঁশগাছ দুলতাছে।

মোসাম্মত আমিনা বেগম শুধু যে ভূতের গল্প করেন তা না—প্রতি অমাবশ্যায় ভূতদের উদ্দেশে ভোগ দেন। আস্ত গজার মাছ ভেজে বাঁশগাছের নিচে রেখে আসেন। গজার মাছ ভাজা ভূতপ্রেতের অতি পছন্দের খাবার। জিনরা আবার মাছ খায় না। তাদের পছন্দ ছানার মিষ্টি।

একদিন আতর বলল, আম্মা, গজার মাছ ভাজা দেওয়া ঠিক না। মাছ ভাজার লোভে অন্য ভূতরা চলে আসবে। বাড়ি ভর্তি হয়ে যাবে ভূত পেতনিতে।

আমিনা বেগম পুত্রবধূর অজ্ঞতায় খুব মজা পেলেন। তিনি বললেন, এক সীমানার ভূত অন্য সীমানায় যায় না। তাছাড়া হাম্বর আছে। হাম্বর কাউরে ধারে কাছে আসতে দিবে না।

হাম্বরকে কোনোদিন দেখেছেন?

বৌমা, এদের চোখে পরিষ্কার দেখা যায় না। তারপরেও কয়েকবার দেখেছি। খুবই খাটো। পায়ের পাতা অনেক বড়। মুখের কাটা ছোট। পুতি পুতি দাঁত। ইঁন্দুরের দাঁতের মতো।

আমাকে একদিন দেখাবেন?

আচ্ছা যাও চেষ্টা নিব। দেখতে পাবা কি-না জানি না। সবাই দেখে না।

আমিনা বেগম চেষ্টা নিয়েছেন। সন্ধ্যাবেলা আতরকে বাঁশঝাড়ের কাছে নিয়ে গেছেন— হাম্বরের সঙ্গে আতরের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। উঁচু গলায় বলেছেন, ঐ হাম্বর। বদের বাচ্চা কইরে? বউমারে নিয়া আসছি। ভালো কইরা দেখ। এর সাথে বজ্জাতি ফাইজলামি করবি না। ভয় দেখাবি না। নজর দিবি না। অন্য কোনো বদের বাচ্চা যেন নজর না দেয় সেইটাও দেখবি। তুই যে আমার কথা শুনছস তার প্রমাণ দে। বাঁশঝারে ঝাঁকি দে বদের বাচ্চা।

বাঁশঝাড় সত্যি সত্যি দুলে উঠল। আতর ভয়ে তার শাশুড়িকে জড়িয়ে ধরল। আমিনা বেগম বড়ই তৃপ্তি লাভ করলেন। কেউ ভূতের ভয়ে অস্থির হলে তিনি খুব আনন্দ পান। তাঁর মনে হলো— ভালো বৌ পেয়েছেন। মাশাল্লাহ!

অল্প কিছু দিনেই আতর বুঝে ফেলেছে তার স্বামী একজন ব্যর্থ মানুষ। সে যে ব্যর্থ তা নিজে জানে না। ব্যর্থ মানুষরা ক্ষতিকর হয়, এই লোকটা তা না। সে বাস করে প্রবল ঘোরে। এই ঘোর কোনোদিন কাটবে তাও মনে হয় না।

শাহনেয়াজের বর্তমান কর্মকাণ্ড দুই ভাগে ভাগ করা। কাব্যচর্চা এবং মূর্খ স্ত্রীকে শিক্ষিত করা। আতরকে প্রতিদিন গল্প-উপন্যাস পড়তে হচ্ছে। শুধু পড়াতেই শেষ না, মৌখিক পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।

যে উপন্যাস পড়ে শেষ করেছ, তার নাম কী?

নৌকাডুবি।

কে লিখেছেন?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নায়কের নাম কী?

রমেশ।

নায়িকার নাম কী ?

সুশীলা।

পার্শ্বচরিত্রের নাম কী ?

আতর বলল, পার্শ্বচরিত্র কী জিনিস ?

শাহনেয়াজ বলল, যে নায়ক নায়িকা না, তবে তাদের আশেপাশের কেউ।

জানি না।

উপন্যাসটা তোমাকে আবার পড়তে হবে। কাগজ-কলম নিয়ে বসবে। যখনই কোনো নাম আসবে নাম লিখে ফেলবে।

আতর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আতরকে তার স্বামীর কিছু কবিতাও মুখস্থ করতে দেয়া হয়েছে। একটি কবিতার নাম 'চাতকের অশ্রু'।

চাতকের অশ্রু

নিশি পথের পেয়েছি নিমন্ত্রণ
শুনেছি ক্রন্দন।
ব্যথিত চাতক কাঁদে দুলে উঠে বন।
উড়ে যায় পক্ষীগণ।
বহে বায়ু উত্তরী, শন শন শন।
উচাটন হয়েছে তাহাদের মন।
হইতেছে দুঃখের শোণিত ক্ষরণ।

কবিতা মুখস্থ করা ছাড়াও আতরকে যে কাজটি করতে হচ্ছে তা হলো সেজেগুজে কবির সামনে দীর্ঘ সময় বসে থাকা। কারণ কবি প্রচুর প্রেমের কবিতা লেখেন। সেই সময় 'প্রেরণাদাত্রী' লাগে। বসে থাকার সময় হাসা যাবে না। নড়াচড়াও করা যাবে না। এতে কবির মনসংযোগে সমস্যা হয়।

আতর শিবশংকরের চিঠি পেয়েছে। চিঠির অর্থ, কে এই চিঠি পাঠিয়েছে, সে কিছুই বুঝতে পারে নি। সে চিঠি তার স্বামীকে দেখিয়েছে। তার বিদ্বান স্বামী চিঠির অর্থ সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছে। গম্ভীর গলায় বলেছে, এটা তাবিজ। কেউ একজন চিঠির মাধ্যমে তোমাকে তাবিজ করেছে।

তাবিজ কেন করেছে ?

তোমার আমার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়।

তাবিজ পানিতে ডুবিয়ে দিলে তার গুণ নষ্ট হয়। আয়োজন করে সেই তাবিজ পানিতে ডুবানো হলো। শাহনেয়াজ ঘোষণা করল, যেহেতু কেউ একজন তার

স্ত্রীকে তাবিজ করার চেষ্টা করছে, কাজেই সে স্ত্রীকে ফেলে কোলকাতা যাবে না এবং এবছর এমএ পরীক্ষা দেবে না।

আব্দুল গনি বলেছেন, ঠিক আছে দিস না। আগেও দুইবার ফেইল করছস, এইবারও করবি। লাভ কী ? পাস করলেও বিপদ। আরো বড় গাধা হবি।

শাহনেয়াজ বলল, বড় গাধা কেন হব ?

আব্দুল গনি হতাশ গলায় বললেন, ভুল বলেছি। বড় গাধা হবি না। তুই বড় গাধা হইয়াই জন্ম নিছস।

বাবার অপমানসূচক কথায় কবি সাহেবের কোনো ভাবান্তর হলো না। হালকা ধরনের কথাবার্তা শুনলে তার হবে না। সে জগতের মহৎ বিষয় অনুন্ধানে ব্যস্ত। তাছাড়া গতকাল রাত তিনটা একুশ মিনিটে তার মাথায় কবিতার একটা লাইন এসেছে। লাইনটা জেঁকে বসেছে। পিন আটকে যাওয়া রেকর্ডের মতো বেজে যাচ্ছে। লাইনটার ব্যবস্থা করা দরকার। লাইনটা হচ্ছে—

'সরবোরে নীল কমলিনি কাঁদে।'

নীল কমল কাঁদলে ঠিক ছিল। কিন্তু কমলের স্ত্রীলিঙ্গ 'কমলিনি' কেন মাথায় এসেছে তা কবি বুঝতে পারছে না।

রাত অনেক হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার। অসংখ্য তারা উঠেছে। পুকুরঘাটে বসে লাবুস তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তার চোখে মুগ্ধ বিস্ময়। কী বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! মানুষের বাস তার ক্ষুদ্র এক গ্রহে। না জানি অন্য গ্রহগুলিতে কী আছে। কী তাদের রহস্য।

হাসনাহেনা ফুল ফুটেছে। বাতাসে ফুলের সৌরভ ভেসে আসছে। তারস্বরে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। লাবুসের মনে হলো ফুলের সৌরভ, ঝিঁঝির ডাক বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা না। বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এরাও একটা অংশ। এবং মোটেই তুচ্ছ না।

লাবুস।

মাওলানা ইদরিস এসে লাবুসের পাশে বসলেন। লাবুস তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি বাড়িতে পা দেয়ার পর বাড়িটা হেসে উঠেছে।

ইদরিস বললেন, বাবা, তোমার কথা বুঝলাম না।

লাবুস বলল, কোনো কোনো মানুষ আছে যারা যেখানেই যান সেই জায়গা আনন্দে হেসে ওঠে। আবার উল্টাটাও হয়। কিছু মানুষের উপস্থিতিতে জায়গা কাঁদে।

বাবা, তোমার কথা কিছুই বুঝতেছি না।

লাবুস বলল, বুঝার দরকার নাই। আপনি যে কাজে গিয়েছিলেন সেই কাজ তো হয় নাই।

ঠিকই ধরেছ, কাজটা হয় নাই। তোমার অনেকগুলি টাকা নষ্ট করেছি। আমি শরমিন্দা।

আপনি যে সুস্থ অবস্থায় ফিরতে পেরেছেন এতেই আমি খুশি।

ফিরেছি ঠিকই, কিন্তু মনটা খারাপ। শশাংক পালের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পারি নাই।

পূরণ হবে। আপনি যাকে খুঁজছেন সে খবর পাবে এবং একদিন ভরসন্ধ্যায় এই বাড়িতে সে উপস্থিত হবে।

ইদরিস তাকিয়ে আছেন। লাবুসের কোনো কথারই আগামাথা তিনি ধরতে পারছেন না। লাবুস বলল, মাঝে মাঝে আমি চোখের সামনে ভবিষ্যৎ দেখতে পাই।

ইদরিস বললেন, মানুষকে এই ক্ষমতা আল্লাহ্পাক দেন নাই বাবা।

লাবুস চুপ করে রইল। একটা কথা বলতে গিয়েও বলল না। সে যে কথাটা বলতে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে, আপনি যে মেয়ের সন্ধানে গিয়েছিলেন তার নাম আপনি আমাকে বলেন নাই। কিন্তু আমি তার নাম জানি। তার নাম ললিতা। মাওলানা ইদরিসকে চমকে দেয়ার কোনো অর্থ নাই।

কলিকাতা শহর কেমন দেখলেন?

ভালো না। দমবন্ধ লাগে। তবে কয়েকজন অতি ভালোমানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এদের মধ্যে একজন স্কুল শিক্ষক। গোপালনগর স্কুল। বিভূতি বাবু।

লেখক?

হ্যাঁ লেখক। অনেক বই লিখেছেন।

উনিও এখানে আসবেন। আপনি তাঁকে তিনবটের মাথা দেখাতে নিয়ে যাবেন।

মাওলানা ইদরিস অবাক হয়ে বললেন, বিভূতি বাবুকে আমি তিনবটের মাথার কথা বলেছি। উনি সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখতে পছন্দ করেন। উনি বলেছেন আসবেন। তাঁর শরীর সামান্য খারাপ। শরীর সারলেই আসবেন।

হঠাৎ লাবুস পরিষ্কার দেখতে পেল, লেখক মানুষটা পুকুরঘাটের শ্বেতপাথরে বসে আছেন। মুগ্ধ গলায় নিজের লেখা পড়ে যাচ্ছেন।

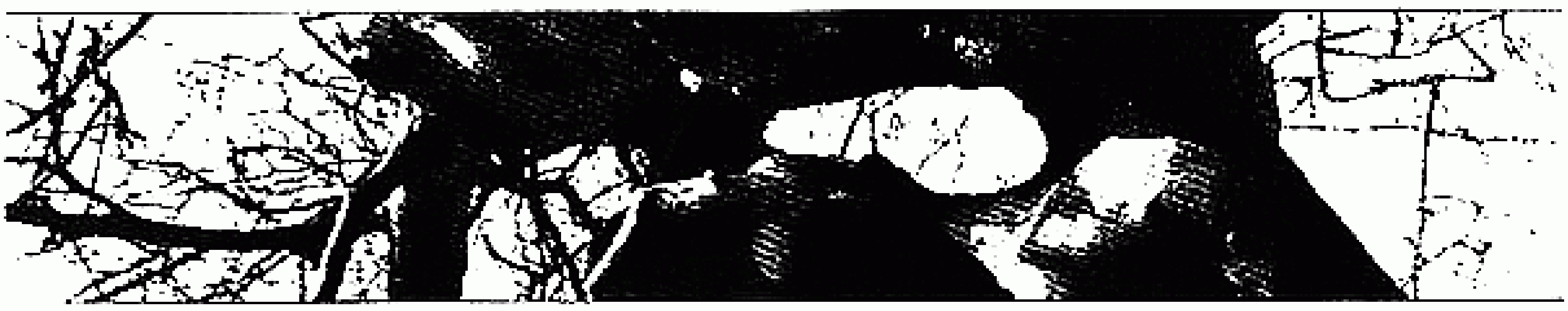

এককড়ির মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূলে গলাছিলা বিকটদর্শন এক শকুন এসে বসেছে। সে আকাশের দিকে গলা লম্বা করছে, আবার গুটিয়ে আনছে। পাখা মেলে দিচ্ছে এবং বন্ধ করছে। তার চকচকে ক্রুদ্ধ লাল চোখ দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে।

মন্দিরচূড়ায় শকুন বসা বিরাট অলক্ষণ। মহাবিপদের অগ্রিম ইশারা। শকুন তাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঢিল ছোড়া হচ্ছে। গুলতিতে করে মার্বেল ছোড়া হচ্ছে। শকুন নির্বিকার। এইসব কর্মকাণ্ড সে মোটেই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে না। কিছুক্ষণ খোল করতাল বাজানো হলো। শব্দে অতিষ্ঠ হয়ে সে উড়ে গেল ঠিকই, আবার এসে বসল। এই দফায় দেখা গেল তার ঠোঁটে মাংস। কিসের মাংস কে জানে! মরা গরুর মাংস হলে সর্বনাশ। মন্দির অশুদ্ধ হয়ে যাবে। মন্দিরশুদ্ধি বিরাট আয়োজনের ব্যাপার।

এককড়ির উপদেশে বাঁশের আগায় খড় বেঁধে সেই খড়ে আগুন লাগিয়ে চেষ্টা শুরু হয়েছে। পশুপাখি আগুন ভয় পায়। এই শকুনটা যত হারামিই হোক আগুন দেখে অবশ্যই পালাবে। এককড়ি বললেন, আধঘণ্টা সময়, এর মধ্যে শকুন দূর করবা। প্রয়োজনে একজন কেউ মন্দিরের মাথায় উঠ। এতগুলি মানুষ একটা শকুন দূর করতে পার না, এটা কেমন কথা!

এককড়ি তার আড়তে কিছুক্ষণ ঝিম ধরে বসে থাকল। মন অস্থির লাগছে। শকুন দূর না হওয়া পর্যন্ত অস্থিরতা কাটবে না। তাঁর ব্যক্তিগত মন্দিরে শকুন বসেছে, বিপদ যা হবার তার হবে। বিপদের কিছু সম্ভাবনা তিনি দেখতে পাচ্ছেন। চালের দাম কমতে শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যে বোরো ফসল উঠবে। এইবার ফসল ভালো হয়েছে। ইংরেজ সরকার ঘোষণা দিয়েছে, যুদ্ধ শেষ হবার পরপরই ভারতকে স্বাধীন করে দেয়া হবে। এটা আরেক যন্ত্রণা। ইংরেজ রাজার জাত। তারা যেভাবে রাজত্ব করেছে সেভাবে কে পারবে? হিন্দু-মুসলমান কাটাকাটি করেই তো মরে যাবে।

এককড়ি শকুনের খবর নিল। শকুন এখনো যায় নাই। ঠিক হয়েছে একজন মন্দিরের চূড়ায় অলঙ্গা দিয়ে চেষ্টা করবে। অলঙ্গা সুপারিকাঠের বর্শা। বর্শাধারী

স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নিচ্ছে। এককড়ি উঠে দাঁড়ালেন। ধনু শেখের সঙ্গে ব্যবসা বিষয়ে পরামর্শ করবেন। গুদামে রাখা চাল পার করতে ধনু শেখের সাহায্য লাগবে। একজন ব্যবসায়ী আরেকজনকে সাহায্য করে। এটাই নিয়ম। সেখানে হিন্দু-মুসলমান থাকে না। এককড়ি ছোট্ট ভুল করে ফেলেছেন। সব চাল আগেই বিক্রি করে দেয়া উচিত ছিল। তবে সময় এখনো আছে।

ধনু শেখ যত্ন করে এককড়িকে বসিয়েছেন। পান-তামাক দেয়া হয়েছে। একজন গেছে মিষ্টি আনতে। মুসলমানের ঘরে দুগ্ধজাত খাদ্য ছাড়া অন্য খাদ্য গ্রহণ করা যায় না। দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য সব অবস্থায় পবিত্র। ধনু শেখ বললেন, মসজিদটা ঠিক করে দিলা না ? এক মাসের উপর হয়ে গেল জুম্মার নামাজ বন্ধ।

এককড়ি বিস্মিত হয়ে বলল, আমি কেন মসজিদ ঠিক করে দেব ? এটা কেমন কথা ?

ধনু শেখ তামাক টানতে টানতে বললেন, থানার দারোগা সাহেব তদন্তে পেয়েছেন— তুমি মসজিদ পোড়ানোর সাথে জড়িত। অনেকে সাক্ষী দিয়েছে। অনেকে আমার কাছে এসেও বলেছে। তোমার নিজের লোকই আমাকে বলে গেছে।

আমার নিজের লোক আপনাকে বলেছে ? সে কে ? তার নামটা বলেন।

শ্রীনাথ বলেছে। টিকেট বাবুর চাকরির জন্যে আমার কাছে এসেছিল। তখন বলল। আমি যদিও তার কথার একটা বর্ণ বিশ্বাস করি নাই।

এককড়ি হতভম্ব হয়ে গেল। কী ভয়ংকর কথা। ধনু শেখ বললেন, শ্রীনাথকে ডেকে জিজ্ঞাস কর। তবে সে কিছু স্বীকার পাবে বলে মনে হয় না। তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, এ ধরনের কথা যেন আর না বলে। মন্দ কথা লোকজন সহজে বিশ্বাস করে।

রাগে এককড়ির শরীর জ্বলে যাচ্ছে। শ্রীনাথের বিষয়ে এক্ষুনি ব্যবস্থা নিতে হবে। সে উঠে দাঁড়াল। ধনু শেখ বললেন, বসো, মিষ্টি আনতে গেছে। দুষ্ট লোকের কথায় এত অস্থির হলে চলে না। এককড়ি বসল। চাল বিক্রির বিষয়টা আলাপ করতে হবে। নৌকা করে এত চাল নেয়া যাবে না। ধনু শেখের লঞ্চের সাহায্য লাগবে।

এককড়ি বলল, আপনার কাছে একটা বিষয়ে সাহায্যের জন্যে এসেছি। সামান্য কিছু চাল কিনে রেখেছিলাম। বোরো ফসল উঠার আগে বিক্রি করে দিব। আপনার লঞ্চে করে চাল নিয়ে যাব কলিকাতা। কোনো সমস্যা আছে ?

ধনু শেখ বললেন, কোনো সমস্যা নাই। তবে লোকজনের চোখের সামনে চালের বস্তা লঞ্চে তোলা ঠিক হবে না। নিশিরাতে তুলতে হবে।

অবশ্যই।

ধনু শেখ বললেন, চাল পচে যায় নাই তো?

এককড়ি বিস্মিত হয়ে বলল, চাল পচবে কী জন্যে?

লুকায়া রাখা চাল। আলো বাতাস পায় নাই। অনেকের এরকম হয়েছে। সিউরাম নামের এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর এক হাজার বস্তা চাল পচে গোবর হয়ে গেছে। সে এখন ন্যাংটা হয়ে পথে পথে ঘুরতেছে।

আপনাকে বলেছে কে?

কাগজে পড়লাম। *ঢাকা প্রকাশে* ছাপা হয়েছে।

আমার চাল ঠিক আছে।

তুমি সাবধানী মানুষ। তোমার সমস্যা হবার কথা না। যাই হোক, চাল কখন পাচার করতে চাও বলো। আমার লঞ্চ তৈয়ার থাকবে।

'পাচার' বলতেছেন কেন? আমি সৎভাবে চাল নিয়া যাব। বিক্রি করব। আমার মধ্যে দুইনম্বরি নাই।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। কথার কথা বলেছি।

এককড়ি বাড়ি ফিরেই গুদামের চাল পরীক্ষা করল। তাকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হলো। দু'টা গুদামের চাল টিনের। টিনের ফুটা দিয়ে বৃষ্টির পানি ঢুকেছে। চাল পচে গেজে উঠেছে। তালাবন্ধ গুদাম কেউ খুলে নাই। এতবড় সর্বনাশ যে হয়ে গেছে তা বোঝা যায় নাই।

একজন এসে এককড়িকে জানাল যে, শকুন দূর হয়েছে। ত্রিশূলে আবার যেন এসে না বসে তার জন্যে বড়ই গাছের ডাল ভেঙে ত্রিশূলকে ঘিরে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। বড়ই কাটার জন্যে শকুন বসতে পারবে না।

বিপদ একা আসে না। সঙ্গী সাথী নিয়ে আসে। এককড়ি সন্ধ্যাবেলায় খবর পেল, কোলকাতায় তার দোকানটা লুট হয়েছে। এইখানেই শেষ না, তার নতুন খবরপাঠক দেবুকে টাকা ব্যাংকে জমা দিতে নেত্রকোনা পাঠানো হয়েছিল। সে টাকা জমা না দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

এককড়ি সারারাত মন্দিরে বসে রইল। তার মধ্যে সে-রাতেই পাগলামির কিছু লক্ষণ প্রকাশিত হলো। তার কাছে মনে হলো, ঠাকুর তাকে পছন্দ করেছেন এবং তার সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে তার নিম্নরূপ কথাবার্তা হলো—

ঠাকুর : কিরে মন বেশি খারাপ?

এককড়ি : আমি ধনেপ্রাণে গেছি ঠাকুর।

ঠাকুর : ধনে গেছিস ঠিক আছে। প্রাণ তো আছে।

এককড়ি : ধন বিনা প্রাণ দিয়ে কী করব ঠাকুর ?

ঠাকুর : ধনের ব্যবস্থা করছি। আমি আছি না ? গুপ্তধনের ব্যবস্থা হবে। এক কলসি মোহর। হবে না ?

এককড়ি : হবে। কবে পাব ?

ঠাকুর : লাবুসের বাড়িতে যা। শিউলি গাছের আশেপাশে মাটিতে পোঁতা গুপ্তধন। খুঁড়ে বের কর।

এককড়ি : এখনি যাব ?

ঠাকুর : তোর ইচ্ছা। তবে এত তাড়াহুড়া কী ? আয় গল্প করি।

এককড়ি মাটি কাটার দু'জন কামলা এবং কোদাল নিয়ে ভোরবেলায় লাবুসের বাড়িতে উপস্থিত। গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার সঙ্গে একটা আলোচনা আছে।

লাবুস বলল, বলুন কী আলোচনা ?

এককড়ি বললেন, আমার যে মহাসর্বনাশ হয়েছে এই খবর কি পেয়েছ ?

কিছুটা শুনেছি।

আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে পাগল হয়ে গ্রামে বন্দরে ঘুরত। আমি বলেই এখনো ঠিক আছি। যাই হোক, মূল কথা এটা না। আমি একটা হাঁড়িতে কিছু সোনার মোহর ভরে তোমার ওই শিউলি গাছের গোড়ায় পুঁতে রেখেছিলাম।

ওইখানে কেন ?

গোপন করার জন্যেই অন্যের জায়গায় রেখেছি। হরিচরণ বাবু এই বিষয়ে জানতেন। আমার এখন মহাবিপদ। মোহরগুলি নিতে এসেছি। দু'টা মোহর তোমাকে আমি দিয়ে যাব।

লাবুস বলল, আমাকে কিছু দিতে হবে না। আপনার জিনিস আপনি নিয়ে যান।

ঠিক কোথায় পুঁতেছি এখন মনে নাই। অমাবশ্যার রাতে পুঁতেছি। দিক খেয়াল নাই। বিস্তর খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে।

করুন।

লাবুস, তুমি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তুমি না চাইলেও আমি তোমাকে দু'টা মোহর দিব। লঙ্গরখানার কাজে লাগবে।

লাবুস বলল, লঙ্গরখানা তো উঠায়ে দিয়েছি।

এককড়ি বললেন, দেশে আবার অভাব আসবে, তখন নতুন লঙ্গরখানা চালু করবা। অর্থের সব সময়ই প্রয়োজন। তাহলে খোঁড়া শুরু করি ?

করুন।

এককড়ি মহাউৎসাহে কাজ শুরু করলেন। রাতের দুশ্চিন্তার কিছুমাত্র এখন তাঁর চোখে-মুখে নাই। তাকে আনন্দিত এবং উৎফুল্ল লাগছে। তিনি পাটি বিছিয়ে বসেছেন। হাদিস উদ্দিন তার জন্যে বাজার থেকে ব্রাহ্মণের হুক্কা এনে দিয়েছে। এককড়ি হাদিস উদ্দিনের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট। তিনি ঠিক করে রেখেছেন, গুপ্তধন পাবার পরপরই হাদিস উদ্দিনকেও খুশি করবেন। তাকে সোনার মোহর দেয়ার কিছু নাই ! টাকা-পয়সা কিছু দিয়ে দিবেন। তিনি হাদিস উদ্দিনকে গলা নিচু করে বলে দিয়েছেন, তুমি কামলা দু'জনের দিকে নজর রাখবা। কঠিন নজর। এরা যেন কিছু পাচার করতে না পারে।

ভাঙা হাঁড়ি, মাটির ঢাকনি জাতীয় জিনিস উঠে আসছে। আসল জিনিস এখনো পাওয়া যাচ্ছে না। তবে অস্থির হবার কিছু নাই। ধৈর্য ধরতে হবে।

খোঁড়াখুঁড়ি দেখার জন্যে অনেকেই জড়ো হয়েছে। গুপ্তধন খোঁজা হচ্ছে এই খবর ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটায় এককড়ি খুবই বিরক্ত। তিনি ধমকাধমকিও করেছেন— লাভ হচ্ছে না।

রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি এবং খোঁড়াখুঁড়ির উত্তেজনায় দুপুরের দিকে এককড়ির ঝিমুনির মতো হলো। এই ঝিমুনির মধ্যেই তিনি ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখলেন। ঠাকুরকে লজ্জিত এবং দুঃখিত দেখাচ্ছিল।

এককড়ি! ছোট্ট ভুল হয়েছে রে।

কী ভুল ?

জায়গা ভুল। গুপ্তধন পোঁতা আছে পুরনো কালীবাড়িতে, এখানে না।

কালীবাড়ির কোন জায়গায় ?

যেখানে বলি দেয়া হয় ঠিক তার নিচে। হাঁড়িকাঠির নিচে। বেশি খুঁড়তে হবে না। ছয় সাত হাত।

মোহর কয়টা আছে জানেন ?

না। তবে বাদশাহি মোহর।

কোন বাদশাহ ? বাদশাহ জাহাঙ্গীর ?

হুঁ। বাদশাহ জাহাঙ্গীর। আসল গিনি সোনার মোহর।

হাঁড়িটা কত বড় সেটা বলেন।

হাঁড়ি না। কলসি। মাঝারি সাইজের কলসি।

এককড়ি হুড়মুড় করে উঠে বসলেন। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

মাটি কামলাদের নিয়ে বিদায় হবার আগে কানে কানে লাবুসকে বললেন, জিনিসটা কোথায় পুঁতেছিলাম ভুলে গেছি, এখন মনে পড়েছে। চলে যাচ্ছি, তবে তুমি নিশ্চিত থাক— তোমাকে একটা মোহর দিব। তোমার জায়গায় হলে দু'টাই দিতাম।

লাবুস বলল, আমার মনে হচ্ছে আপনার শরীরটা খারাপ। আপনি গোসল করে খাওয়াদাওয়া করুন। বিশ্রাম করুন।

জিনিসটা বাড়িতে নিয়া তারপর স্নান করে খাওয়াদাওয়া করব। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়কার মোহর। এখন দর হবে তিনশ' টাকার উপর। হবে না?

জানি না, হতে পারে।

আচ্ছা আমি যাই। আমি কাজ শেষ করে কামলা দু'টাকে পাঠায়ে দিব। এরা গর্ত বন্ধ করে দিয়ে যাবে।

এককড়ি হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন। নষ্ট করার মতো সময় তাঁর হাতে নাই। কালীবাড়ির হাঁড়িকাঠের নিচটা খুঁড়ে সাত-আট ফুট গর্ত করা হয়েছে। ভাঙা ইট এবং ভাঙা কলসি ছাড়া কিছু পাওয়া যায় নি। সন্ধ্যাবেলা প্রবল জ্বর নিয়ে এককড়ি ফিরলেন। তাঁর দৃষ্টি এলোমেলো। চোখ রক্তবর্ণ। হাঁপানির টান উঠেছে। বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তারপরেও ফুসফুস ভরাতে পারছেন না।

জ্বর এসেছে মাওলানা ইদরিসেরও। বেশ ভালো জ্বর। তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না। প্রায়ই জ্বরজ্বারি হচ্ছে। শরীর ভেঙে পড়েছে বলে তিনি অল্পতেই কাহিল হয়ে পড়েছেন। এই কাহিল অবস্থাতেও তাঁকে ছবি আঁকতে বসতে হয়েছে। মীরা মানছে না।

কাকের ছবি হলে কোনো সমস্যা ছিল না। দু'টা টান দিয়েই তিনি কাক আঁকতে পারেন। মীরা বলছে কাক আঁকলে হবে না, মীরাকে আঁকতে হবে। মানুষের ছবি আঁকা গুনাহর কাজ। আল্লাহপাক অপছন্দ করবেন। বাম কাঁধে বসে থাকা ফেরেশতা বদি লিখবে। কিন্তু তিনি মীরাকে মানাতে পারছেন না। সে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে বসে আছে।

মীরা শান্তভঙ্গিতে কোলে হাত রেখে বসে আছে। ইদরিস মীরার সামনে বসেছেন। ছবি আঁকার কাগজ মেঝেতে বিছানো। কাক আঁকা আর মানুষ আঁকা তো এক না। শুরু করবেন কোত্থেকে? চোখ থেকে শুরু করবেন। প্রথমে বাম চোখ। হিসাব করে ডান চোখ। তারপর ঠোঁট।

মাওলানা কয়লা হাতে নিয়ে বললেন, বিসমিল্লাহ। বলেই মনটা খারাপ হলো, একটা নিষিদ্ধ কাজ তিনি বিসমিল্লাহ্ বলে শুরু করতে যাচ্ছেন! ভুলের উপর ভুল।

মীরা বলল, বাবা, শুরু কর।

ইদরিস তার কন্যার বাঁ চোখের মণির কালো অংশ এঁকে ফেললেন। এই চোখ চকচক করছে। চকচকে ভাবটা আনতে হবে। চোখের মণির কালো এখান থেকে একরকম লাগছে না। কোথাও বেশি কোথাও কম। চোখের মণি ঠিক করতে করতেই ডান চোখের মণির জায়গাটা একটা বিন্দু এঁকে ঠিক করলেন। তারপর ঠোঁটের জায়গাটা ঠিক করা হলো। এখন তাঁর মূল কাজ হচ্ছে, একটা চোখ আঁকতে আঁকতে মুখের অবয়বের জায়গাগুলি ঠিক করা।

মাওলানা আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে চলে গেছেন। তার সামনে এখন মীরা ছাড়া কিছু নেই। মীরা কয়েকবার ডাকল, বাবা! বাবা! মাওলানা জবাব দিলেন না।

ঠোঁট আঁকা হয়েছে। ঠোঁট হয়েছে হাসি হাসি। এটা তো ঠিক না, মীরার ঠোঁটে কান্নাভাব প্রবল। হাসিকে কান্নায় নিয়ে আসতে হলে কী করতে হয় তা তিনি জানেন না। কিন্তু তিনি যে জানেন না এটাও ঠিক না। তাঁর মাথার ভেতরে কেউ একজন বসে আছে। সে জানে। সে অবশ্যই জানে।

আঁকা শেষ করে মাওলানা ছবিটির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। আহারে, কী সুন্দর হয়েছে ছবিটা! একটা অবাক শিশু অভিমানে ঠোঁট বাঁকিয়ে বসে আছে। তার চোখে পানি নেই, কিন্তু চোখ দেখে মনে হচ্ছে সে এক্ষুনি কাঁদবে।

মীরা বলল, বাবা, কাঁদছ কেন? ছবিটা তো সুন্দর।

এই জন্যেই কাঁদছি রে মা।

মাওলানা অজু করে নামাজ পড়তে বসলেন। 'তওবা ওস্তাগফেরুল্লাহ্' বলে আল্লাহ্পাকের কাছে অন্যায় এই কাজের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। একটা অবোধ শিশুর মনতুষ্টির জন্যে এত বড় একটা অন্যায় কাজ তাকে করতে হয়েছে।

হাদিস উদ্দিন মীরার ছবি নিয়ে গেল লাবুসের কাছে। লাবুস হতভম্ব হয়ে বলল, একী!

হাদিস উদ্দিন বলল, মওলানা সাব এঁকেছেন।

লাবুস বলল, কী অবিশ্বাস্য কথা!

হাদিস উদ্দিন বলল, আমি ভাবছিলাম উনি কাউয়া ছাড়া কিছুই আঁকতে পারেন না। এখন দেখলেন অবস্থা!

লাবুস বলল, আমি এত সুন্দর এত জীবন্ত ছবি কোনোদিন দেখি নাই। দেখে কি মনে হয় জানো? ডাকলে মীরা উত্তর দিবে।

লাবুস সত্যি সত্যি ছবির দিকে তাকিয়ে ডাকল, মীরা। মীরা। এই পুষ্পরানি।

ধনু শেখ ডেকে পাঠিয়েছেন মাওলানা ইদরিসকে। তিনি জুম্মাঘর তৈরি করে দিয়েছেন। জুম্মাঘরের দায়িত্ব মাওলানাকে দিতে চাচ্ছেন। ইমাম করিমকে দায়িত্ব দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সে এখন জুটেছে এককড়ির সঙ্গে। কোদাল নিয়ে সে এককড়ির সঙ্গে আছে। এককড়ি কোনো জায়গা দেখিয়ে দেয়া মাত্র কোদাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

ধনু শেখ বললেন, মাওলানা, আপনার খবর কী?

জি জনাব। আমার খবর ভালো।

লোকে আপনাকে ডাকে কাউয়া মাওলানা। শুনলাম আপনার এখন একমাত্র কাজ কাউয়া আঁকা। ঘটনা কী?

ইদরিস জবাব দিলেন না। ধনু শেখ বললেন, কাউয়া কেন আঁকেন?

জনাব, মেয়েটারে খুশি করার জন্যে আঁকি।

কাউয়া একটা বদপাখি। ময়লা খায়। দেখতে অসুন্দর। তার ডাক অসুন্দর—কা কা কা। তারে আঁকার দরকার কী? দুনিয়াতে সুন্দর পাখির কি অভাব আছে? ময়ুর আছে, টিয়া আছে, কাকাতুয়া আছে। আছে কিনা বলেন?

জি জনাব আছে।

হাঁস মুরগিও তো সুন্দর। এদের মাংসও খাওয়া যায়। হাঁস মুরগিও তো আঁকতে পারেন।

ইদরিস চুপ করে আছেন। ধনু শেখের নির্দেশে সদরুল মাওলানার সামনে কাজল এবং পেনসিল রাখল। ধনু শেখ বললেন, দেখি একটা কাউয়া আঁকেন। সবাই আপনার কাউয়া আঁকা দেখেছে, আমি দেখি নাই। তাড়াতাড়ি আঁকেন। আমার হাতে সময় নাই।

মাওলানা আঁকলেন। ধনু শেখ বললেন, খারাপ না। দেখি এখন একটা মুরগি আঁকেন।

মাওলানা আঁকলেন।

মুরগির সাথে কয়েকটা বাচ্চা দিয়ে দেন। মায়ের পিছনে পিছনে বাচ্চা ঘুরছে।

মাওলানা আদেশ পালন করলেন।

ধনু শেখ বললেন, কার ভেতরে কী গুণ থাকে কেউ জানে না। আপনার ভিতরে যে এই গুণ ছিল কে ভেবেছে। যাই হোক, জুম্মাঘরের ইমামতি শুরু করেন। আইজ থাইকা শুরু। আছর ওয়াক্তে আজান দিয়া শুরু করেন।

মাওলানা বললেন, আমি বিরাট পাপী মানুষ। একজন পাপী মানুষ মসজিদের ইমাম হইতে পারে না। আমি প্রতিদিন পাপ করি। অবস্থা এমন হয়েছে যে পাপ ছাড়া থাকতে পারি না। আজকেও পাপ করেছি।

কী পাপ করেছেন?

ছবি এঁকেছি।

এটা কি পাপ?

জি জনাব পাপ।

তওবা করেন। তওবা করলেই তো পাপ শেষ। পাপ করবেন, তারপর আল্লাহপাকের কাছে তওবা করে পাপমুক্ত হবেন, আবার পাপ করবেন।

মাওলানা বললেন, এটা আল্লাহপাককে ফাঁকি দেওয়া। এই কাজ আমি করব না।

মসজিদের ইমামতি তাহলে করবেন না?

জি-না জনাব।

আপনি তো বেয়াদবও আছেন। আমার মুখের উপর 'না' বলা বিরাট বেয়াদবি।

আল্লাহপাকের কোনো হুকুমে না বলা বেয়াদবি এবং মহাগুনাহর কাজ। আপনাকে না বলা বেয়াদবি না। তারপরেও 'না' বলায় যদি মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন আমি ক্ষমা চাই। মানুষের মনে কষ্ট দেয়া নিষেধ আছে।

ধনু শেখ বললেন, আপনি আমার সামনে থেকে যান। কাউয়াদের কাছে যান। তাদেরকে নিয়া কা কা করেন।

ইদরিস বের হয়ে এলেন। আসরের নামাজের পর বড়গাঙের পাড়ে বসলেন। হাতে কাগজ এবং পেনসিল। আজ তিনি গাছের ছবি আঁকবেন। গাছের ছবি আঁকাতে কোনো পাপ নেই। গাছ তো আর জীবজন্তু না। সন্ধ্যা নাগাদ ছবি শেষ হলো। প্রাণ, স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যে ঝলমলে একটা লেবুগাছ। লেবু ফলে আছে। লেবু ফুল ফুটে আছে। ছবির দিকে তাকালে লেবু ফুলের গন্ধ নাকে লাগে।

মাওলানা বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন। গাঙের পাড়েই মাগরেবের নামাজ শেষ করেছেন। নামাজে পুরোপুরি মন দিতে পারেন নি। দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল

আকাশের দিকে। সন্ধ্যার আকাশের কী সুন্দর রঙ। পেনসিল দিয়ে এই রঙ আনা যাবে না। রঙ তিনি পাবেন কোথায়? কাঁচাহলুদের রস থেকে হলুদ রঙ পাওয়া যাবে। সেগুন গাছের কচিপাতা বাটা থেকে লাল রঙ। নীল পাবেন কোথায়? সাদা কাপড়ে যে 'নীল' দেয়া হয় সেই নীল কি ব্যবহার করা যায়? আকাশে আছে সাদা মেঘের স্তূপ। সাদা রঙ হিসেবে চকখড়ি কেমন হবে?

মাওলানা সাহেব, আদাব।

ইদরিস চমকে তাকালেন। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটছিলেন বলেই হঠাৎ মনে হয়েছে আকাশ থেকে কেউ একজন বলেছে, আদাব।

আদব বলেছেন এককড়ি। তিনি উবু হয়ে সড়কে বসে আছেন। সড়কের পাশেই গর্ত করা হচ্ছে। গর্ত করছে ইমাম করিম। ঠাকুর স্বপ্নে এককড়িকে দেখা দিয়ে বলছেন, ডিসট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা বরাবর গর্ত করে যেতে। রাস্তার পাশেই আছে। ঠিক কোথায় তা বলা যাচ্ছে না।

ইদরিস বললেন, ভালো আছেন?

এককড়ি বললেন, সামান্য পেরেশানির মধ্যে আছি। তবে আজ পেরেশানির অবসান হবে। কলসি পাওয়া যাবে। আজ দিন শুভ। শুক্লা পঞ্চমী।

ইমাম করিম ঝপাঝপ কোদালের কোপ দিচ্ছে। তার সারা গা দিয়ে ঘাম পড়ছে।

টং করে শব্দ হলো। এককড়ি চেঁচিয়ে উঠলেন, আস্তে আস্তে। কলসি যেন না ভাঙে।

কলসি না। ইটের টুকরায় কোদালের কোপ পড়েছে। এককড়ি তাতে হতাশ হলেন না। হতাশ নামের মানবিক বিষয়টি পাগলদের মধ্যে অনুপস্থিত। তারা বাস করে সম্পূর্ণ হতাশামুক্ত জগতে।

ইমাম করিম বলল, মাওলানা ঘরে যান। আমাদের কাজের অসুবিধা হইতেছে। দাঁড়ায়া দেখার কিছু নাই। জিনিস যখন পাব সবেই জানবেন। আমাদের মধ্যে লুকাছাপা কিছু নাই।

মাওলানা বাড়ির দিকে রওনা হলেন। তাঁর মন বিষণ্ন। তিনি খবর পেয়েছেন করিমের পাগলামি অনেক বেড়েছে। এখন সে রেগে গেলেই কোদাল নিয়ে তাড়া করে। দূরের কোনো শহর বন্দরে ছেড়ে দিয়ে আসা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সবার ধারণা করিমের মাথার যে অবস্থা দূরে ছেড়ে দিয়ে এলে সে পথ চিনে আসতে পারবে না।

অঞ্চলে একজন পাগল থাকা ভালো। এতে অঞ্চলের 'বরকত' হয়। কিন্তু বিপদজনক পাগল থাকা ভালো না। এরা কখন কী করবে তার ঠিক নেই। ইমাম করিম বিপদজনক পাগলের পর্যায়ে পৌছে গেছে। কে বিপদজনক পাগল কে না তা ঠিক করে অঞ্চলের শিশুরা। তারা যখন কোনো পাগল দেখামাত্র বিপুল উৎসাহে তার দিকে ঢিল ছুড়তে শুরু করে তখন ধরেই নিতে হবে সে বিপদজনক পাগল।

বান্ধবপুরের শিশুরা ইমাম করিমকে দেখামাত্র ঢিল ছুড়ছে। এককড়িকে কিছু বলছে না।

সন্ধ্যার পরও খোঁড়াখুঁড়ি চলতে লাগল। এককড়ি আরো দু'জন কামলা নিয়ে এসেছে। রাতচুক্তি কামলা। সারারাত কাজ করবে। সূর্য ওঠার পর মজুরি নিয়ে বিদায় হবে। একটা হ্যাজাক লাইট জোগাড় করা হয়েছে। হ্যাজাকের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। কেমন উৎসব উৎসব ভাব।

রঙিলা বাড়ি থেকে পালকি যাচ্ছে ধনু শেখের বাড়িতে। চার বেহারার পালকি। সঙ্গে একজন চরণদার। পালকিতে শরিফা। অনেকদিন পর আজ তার ডাক পড়েছে।

পালকি হ্যাজাক বাতির কাছে আসতেই শরিফা বলল, থামেন।

পালকি থামল।

শরিফা চরণদারকে বলল, ইমাম করিম সাহেবরে একটু কাছে আসতে বলেন। আমি তারে দুইটা কথা বলতে চাই।

এককড়ি বললেন, পালকিতে কে যায়?

চরণদার বলল, রঙিলা বাড়ির কইন্যা যায়।

খাড়াইলা কেন? কাজের মধ্যে ঝামেলা। চইল্যা যাও।

চরণদার বলল, সামান্য কাজ আছে। কাজ শেষ হলে চলে যাব।

সে করিমের কাছে গেল। করিম কোনো আপত্তি ছাড়াই পালকির পাশে এসে দাঁড়াল।

শরিফা বলল, ভালো আছেন?

করিম বলল, ভালো আছি।

শরিফা বলল, আপনি আমারে দেখতে পাইতেছেন না। আমি দেখতেছি। আপনার শরীর ভালো না। লোকে বলে আপনার না-কি মাথাও নষ্ট হয়েছে।

হুঁ।

আপনি কি আমাকে চিনেছেন ?

হুঁ।

বলেন, আমি কে ?

তুমি শরিফা।

এখন আমি শরিফা না। আমি রঙিলা বাড়ির নটি। আমার নাম—ফুলকুমারী। নাম সুন্দর না ?

হুঁ।

এককড়ি ধমক দিল, কাজকাম ফালায়া কী শুরু করলা ?

করিম কোদাল হাতে নেমে গেল। শরিফার পালকিও চলতে শুরু করল। বেহারারা হুম হাম শব্দ করছে। তারা নিঃশব্দ হলে শরিফার কান্নার শব্দ শুনতে পেত।

ধনু শেখের শরীর খারাপ করেছে। মাথায় যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব। শরীরে চুলকানিও হয়েছে। কিছুক্ষণ চুলকালেই জায়গাটা ফুলে লাল হয়ে যাচ্ছে। সতীশ কবিরাজ সন্ধ্যাবেলা এসে দেখে গেছে। তার কথামতো চুন এবং নিমপাতা বাটা লাগানো হচ্ছে। বমিভাব কাটানোর জন্যে গন্ধভাদালির বড়া খেয়েছেন। এতে বমিভাব আরো বেড়েছে। বমি হয়ে গেলে শরীর ভালো লাগবে— এই ভেবে গলায় আঙুল দিয়ে বমির চেষ্টাও করেছেন। বমি হয় নি। মনে হচ্ছে একগাদা খাবার গলার কাছে আটকে আছে।

শরীরের এই অবস্থায় কোনো কিছুই ভালো লাগে না। শরিফাকে তিনি বললেন, যাও চলে যাও। ভাগো।

শরিফা বলল, কোথায় যাব ?

যেখান থেকে আসছ সেখানে যাবে। আমার শরীর ভালো না।

শরীরে কী হয়েছে ?

চুলকানি হয়েছে।

শরিফা আগ্রহ নিয়ে বলল, দেখি ?

ধনু শেখ বললেন, কী দেখবা ? তুমি কি ডাক্তার কবিরাজ ?

শরিফা বলল, আপনার কুষ্ঠরোগ হয়েছে কি-না এইটা দেখব। আপনার কুষ্ঠরোগ হওনের কথা।

ধনু শেখ থমথমে গলায় বললেন, কী বললা ?

শরিফা স্বাভাবিক গলায় বলল, আমি অন্তর থেকে অনেকবার বলেছি আপনার যেন কুষ্ঠ হয়। অন্তর থেকে যে যা চায় তাই হয়।

ধনু শেখ বললেন, তুমি তো অন্তর থেকে তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চেয়েছিলে। যেতে পেরেছ ?

শরিফা বলল, অন্তর থেকে তখন চাই নাই। এখন চাই।

তোমার ধারণা ইমাম করিম তোমার মতো এক নটিকে বিবাহ করে সংসার শুরু করবে ?

হুঁ।

ধনু শেখ বললেন, সে ইচ্ছা করলেও তো পারবে না। আমি তোমারে এখনো তালাক দেই নাই।

শরিফা বলল, আমি এখনো আপনার স্ত্রী ?

অবশ্যই।

তাহলে আমি আর রঙিলাবাড়িতে যাব না। এইখানেই থাকব। আপনার লোকজনদের বলেন গরম পানি করতে, আমি সিনান করব।

ধনু শেখ বললেন, তুমি এক্ষণ বিদায় হবা।

শরিফা বলল, অবশ্যই না। আমি আপনার স্ত্রী।

বলতে বলতে শরিফা শব্দ করে হাসল। ধনু শেখ বললেন, হাসো কেন ?

শরিফা বলল, আমি আপনার স্ত্রী। থাকি রঙিলাবাড়িতে। একদিন মনে করেন আপনার মেয়েজামাই আমোদ ফুর্তি করতে রঙিলাবাড়িতে উপস্থিত। তার আবার মনে ধরল আমারে... হি হি হি।

ধনু শেখ বললেন, চুপ কর মাগি!

শরিফা বলল, ভালো বুদ্ধি দেই শুনেন। আমারে তালাক দিয়া নিজের ইজ্জত রক্ষা করেন।

ধনু শেখ বললেন, তালাক তালাক তালাক। এখন তুই বিদায় হ।

শরিফা বলল, আজ আর যাব না।

তোরে লাথায়া বিদায় করব।

শরিফা বলল, এইটা পারবেন না। একটা মোটে ঠ্যাং। এক ঠ্যাং-এ লাথালাথি করা যায় না। আচ্ছা শুনেন, আপনার পায়ের পাতা কি চুলকায় ? কুষ্ঠরোগের আরেক লক্ষণ পায়ের পাতা চুলকানি।

রাত অনেক হয়েছে। তারপরেও ঘুম থেকে তুলে সতীশ কবিরাজকে আনা হয়েছে ধনু শেখের কাছে।

ধনু শেখ বললেন, ঠিকমতো বলো। আমার কি কুষ্ঠ হয়েছে?

সতীশ কবিরাজ বললেন, কুষ্ঠ কেন হবে?

ধনু শেখ বললেন, কেন হবে, কেন হবে না এই বিবেচনা পরে। আগে দেখ হয়েছে কি-না।

না।

ধনু শেখ বিরক্ত গলায় বললেন, না দেইখাই বললা— না। আগে দেখ।

সতীশ কবিরাজ বললেন, কুষ্ঠ যে জায়গায় হবে সেই জায়গা অসাড় হয়ে যাবে। সুঁচ ফুটালে ব্যথা লাগবে না।

সুঁচ ফুটায়া দেখ।

তার প্রয়োজন নাই।

ধনু শেখ বিরক্ত মুখে বললেন, প্রয়োজন আছে কি নাই সেই বাহাস পরে করবা, আগে সুঁচ ফুটাও।

সতীশ কবিরাজ সুঁচ ফুটালেন। ধনু শেখ ব্যথায় বিকট চিৎকার দিলেন। সতীশ কবিরাজ বললেন, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমান। আপনার যকৃত দুষ্ট হয়েছে। যকৃত দুষ্ট হলে চুলকানি হয়। সকালে ওষুধ দিব। অনুপান দিয়ে দিব। নিয়মিত খাবেন। ওষুধ যে কদিন খাবেন সেই কদিন মদ্যপান করবেন না।

আজ তো খেতে পারব? ওষুধ তো শুরু হয় নাই।

সতীশ কবিরাজ বললেন, নিয়ম রক্ষার জন্যে সামান্য চলতে পারে। তবে না খাওয়াই উত্তম।

ধনু শেখ বললেন, উত্তমের আমি গুষ্ঠি কিলাই।

প্রচুর মদ্যপান করে তিনি ঘুমুতে গেলেন। বিকট স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভাঙল। স্বপ্নে তিনি একজন কুষ্ঠরোগী। ভিক্ষা করছেন কোলকাতা রেলস্টেশনে। তাঁর শরীরের মাংস গলে গলে পড়ছে। মাছি চারদিকে ভনভন করছে। তাঁর গা থেকে খসে পড়া মাংস একটা মোটা তাজা কুকুর খপ খপ করে খাচ্ছে। কুকুরটা এবার সরাসরি গা থেকে মাংস ছিঁড়ে নিতে এগিয়ে এলো। ভয়ঙ্কর দাঁত নিয়ে সে এগিয়ে আসছে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে তিনি চিৎকার করছেন। সবাই তার চিৎকার শুনছে, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসছে না। বরং তারা মজা পাচ্ছে।

ধনু শেখের চিৎকার শুনে শরিফা ঘরে ঢুকল। সে রঙিলাবাড়িতে ফিরে যায় নি। পাশের কামরায় পাটি পেতে শুয়েছিল। শরিফা বলল, আপনার কী হয়েছে? বোবায় ধরেছে?

ধনু শেখ বললেন, বোবায় ধরে নাই। কুত্তায় ধরেছে।

শরিফা বলল, মেয়েরে খবর দিয়া নিয়া আসেন। যে অসুখ আপনি বাঁধায়েছেন আপনার ভালো সেবা দরকার।

চুপ। সতীশ কবিরাজ দেখে গেছে। সে বলেছে কিছু হয় নাই।

কলিকাতা শহরে যান। বড় ডাক্তার দেখান।

চুপ বললাম। চুপ।

আমি পাশের ঘরেই আছি। আবার যদি কুত্তায় ধরে ডাক দিয়েন।

ধনু শেখ ঘুমুতে গেলেন না। ভোর হওয়া পর্যন্ত জেগে বসে রইলেন। নিজে আরো একবার সুঁচের পরীক্ষাটা করলেন। সুঁচ ফুটালেন এবং প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করে উঠলেন। না, অবশ্যই তার কুষ্ঠরোগ হয় নি। তারপরেও কোলকাতার বড় ডাক্তারকে দেখাতে তো অসুবিধা নাই। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, দু'একদিনের মধ্যে কোলকাতা যাবেন। প্রয়োজনে ডাক্তার বিধানচন্দ্রের কাছে যাবেন।

ডাক্তারের নাম কার্তিক বসু। ক্যাম্বেল হাসপাতালের চর্মরোগের অধ্যাপক। তিনি ধনু শেখকে যত্ন করে দেখলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, এলার্জিঘটিত ব্যাধি।

ধনু শেখ বললেন, কুষ্ঠ না তো? আমার তো মনে হচ্ছে কুষ্ঠ।

কার্তিক বসু বললেন, আপনার মনে হলে তো হবে না। আমার মনে হতে হবে।

সুঁচ ফুটানোর পরীক্ষা করবেন না?

সুঁচ ফুটানোর কী পরীক্ষা?

সুঁচ ফুটালে ব্যথা পাই কি না।

আপনি আগে যে ডাক্তারকে দেখিয়েছেন তার কাছেই যান। আমার যা বলার বলে দিয়েছি।

ধনু শেখ বললেন, এলার্জি হয়েছে বলেছেন, ঠিক আছে মানলাম। এলার্জির চিকিৎসা করুন।

এলার্জির কোনো চিকিৎসা নেই।

তার মানে কী? এটা কী বললেন?

পৃথিবীর অনেক ব্যাধি আছে যার চিকিৎসা নেই। অবাক হবার কিছু নেই।

ধনু শেখ বললেন, আমি আপনার সব কথাই মানলাম। বুঝলাম যে আমার কুষ্ঠ হয় নাই। তারপরেও আমি যদি কুষ্ঠরোগের ওষুধ খাই তাতে অসুবিধা আছে? আমাকে কুষ্ঠরোগের ওষুধ দিন।

কার্তিক বসু উঠে পড়লেন। এই রোগীর পেছনে সময় নষ্ট করার অর্থ হয় না।

ধনু শেখের চুলকানি অসুখ খুবই বাড়ল। বরফ ঘষলে কম থাকে। বরফ ঘষা বন্ধ করলেই অসহ্য চুলকানি। তিনি একজন লোক রেখেছিলেন, যার একমাত্র কাজ চিরুনি দিয়ে তার গায়ে আঁচড়ানো। মাঝে মাঝে বরফ ঘষা।

তাঁর রাতের ঘুম একেবারেই কমে গেল। চোখে ঘুম আসামাত্রই বিকট দুঃস্বপ্ন। এর মধ্যে একটা দুঃস্বপ্ন ভয়ঙ্কর। যেন তার একটা পায়ে দড়ি বেঁধে লঞ্চঘাটের কাছে লম্বা বকুল গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর গা থেকে মাংস গলে গলে পড়ছে। বিকট দুর্গন্ধ। লঞ্চ থেকে যাত্রীরা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে নামছে এবং সবাই তার গায়ে থুথু দিচ্ছে।

ধনু শেখ স্বপ্নটা যখন দেখছেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের দিকে। হিটলারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইটালির সর্বেসর্বা বেনিতো মুসোলিনীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁকে এবং তার বান্ধবীকে গুলি করে হত্যার পর পায়ে দড়ি বেঁধে লরেটো স্কয়ারে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়, যাতে ইটালির মানুষ এদের গায়ে থুথু দিতে পারে। *

* অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি— ১৯৩০ সনের দিকে ইউরোপ ভ্রমণের সময় বেনিতো মুসোলিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখা হয়। মুসোলিনীর লেখা উপন্যাস 'দ্য কার্ডিনালস মিসট্রেস' (ইংরেজি অনুবাদ) পড়েও খুশি হন। মুসোলিনীর আতিথেয়তা এবং ভদ্রতায় রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। মুসোলিনী বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সাহায্যও করেন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন, মুসোলিনী একজন অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক এবং তাঁর অতি পছন্দের। বড় মানুষদের ভুলগুলিও সাধারণত বড় হয়ে থাকে।

১৯৪৫ সনের এপ্রিল মাস। রুশ সৈন্যরা এগিয়ে আসছে বার্লিনের দিকে। তাদের দলপতি মার্শাল জর্জি ঝুকভ। তাঁর প্রধান দুই সহকারীর একজন জেনারেল আইভান কোনেভ। অন্যজন জেনারেল ভাসিল চুইকভ। তাদের সৈন্যসংখ্যা ২৫ লাখ। ট্রাকের ওপর বসানো কাতুশা রকেটের সংখ্যা ৩ হাজার ২৫৫, ট্যাংকের সংখ্যা ৬ হাজারের বেশি। দূরপাল্লার কামান আছে ৪১ হাজার। ঝুকভের বাহিনীকে সাহায্যকারী বিমানের সংখ্যা ৭ হাজার। চলে এসেছে বার্লিনের কাছাকাছি। এরা যে-কোনো সময় বার্লিনে ঢুকে পড়বে। তাদের দূরপাল্লার কামানের আওয়াজ বার্লিনবাসী সারাক্ষণ শুনছে। হিটলার নিজেও শুনছেন। তিনি সেই শব্দ শুনতে শুনতে বললেন, যে-কোনো মূল্যে বার্লিন রক্ষা করতে হবে। রুশরা বার্লিনে ঢুকে পড়লে একদিক দিয়ে ভালো হবে, ব্রিটিশ এবং আমেরিকানরা এটা পছন্দ করবে না। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করবে।

রাজধানীর কমান্ডান্ট মেজর জেনারেল হেলমুট রেম্যান। তিনি হিটলারের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলেও পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারছিলেন। হিটলার বললেন, আমার বিমানবাহিনী কোথায়?

হেলমুট বললেন, বিমান আকাশে উড়তে পারছে না। জ্বালানি নেই।

হিটলার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, জ্বালানি নেই কেন? জেনারেল গথার্ড হেইনরিচকে টেলিফোনে ধর। সে বলুক বিমানবাহিনীর জন্যে জ্বালানি কেন নেই।

জেনারেল হেইনরিচকে টেলিফোনে ধরা গেল না। জেনারেল উইলহেম মোনকিকে পাওয়া গেল।

জেনারেল মোনকি বললেন, আপনি যাতে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে পারেন তার জন্যে আমি বিশেষ ব্যবস্থায় দু'টি বিমান প্রস্তুত রেখেছি।

হতভম্ব হিটলার বললেন, আমি পালিয়ে যাব?

জার্মান জাতিকে রক্ষার জন্যে আপনার বেঁচে থাকা জরুরি।

হিটলার কঠিন গলায় বললেন, আমাকে পালিয়ে যেতে হবে? আমাকে রক্ষা করার জন্যে আমার জেনারেলরা কোথায়?

জেনারেলের বক্তব্য শোনা গেল না, কারণ কাতুশা রকেট, যার আরেক নাম স্টালিন অরগান্স, বৃষ্টির মতো বার্লিনে আসতে শুরু করেছে।

২০ এপ্রিল হিটলারের জন্মদিন। হিটলার তাঁর বান্ধবীকে পাশে নিয়ে বাঙ্কারে বসে ছিলেন। জন্মদিন উপলক্ষে শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হয়েছে। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল আলফ্রেড জোডল। তিনি শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে নিয়ে বললেন, জার্মান জাতি তার শ্রেষ্ঠত্ব আবারো প্রমাণ করবে। অবশ্যই আমরা বার্লিন রক্ষা করব। হিটলার শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে নিয়মমাফিক গ্লাস ছুড়ে ফেললেন এবং বললেন, আজ কি অন্যদিনের চেয়ে বেশি গোলাবর্ষণ হচ্ছে?

ইভা ব্রাউন বললেন, যুদ্ধের আলাপ কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ থাকুক। আসুন আমরা আনন্দময় কোনোকিছু নিয়ে আলাপ করি।

কেউ কোনো জবাব দিল না। হিটলার ইভা ব্রাউনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, আমি তোমাকে বিয়ে করব।

ইভা ব্রাউন বললেন, হঠাৎ বিয়ের কথা আসছে কেন?

হিটলার বললেন, আমার ধারণা আমরা পরাজিত হতে যাচ্ছি। যদি সত্যি তাই ঘটে আমি আত্মসমর্পণ করব না। নিজেকে হত্যা করব। আমার মৃত্যুর পর ইতিহাসে লেখা হবে আমার একজন রক্ষিতা ছিল, তা আমি চাই না।

হিটলার দ্বিতীয় দফায় শ্যাম্পেন নিলেন। টোস্ট করলেন তার বান্ধবীর সঙ্গে। নরম গলায় বললেন, আমার সুখ এবং দুঃখের চিরসঙ্গী ইভা ব্রাউন।

হিটলার এবং ইভা ব্রাউন মাটির অনেক গভীরে বাঙ্কারে অবস্থান নিয়েছেন। আমাদের বান্ধবপুরের একজন (হাদিস উদ্দিন) বাঙ্কারের মতোই একটি জায়গায় বেশির ভাগ সময় কাটাচ্ছে। হরিচরণের মাটির নিচের গুপ্তঘর। যে ঘরে যাবার একটাই পথ, সিন্দুকের ভেতর দিয়ে। হাদিস উদ্দিনের গুপ্তঘরে সময় কাটানোর পেছনে কারণ আছে। সে নানান জিনিসপত্র গুপ্তঘরে রাখছে। এর মধ্যে রেশমি রুমালে মোড়া একান্নটা স্বর্ণমুদ্রাও আছে। হাদিস উদ্দিন যতবারই গুপ্তঘরে যায় স্বর্ণমুদ্রা গুনে দেখে। দুভাবে গুনে। প্রথমে এক থেকে একান্ন, তারপর শুরু হয় উল্টোদিকে গুনা। ৫১-৫০-৪৯-৪৮...

গুপ্তঘর সে ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখেছে। সেখানে পাটি বিছানো আছে। বালিশ আছে। কলসিভর্তি পানি আছে। মোমবাতি, দেয়াশলাই আছে। একটা টর্চও আছে। হাদিস উদ্দিন পাটিতে শুয়ে গুনগুন করে মাঝে মধ্যে গান গায়। গান তার নিজের রচনা। সুরও তার নিজের। বদ্ধঘরের কারণে গানের শব্দ দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসে। হাদিস উদ্দিনের বড় ভালো লাগে।

ভরদুপুর। গুপ্তঘর অন্ধকার। পাটিতে শুয়ে হাদিস উদ্দিন নিচুগলায় গান করছে—

ও আমার সোনার মোহররে
মোহররে মোহররে মোহররে
তোর মনে দুঃখ ? দুঃখ ? দুঃখ ?
আমার মনে সুখ।
ও আমার সোনার মোহররে
মোহররে মোহররে মোহররে...

হাদিস উদ্দিন 'মোহররে' বলে টান দিচ্ছে, দেয়ালে বাড়ি খেয়ে সেই শব্দ অনেকবার করে ফিরে আসছে। হাদিস উদ্দিনের মনে হচ্ছে ঘরভর্তি মানুষ একসঙ্গে 'মোহররে' বলে গান করছে।

এই সময় হঠাৎ করে বাচ্চামেয়ের হাসির শব্দের মতো শব্দ হলো। রিনরিনে গলায় কে যেন হাসল। হাদিস উদ্দিন শোয়া থেকে উঠে বসল। ঘর অন্ধকার, তবে সিন্দুকের খোলা ডালা দিয়ে কিছু আলো আসছে। গুপ্তঘরের ভেতরটা আবছা আবছা চোখে আসে। হাদিস উদ্দিনের রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। এটা সে কী দেখছে ? ঘরের এক কোণে দেয়ালের দিকে মুখ করে দশ বছরের বাচ্চা একটা মেয়ে বসে আছে। নিজের মনে খেলছে। এমন কি হতে পারে কোনো বিচিত্র উপায়ে মীরা নেমে এসেছে ? না, তা কখনোই না। মেয়েটা মীরার চেয়ে অনেক বড়।

হাদিস উদ্দিন বিড়বিড় করে বলল, আল্লাহপাক রক্ষা কর। তুমি গরিব বান্দাকে রক্ষা কর। ইয়া রহমানু ইয়া রহিমু ইয়া মালিকু। হাদিস উদ্দিন চোখ বন্ধ করল। চোখ বন্ধ করেই মনে হলো বিরাট বোকামি হয়েছে। তার মৃত্যু হবে চোখবন্ধ অবস্থায়। সে যে মারা গেছে এই খবরটাও কেউ পাবে না। কে আসবে গুপ্তঘরে খোঁজ নিতে ? হাদিস উদ্দিন চোখ মেলল। মেয়েটা এখনো আছে, তবে সে দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে। হাদিস উদ্দিন মেয়েটাকে মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। গোল মুখ, কোঁকড়া চুল। খাড়া নাক। চোখ জ্বলজ্বল করছে।

হাদিস উদ্দিন বলল, এই। এই।

মেয়েটা ফিরেও তাকাল না। হাতে কী নিয়ে যেন খেলছে। সুতার মতো কিছু। মেয়েটার হাতে কয়েক গোছা করে চুড়িও আছে। চুড়ির শব্দ হচ্ছে।

হাদিস উদ্দিন দেয়াশলাই হাতে নিল। কাঁপা কাঁপা হাতে দেয়াশলাই জ্বালাল। মোমবাতি ধরাল। এখন আর মেয়েটা নেই। তবে সুতাগুলি আছে। লাল নীল কিছু সুতা। হাদিস উদ্দিন গুপ্তঘর থেকে উঠে এলো। কানে ধরে প্রতিজ্ঞা করল, জীবনে কখনো গুপ্তঘরে নামবে না। বিনা কারণে প্রাণ দিয়ে লাভ কী ?

আতরের শ্বশুরবাড়িতে ভূত হাম্বর খুব যন্ত্রণা করছে। গত অমাবশ্যায় তাকে দেয়া গজার মাছ সে খায় নি। বাঁশঝাড় উলটপালট করে এক কাণ্ড করেছে। তার সমস্যা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সে পুকুরে ঢিল মারছে। টিনের চালে ঢিল মারছে। ছোটখাটো ঢিল না। চষাক্ষেত থেকে তুলে আনা মাটির বড় বড় চাঙ্গড়। গভীর রাতে ছোট বাচ্চাদের মতো ওয়াও ওয়াও কান্নার শব্দ করছে।

আমিনা বেগম বললেন, ঘটনা বুঝেছি।

আতর ভীত গলায় বলল, কী বুঝেছেন?

তোমার সন্তান হবে। এই কারণে হাম্বরের মিজাজ খারাপ। এখন তুমি আমাকে বলো, সন্তান কি হবে?

আতর মাথা নিচু করে থাকল, কিছু বলল না।

আমিনা বেগম বিরক্ত হয়ে বললেন, এত বড় ঘটনা আমারে তুমি জানাবা না? শাহনেয়াজ জানে?

না।

আমিনা বেগম বললেন, হাম্বর যে ভাব ধরেছে তোমারে এখানে রাখা বিপদজনক। তোমারে বাপের বাড়ি পাঠায়া দিতেছি। সন্তানের চল্লিশ দিন না হওয়া পর্যন্ত বাপের বাড়িতে থাকবা। তারপর আসবা।

আতর বলল, আমি এইখানে থাকব। কোনোখানে যাব না।

বৌমা, তুমি তো কোনো বিবেচনার কথা বললা না।

আতর বলল, আমি এইখানেই থাকব। বাপের বাড়িতে যাব না। হাম্বর যদি আমারে মেরেও ফেলে আমি যাব না।

আমিনা বেগম বিরাট দুশ্চিন্তায় পড়লেন। বাড়িবন্ধন নতুন করে দিলেন। হামিদাকে কঠিন নির্দেশ দিলেন— সব সময় আতরের হাত বা শাড়ির অংশ ধরে থাকতে হবে। আতর যখন গোসলখানায় যাবে বা বাথরুমে যাবে তখনো এই অবস্থা। রাতে তার ঘুমানোর ব্যবস্থা হয়েছে আমিনা বেগমের সঙ্গে। তিনি ছেলের বৌকে নিয়ে খাটে শুচ্ছেন। মেঝেতে ঘুমাচ্ছে দু'জন দাসী। ঘরের চারকোনায় সারারাত চারটা হারিকেন জ্বলে। খাটের নিচে মাটির সরায় থাকে কয়লার আগুন।

নতুন জীবনযাপন আতরের ভালো লাগছে। কী অদ্ভুত অনুভূতি! তার শরীরের ভেতর একজন কেউ বড় হচ্ছে। একদিন সে পৃথিবীর আলো দেখবে। আতরকে ডাকবে 'মা'। হামাগুড়ি দিয়ে একা একা বারান্দা থেকে উঠানে নেমে যাবে। উঠানে শুকাতে দেয়া ধান মুখে দিয়ে কাঁদবে। আতর তাকে কোলে নিয়ে বলবে, 'আমার বাবা গরু। আমার বাবা ধান খাওয়া গরু।'

আতরের পেটের সন্তান ছেলে না মেয়ে জানার জন্যে আমিনা বেগম গণক আনিয়েছেন। শ্রীপুরের বিখ্যাত গণক কাশেম মিয়া। এই গণকের গনা অভ্রান্ত। তিনি কাঁঠাল পাতা দিয়ে গনা গুনেন। একটা কাঁঠাল পাতায় খেজুর কাঁটা দিয়ে ছেলে লিখে কাঁসার বদনায় রাখা হয়। তুলারাশির দুইজন তর্জনী দিয়ে বদনার কানা শূন্যে তুলে ধরেন। কাশেম মিয়া মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে যদি বদনা আপনা আপনি ঘুরতে থাকে তাহলে ছেলে। আর বদনা যদি স্থির থাকে তাহলে মেয়ে। তিনবার পরীক্ষা হলো। তিনবারই পাওয়া গেল মেয়ে। আমিনা বেগম হতাশ গলায় বললেন, হায় হায়, কী সর্বনাশ!

আতরের শ্বশুর আব্দুল গনি সাহেবের মনটাও খুব খারাপ হয়েছে। তারপরেও তিনি মনের দুঃখ চাপতে চাপতে বলেছেন, সংসারে প্রথম সন্তান কন্যা হওয়া ভাগ্যের কথা। রসুলে করিম নিজে বলেছেন।

গণক কাশেম মিয়ার ভাগ্য খারাপ। গণনায় মেয়ে পাওয়া গেলে বখশিশ তেমন পাওয়া যায় না। দুঃসংবাদ দেবার পর আবার বখশিশ কী ? মেয়ে আসা মানে তো দুঃসংবাদই।

শুধু কবি শাহনেয়াজকে 'মেয়ে আসছে' সংবাদে অত্যন্ত উৎফুল্ল মনে হলো। ছেলেদের সুন্দর নাম নাই বললেই হয়। সেই তুলনায় মেয়েদের কত বাহারি নাম আছে! মেয়ের নাম দিয়ে অন্তমিল দেবার শব্দও অনেক থাকে। কবি শাহনেয়াজ দুইনম্বরি এক হাতিমার্কা খাতায় মেয়েদের নাম লেখা শুরু করেছে।

আঁখি

নাম সুন্দর। তবে চন্দ্রবিন্দু খারাপ লাগছে। চন্দ্রবিন্দু বাদ দিয়ে 'নয়না' রাখা যেতে পারে। নয়ন থেকে নয়না। আবার নয়নতারাও খারাপ না। ডাবল অর্থ। চোখের মণি এবং নয়নতারা ফুল। এক থেকে দশের ভেতর নম্বর দেয়া হলে যা দাঁড়ায়।

আঁখি ৫

নয়না ৬

নয়নতারা ৭

ধবলিমা

কন্যার গাত্রবর্ণ যদি ধবল হয় তাহলে এই নাম সুন্দর। ধবলিমার বদলে সিতিমা দেয়া যেতে পারে। সিতিমা'র অর্থ

ধবল। দ্বৈত অর্থবাহক আরেকটি নাম আছে। সফেদা। একই সঙ্গে শুভ্র এবং ফল। এক থেকে দশের ভেতরে নম্বর নিম্নরূপ

ধবলিমা ৭

সিতিমা ৫

সফেদা ৬

[কবি শাহনেয়াজের সত্যি সত্যি একটা কন্যাসন্তান হয়। কবি নামের খাতা নিয়ে কন্যার সামনে উপস্থিত হবার পর আব্দুল গনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন, নামের খাতা নিয়া দূর হ। আমি এর নাম দিলাম তোজল্লী খানম। শাহনেয়াজকে মাথা নিচু করে তাই মেনে নিতে হয়।]

আব্দুল গনি তাঁর বাড়ি হাম্বরমুক্ত রাখার জন্যে একজন পাশ করা ভালো মাওলানা লজিং মাস্টার হিসাবে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাওলানা চব্বিশ ঘণ্টা এই বাড়িতেই থাকবেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত আজান দিয়ে নামাজ পড়বেন। ভূতপ্রেতরা না-কি আজানের শব্দকে অত্যন্ত ভয় পায়। মাওলানা পাওয়া যাচ্ছে না।

ধনু শেখের নতুন করে বানিয়ে দেয়া জামে মসজিদে আজ অনেকদিন পর আছরের আজান হলো। আজান দিলেন নতুন ইমাম নিয়ামত হোসেন। নিয়ামত হোসেন ধনু শেখের লঞ্চ কোম্পানির টিকেট মাস্টার। তার পড়াশোনা মাদ্রাসা লাইনে। উলা পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পাশ করতে পারেন নি। টিকেট মাস্টারের দায়িত্বের অতিরিক্ত মসজিদের ইমামতির দায়িত্বও তিনি পালন করবেন। নিয়ামত হোসেন মহিষের মতো বলশালী একজন মানুষ। হুঙ্কার দিয়ে কথা বলেন। তবে ক্বারী হিসাবে ভালো।

প্রথম দিনেই নামাজের শেষে বেহেশতের বর্ণনা দিয়ে তিনি সবার চিত্ত চাঞ্চল্য তৈরি করলেন।

> ফল ফ্রুট খেতে চান? বেহেশতের ফল ফ্রুটের কেরামত শুনবেন? তাহলে শুনেন, বেহেশতের বেদানার একটা দানা মুখে দিবেন, সত্তুর বছর লাগবে তার রস খেয়ে শেষ করতে...।

ইমাম করিম প্রথম দিনের নামাজে সামিল হতে এসেছিল। তাকে মসজিদে ঢুকতে দেয়া হয় নি। তার গা দিয়ে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। সারা শরীর নোংরায় মাখামাখি। লুঙ্গি বারবার খুলে পড়ে যাচ্ছে।

ইমাম করিম হুঙ্কার দিয়ে বলেছে, নামাজ পড়তে দেয় না কোন বান্দির পুত! আমি কিন্তু মসজিদ জ্বালায়ে দিব। খুন খারাবি করব। আমি পাগল মানুষ। খুন খারাবি করলে আমার কিছু হবে না।

ইমাম করিমকে দূরের কোনো গঞ্জে ফেলে আসা হবে— এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তার পাগলামি যেভাবে বাড়ছে তাতে এর কোনো বিকল্প নাই। বান্ধবপুরের বেশ কিছু মানুষকে সে হয় মেরেছে নয় তাড়া করে পুকুরে ফেলেছে। একদিন বের হয়েছিল রামদা নিয়ে। এমন বিপদজনক পাগল গ্রামে রাখা ঠিক না।

আগামী হাটবারে ইমাম করিমকে লঞ্চে করে নিয়ে যাওয়া হবে। কোনো এক লঞ্চঘাটে নামিয়ে দেয়া হবে এরকম ঠিক হয়েছে। ইমাম করিম ব্যাপারটা জানে। তার যে খুব আপত্তি তাও না। সে মোটামুটি আনুষ্ঠানিকভাবে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিয়েছে। একদিন গেল লাবুসের কাছে। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি বয়সে আমার ছোট। যদি বয়সে ছোট না হইতা আমি পায়ে ধরে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতাম। বিরাট অপরাধ করেছি। তোমারে খুন করার জন্যে লোক ঠিক করেছিলাম। ওই হারামজাদা কাজটা করে নাই। হারামজাদা যদি কাজটা করত আমার এই দশা হয় না। আমি স্ত্রী নিয়া সুখে থাকতাম। কেন সুখে থাকতাম বুঝায়ে বলব?

লাবুস বলল, বলুন।

ইমাম করিম বলল, একশ' টাকার মামলা। তোমারে খুন করলে একশ' টাকা ওই হারামজাদা নিত। আমার স্ত্রীর হাতে টাকা পড়ত না। ঝগড়া ফ্যাসাদের কারণে তালাক হইত না। বুঝেছ?

লাবুস চুপ করে রইল। করিম বলল, তুমি কি আমাকে ক্ষমা দিয়েছ?

লাবুস বলল, জি দিয়েছি।

এরা বুধবারে আমাকে লঞ্চে করে নিয়ে যাবে। কোনোখানে ছেড়ে দিয়ে আসবে। আধা ন্যাংটা তো যেতে পারি না। বলো যেতে পারি কি-না?

এইভাবে যাওয়া ঠিক হবে না।

আমাকে নতুন পায়জামা পাঞ্জাবি কিনে দেওয়া কি তোমার পক্ষে সম্ভব?

সম্ভব।

সুন্দর একটা ফেজ টুপি কিনে দিও।

আচ্ছা দেব।

একজোড়া কাবলি স্যান্ডেল।

আপনি যা চাচ্ছেন সবই দিব।

তুমি লোক অত্যন্ত ভালো। আগে বুঝতে পারি নাই। না বুঝে ভুল করেছি।

লাবুস বলল, আমরা সবাই ভুল করি। না বুঝে করি, বুঝে করি।

ইমাম বলল, ভুলের জন্যে তওবা করলে আমি ক্ষমা পাব। কিন্তু তওবা করব না।

লাবুস বলল, কেন তওবা করবেন না ?

ইমাম বলল, আমি ভুলের শাস্তি পেতে চাই।

অনেক শাস্তি তো পেয়েছেন। আর কত ?

ইমাম বলল, আরো অনেক বাকি আছে। আচ্ছা লাবুস, আমার আরেকটা আবদার আছে। বলব ?

বলুন।

আমি যাব বুধবারে। লঞ্চ ছাড়বে তিনটায়। দুপুরে তোমার এখানে ভাত খাওয়া কি সম্ভব ? খাওয়াদাওয়া করে লঞ্চে উঠলাম। পরে খাওয়া আর জুটে কি-না কে জানে। খাওয়াবা ভাত ?

লাবুস বলল, অবশ্যই খাবেন।

করিম বলল, পাবদা মাছের সালুন দিয়া ভাত খাওয়ার ইচ্ছা। শরিফা একবার রেঁধেছিল। স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। ভাটি অঞ্চলের পাবদা মাছ।

লাবুস বলল, ভাটি অঞ্চলের বড় পাবদা মাছ আমি জোগাড় করব।

করিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, লাবুস, তোমার অনেক মেহেরবানি।

রঙিলা বাড়িতে শরিফা একটি চিঠি পেয়েছে। চিঠি নিয়ে এসেছে লাবুসের লোক। চিঠিতে লেখা—

> মা,
>
> আমি আপনার এক সন্তান লাবুস। আমার খুবই ইচ্ছা বুধবার দুপুরে আপনার হাতে রান্না পাবদা মাছ খাই। এটা কি সম্ভব যে আপনি আমার বাড়িতে এসে রান্না করবেন ?
>
> ইতি
>
> আপনার পুত্র
>
> লাবুস।

বুধবার দুপুরে ইমাম করিম একা খেতে বসেছেন। মাওলানা ইদরিস কী কারণে যেন রোজা রেখেছেন। লাবুস একবেলা খায়। আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা এক মহিলা করিমের পাতে খাবার তুলে দিচ্ছেন। করিমের গায়ে নতুন পায়জামা-

পাঞ্জাবি। মাথায় ফেজ টুপি। করিম নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছে। একবার শুধু বলল, রান্না ভালো হয়েছে। আল্লাহ্‌পাকের দরবারে সুখাদ্যের জন্যে শুকরিয়া। বোরকা পরা মহিলা কিছুই বললেন না।

লঞ্চঘাটে করিমকে বিদায় দিতে অনেকেই এসেছে। পালকিতে করে বোরকাপরা সেই মহিলাও এসেছেন। যে দু'জন করিমকে নিয়ে যাবে, অচেনা ঘাটে ছেড়ে দিয়ে আসবে, করিম তাদেরকে বিনয়ের সঙ্গে বলল, আপনাদের যেতে হবে না। আমি দূরের কোনো ঘাটে নেমে যাব। ফিরে আসব না। আপনাদের অনেক ত্যক্ত করেছি। আর করব না। আমি সবার কাছে ক্ষমা চাই।

করিমের সঙ্গের চরনদার দু'জন নেমে গেল। লঞ্চ ছাড়ার ঠিক আগে আগে পালকি থেকে বোরকাপরা মহিলা নেমে সিঁড়ি বেয়ে লঞ্চে উঠে গেল এবং দাঁড়াল ইমাম করিমের পাশে।

ইমাম করিম বললেন, ভালো আছ শরিফা?

শরিফা জবাব দিল না। সে মুখ থেকে বোরকার ঢাকনা তুলে দিয়েছে। শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে বান্ধবপুরের রঙিলা বাড়ি। আর কোনোদিন সে এখানে ফিরবে না।

অনেক রাতে আতরকে ঘুম থেকে তোলা হয়েছে। তার কাছে দু'জন মেহমান এসেছে। মেহমান দু'জনকে কেউ চিনতে পারছে না। একজন মাওলানা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন। আতর মেহমানদের দেখে হতভম্ব। ইমাম করিম এবং শরিফা।

আতর বলল, নতুন মা। তুমি?

শরিফা বলল, মাগো, আমার কোথাও যাবার জায়গা নাই। আজ রাতটা কি তুমি আমাদের থাকতে দিবা?

আতর কিছু না বলে ছুটে গেল তার স্বামীর কাছে। হড়বড় করে বলল, আমার এক দুঃখী মা এসেছেন। আপনি তাকে সমাদর করে এই বাড়িতে তুলবেন— এটা আমার অনুরোধ। শাহনেয়াজ সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলো। শরিফাকে কদমবুসি করে বলল, মাগো! আমি আপনার এক অধম পুত্র। মা, অতি আশ্চর্য যোগাযোগ। এই মুহূর্তে পয়ারছন্দে একটা কবিতা লিখছিলাম। কবিতার নাম 'মাগো'। আপনি আপনার অধম কবিপুত্রের বাড়িতে বাকিজীবন থাকবেন এটা আমার আবদার।

[অপদার্থ কবি শাহনেয়াজ শরিফাকে বাকিজীবন অতি আদরে নিজের বাড়িতে রেখেছে। প্রতিবার খাবার সময় নিজে উপস্থিত থেকেছে। অতি আদরে অতি যত্নে নিজে খাবার তুলে দিয়েছে। হঠাৎ করে এই মহিলার প্রতি শাহনেয়াজের এত ভক্তির কারণ স্পষ্ট না। জগৎ রহস্যময়। প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে।]

ইমাম করিম আতরের বাড়িতে সংসার শুরু করলেন। তাঁর প্রধান কাজ হলো, আজান দিয়ে ভূত হাম্বরকে দূরে রাখা। তাঁর মাথা কখনোই পুরোপুরি সারে না। প্রায়ই দেখা যায় তিনি বাড়িকে ঘিরে অতি ব্যস্ত ভঙ্গিতে চক্কর দিচ্ছেন। আতরের শ্বশুরবাড়ির সবার ধারণা, ভূত হাম্বরের কারণে ভালোমানুষ ইমাম সাহেবের এই সমস্যা হচ্ছে। হাম্বর কোনো সহজ জিনিস না। তবে ইমাম করিমও সহজ পাত্র না। বলা যায়, সমানে সমান। ইমামের আসার পর হাম্বরের উপদ্রব কিছু কমেছে। টিনের চালে তার হাঁটাহাঁটি বন্ধ হয়েছে বলেই মনে হয়।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ ঘাটশিলা থেকে বান্ধবপুর উপস্থিত হলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল বান্ধবপুরের তিনবটের মাথা পানির সময় দেখতে হয়। পানিতে অঞ্চল ডুবে যায়, বটের মাথা বের হয়ে থাকে। পাখিদের মেলা বসে। সবই হরিয়াল পাখি।

লঞ্চঘাটে নেমে বিভূতি বাবু ভালো ঝামেলায় পড়লেন। যার কাছে তিনি যাবেন কেউ তাকে চেনে না। নামও আগে কখনো শোনে নি। যাকে জিজ্ঞাস করেন সে-ই বলে ইন্নাস নামে কেউ এই অঞ্চলে থাকে না। মাওলানা ইদরিস নাম তিনি ভুলে গেছেন।

ইন্নাস করেন কী ?

কী করেন জানি না। কলিকাতা গিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য। তিনি যমুনার আত্মীয়। যমুনা রায়।

মুসলমান ইন্নাস, হিন্দুর আত্মীয় ? এইসব কী বলেন ? উনার চেহারা কেমন ?

বিভূতি বাবু চেহারার যথাসাধ্য বর্ণনা দিলেন। কেউ কিছু বুঝতে পারল না। তবে তিনবটের মাথা নামের একটা জায়গা আছে। দূরদেশ থেকে একজন শুধুমাত্র তিনবটের মাথা দেখতে এসেছে— এটাও কারো হিসাবে মিলছে না।

আপনি আসছেন তিনবটের মাথা দেখতে ?

হুঁ।

আর কিছু না ? শুধু বটগাছ দেখবেন ?

এর বাইরেও দেখার মতো কিছু থাকলে দেখব। শুনেছি বড় জঙ্গল আছে। বনজঙ্গল দেখতে আমার ভালো লাগে।

বর্ষাকালে বনজঙ্গল কী দেখবেন ? সাপে কাটব। জোঁকে ধরবে।

বনের ভেতর দিয়ে শুনেছি একটা বড় খাল গিয়েছে। নৌকা নিয়ে খালের ভেতর ঘুরব। খাল আছে না ?

আছে। খাল আছে। নৌকাও আছে।

তাহলে সমস্যা কী ?

সমস্যা কিছু নাই।

বিভূতিভূষণ বললেন, ইন্নাস সাহেবের খোঁজটা শুধু যদি বের করতে পারি।

এই নামে কেউ আমাদের অঞ্চলে নাই। কোনোদিন ছিলও না। আপনারে কেউ ধোঁকা দিয়েছে।

উনি ধোঁকা দেয়ার মানুষ না। সুফি মানুষ। দরবেশ।

আমাদের অঞ্চলে কোনো পীর দরবেশও নাই। সবই সাধারণ।

বিভূতি বাবু কী করবেন বুঝতে পারলেন না। লঞ্চে কোনো খাবারের ব্যবস্থা ছিল না। ক্ষুর্ধাত অবস্থায় নেমেছেন। সেই ক্ষুধা চরমে পৌঁছেছে। বান্ধবপুরে ভাতের হোটেল আছে, তবে হোটেলগুলি খোলে দুই হাটের দিনে। আজ হাটবার না। মুদির দোকান থেকে চিড়া এবং পাটালি গুড় কিনে খেলেন। লঞ্চে করে ফেরত যাবেন সেই উপায় নেই। ফিরতি লঞ্চ পরদিন দুপুরে। তাছাড়া এতদূর এসে তিনবটের মাথা না দেখে ফেরত যাবার অর্থ হয় না। রাত কাটাবার জন্যে একটা আশ্রয় দরকার। ধর্মশালা জাতীয় কিছু আছে কি-না খোঁজ করতে হবে। থাকার কথা না। বান্ধবপুর সম্পন্ন অঞ্চল না। অনেক খুঁজে পেতে একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল, সেখানে গুড়ের লাল চা ভাঁড়ে করে বিক্রি করে।

চায়ের দোকানির পরামর্শে বিভূতি বাবু ধনু শেখের বাংলাঘরে উপস্থিত হলেন। ধনু শেখকে তাঁর সমস্যার কথা বললেন। ধনু শেখ বিরক্ত হয়ে বললেন, নাম ঠিকানা ছাড়া চলে আসছেন ? আপনি তো বিরাট 'বুরবাক'। করেন কী ?

শিক্ষকতা করি। স্কুল মাস্টার।

বুরবাকের মতো বুদ্ধি শিক্ষকদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

রাতটা কাটাবার মতো একটা জায়গা পাওয়া গেলে বাধিত হতাম।

ধনু শেখ বললেন, রঙিলা বাড়িতে চলে যান। আরামে থাকবেন, সেবা পাবেন। সেবার প্রয়োজন সকলের। আমার এখানে রাখতে পারতাম, তা সম্ভব না। আমার কুষ্ঠ রোগ হয়েছে। কুষ্ঠ রোগীর বাড়িতে থাকা ঠিক না। এখন বিদায় হন।

বিভূতি বাবু শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা করলেন। রাত কাটাবেন নৌকায়। নৌকার মাঝি চাল ফুটিয়ে ভাত রেঁধে দিবে। নদীর ওপর ডাল দিয়ে ভাত খেতে ভালো লাগবে।

এই নৌকা নিয়ে তিনি বিকালের মধ্যেই খালে ঢুকলেন। খাল দিয়ে নৌকা যাবে, তিনি বনভূমির সৌন্দর্য দেখবেন। তার মতে বঙ্গদেশের প্রতিটি বনভূমির চরিত্র এক হলেও প্রতিটির আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্য ধরতে পারার মধ্যে

আনন্দ আছে। নৌকার মাঝির নাম হাশেম। হাশেম তার আরোহীর কর্মকাণ্ডে অবাক হচ্ছে। কোনো কাজ ছাড়া একটা লোক খালে খালে ঘুরছে। বনজঙ্গল দেখার কী আছে? লোকটার হাতে খাতা-কলম। সে মাঝে-মাঝে নৌকা থামাতে বলে। নৌকা থামলেই গুট গুট করে কী যেন লেখে।

ঔপন্যাসিক লিখছিলেন—

> বাতাবি লেবুর ফুল নয়, ঘেঁটুফুল নয়, আম্রমুকুল নয়, কামিনী ফুল নয়, রক্তপলাশ বা শিমুল নয়, কী একটা নামগোত্রহীন রূপহীন নগণ্য জংলি কাঁটা গাছের ফুল। আমার কাছে কিন্তু তাহাই কাননভরা বনভরা বসন্তের কুসুমরাজির প্রতীক হইয়া দেখা দিল। ...

আপনার নাম কি বিভূতিভূষণ?

বিভূতি বাবু চমকে তাকালেন। খালের পাড়ে অতি রূপবান এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাঁর মনে এক ধরনের ভ্রান্তি উপস্থিত হলো। মনে হলো বনের দেবতা হঠাৎ দেখা দিয়েছেন। হঠাৎ করে একজন কেউ 'আপনার নাম কি বিভূতিভূষণ' বলে জঙ্গলে উদয় হওয়ার মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে।

আজ্ঞে আমি বিভূতিভূষণ।

আমার নাম লাবুস, আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

বিভূতি বাবু অবাক হয়ে বললেন, আপনি কীভাবে জানেন যে আমি খালের ভেতর নৌকা করে যাচ্ছি?

লাবুস বলল, আমি আপনাকে পেয়েছি এটাই বড় কথা। কীভাবে পেয়েছি এটা বড় কথা না।

লাবুস নৌকায় উঠে এলো। বিভূতিভূষণ বললেন, আপনি কি আমার কোনো রচনা পড়েছেন?

লাবুস বলল, না। এখানে আমরা বইপত্র পাই না। হরিচরণ বাবু *প্রবাসী* পত্রিকা রাখতেন। সেখানে আপনার উপন্যাসের ছোট্ট একটা অংশ পড়েছি।

নাম মনে আছে?

না। শুনেছি আপনি সুখাদ্য পছন্দ করেন। রাতে কী খেতে চান?

যা খেতে চাইব তাই খাওয়াবেন?

অবশ্যই।

বনমোরগের ঝোল খাওয়াতে পারবেন?

না।

মহাশোল মাছ। দোপেয়াজির মতো রান্না।

এটাও পারব না। মহাশোল পাহাড়ি মাছ, এখানে পাওয়া যায় না।

বকফুলের বড়া খাওয়াতে পারবেন ?

পারব। আমার বাড়িতেই বকফুল গাছ। প্রচুর ফুল ফুটেছে।

সজনের গাছ আছে ?

আছে।

সজনের ঝোল করতে বলবেন। আমার পছন্দের জিনিস।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিভূতি বাবু খাতা-কলম নিয়ে নৌকার ছইয়ের ভেতরে চলে গেছেন। লাবুস বাইরে আছে। বৃষ্টিতে ভিজছে। তাকে দেখাচ্ছে মূর্তির মতো। তার দৃষ্টি খালের পানির স্রোতের দিকে। একঝাঁক বক হঠাৎ তার মাথার ওপর দিয়ে কক কক শব্দ করে উড়ে গেল। অন্য যে-কেউ চমকে বকগুলির দিকে তাকাতো। লাবুস তাকালো না।

লাবুসের বাড়িতে যে আদর এবং যত্ন লেখকের জন্যে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। রাতের খাবারের বিপুল আয়োজন। যেখানে তিনি খেতে বসেছেন তার কাছেই তোলা উনুন আনা হয়েছে। সেখানে তেল ফুটছে। বেসনে ডুবিয়ে বকফুল ভেজে লেখকের পাতে দেয়া হচ্ছে। বাটির পর বাটি আসছে। বিভূতি বাবু বললেন, আমার মতো অভাজনের জন্যে এত আয়োজন!

মাওলানা ইদরিস বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহপাকের জন্যে। তিনি আপনার রিজিকের এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

বিভূতি বাবু বললেন, রেঁধেছে কে ?

হাদিস উদ্দিন বলল, আমি রান্না করেছি জনাব।

বিভূতি বাবু বললেন, তোমার দু'টা হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা দরকার। আমার একটা উপন্যাসের নাম 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'। সেই হোটেলের পাচক বামুন হাজারির চেয়েও তোমার রান্না ভালো।

হাদিস উদ্দিনের চোখে সঙ্গে সঙ্গে পানি এসে গেল। সে তার জীবনে রান্নার এরকম প্রশংসা শোনে নি। ছোটকর্তা লাবুস এমন মানুষ যাকে লবণ ছাড়া তরকারি রেঁধে দিলেও হাসিমুখে খেয়ে উঠবে, কিছু বলবে না। মাওলানা ইদরিসেরও একই অবস্থা, বেগুনপোড়া চটকে দিলে তাই মুখে নিয়ে বলবে—শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

শ্রাবণ মাসের ঝুম বৃষ্টি নেমেছে। বিভূতি বাবু পান মুখে দিয়ে বিছানায় শুতে গিয়েছেন। হাদিস উদ্দিন হুক্কা নিয়ে গেছে। তিনি হুক্কায় টান দিচ্ছেন। হাদিস উদ্দিন বলল, জনাব! আপনার পায়ে একটু তেল দিয়ে দেই ? পরিশ্রম করে এসেছেন। আরাম পাবেন।

বিভূতি বাবু বললেন, দাও। সেবা যখন নিচ্ছি ভালোমতোই নেই।

সকালে আপনাকে ছিটা পিঠা খাওয়াব। হাঁসের মাংস আর ছিটা পিঠা।

আচ্ছা।

হাঁসের মাংস দিয়ে ছিটা পিঠা খাওয়ার পরে আপনি বলবেন, হাদিস উদ্দিনের শুধু হাত না, তার পাও দু'টাও সোনা দিয়া বান্ধায়া দাও। আচ্ছা জনাব, হাজারি বলে বাবুর্চির কথা বললেন, তার দেশের বাড়ি কই?

ওটা কল্পনার এক চরিত্র। এরকম কেউ নেই।

বিভূতি বাবু হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, একটা মেয়ে দেখলাম, কোঁকড়া চুল, গোল মুখ, মেয়েটা কে? দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখছিল। আমি তাকাতেই চট করে সরে গেল।

হাদিস উদ্দিন কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, চোখে ধান্ধা দেখছেন। এই রকম মেয়ে কেউ নাই।

আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম।

হাদিস উদ্দিন বলল, আমিও আপনার মতো ধান্ধা দেখি। ছোটকর্তারে নিয়া একটা ধান্ধা দেখি।

কী দেখ?

পুসকুনির পাড়ে উনি যখন বইসা থাকেন তখন দেখি একজন না, মানুষ দুইজন।

একই মানুষ দু'জন?

জে। পেট গরম থাকলে মানুষ ধান্ধা দেখে। মনে হয় আমার পেট গরম ছিল।

শেষরাতে বৃষ্টি থেমে গেল। মেঘ কেটে চাঁদ ভেসে উঠল। বৃষ্টিধোয়া অপূর্ব জোছনা। বিভূতি বাবুর ঘুম ভেঙেছে। তিনি জোছনা দেখার জন্যে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলেন, পুকুরের শ্বেতপাথরের ঘাটে দু'জন লাবুস বসে আছে। দু'জনই তাকিয়ে আছে দূরের বনভূমির দিকে।

একদিন থাকার জন্যে এসে তিনদিন থাকলেন। তিনবটের মাথা দেখে খুব আনন্দ পেলেন। কয়েকবার বললেন, আহারে, কী দৃশ্য! এই বলেই ভগবতগীতার একটা শ্লোক আবৃত্তি করলেন—

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি
> ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
> অজো নিত্যঃ শ্বাশতোহায়ং পুরানো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

মাওলানা ইদরিসের ছবি আঁকা কর্মকাণ্ডেও বিস্মিত হলেন। কী অনায়াসে কী সুন্দর ছবিই না বৃদ্ধ মানুষটা আঁকছে! ছবি নিয়ে তাঁর লজ্জারও সীমা নেই। তাঁর ধারণা তিনি বিরাট পাপ করছেন। বিভূতি বাবু অনেক চেষ্টা করলেন অদ্ভুত এই মানুষটার ভুল ভাঙাতে। লাভ হলো না। ঘাটশিলায় ফিরে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখলেন লাবুসকে।

পো. অ. গোপালনগর
গ্রাম : বারাকপুর
যশোহর।

প্রীতিভাজনেষু

নমস্কার। অতিব আনন্দ নিয়ে আপনার অতিথি হয়েছিলাম। যদিও নিজেকে কখনো অতিথি মনে হয় নাই। তিনবটের মাথা দেখে তৃপ্তি পেয়েছি। মাঝে মাঝে অতি সাধারণ দৃশ্য অজ্ঞাত কারণে অসাধারণ মনে হয়। তিনবটের মাথা সেরকম একটি স্থান। কলকাকলিতে মুখরিত পাখির ঝাঁক এক বটগাছ থেকে আরেক বটগাছে উড়াউড়ি করছে, এই দৃশ্য এখনো চোখে ভাসছে।

আমি আপনাকে আমার একটি উপন্যাস পাঠালাম। নাম 'দৃষ্টি প্রদীপ'। উপন্যাসটি পড়লে আনন্দ পাবেন। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের নাম জিতু। সে অদৃশ্য দৃশ্য দেখে। মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়। আমার কেন জানি মনে হয় আপনি জিতুর মতো একজন।

আরেকটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। আমার ধারণা আপনার বাড়িতে একটি বিদেহী শিশুকন্যার উপস্থিতি আছে। অতৃপ্ত আত্মারা প্রায়ই পৃথিবীর মায়ায় আটকে যায়। তাদের জন্যে বিষয়টি কষ্টের। আপনি কিশোরী মেয়েটির মুক্তির ব্যবস্থা করবেন এই আশা করছি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ইতি
শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতি বাবুর চিঠির তারিখ ৬ আগস্ট ১৯৪৫ সন। ওই দিনে জাপানের হিরোশিমা শহরে একটা বোমা পড়ে। বোমাটির নাম 'লিটল বয়'। পৃথিবীতে প্রথম আণবিক

বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। ষাট হাজার মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে। কয়েক ঘণ্টা পর মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার।

যে বিমানটি আণবিক বোমা নিয়ে যাচ্ছিল তার নাম এনোলা গে। বৈমানিকের নাম পল টিবেটিস। পল টিবেটিসের মায়ের নামেই বিমানটির নাম রাখা হয়েছিল মাত্র একদিন আগে, ৫ আগস্ট ১৯৪৫।

বোমা বিস্ফোরিত হবার পর পল টিবেটিস পেছনে ফিরে দেখলেন, ভয়াবহ এবং ভয়ঙ্কর এক ব্যাঙের ছাতা আকাশের দিকে উঠছে। তিনি হতভম্ব গলায় বললেন, হায় ঈশ্বর, আমরা এটা কী করেছি!

আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর পর বহু দূরের একজন মানুষ, বান্ধবপুরের লাবুস অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোনোরকম কারণ ছাড়াই তার শরীর ঝলসে যায়। মাথার চুল পড়ে যায়। সে গোঙানির মতো শব্দ করতে থাকে।

মনে হচ্ছিল সেও আণবিক বোমায় ঝলসে যাওয়া মানুষদের একজন। সতীশ কবিরাজ তাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, বিনা কারণে শরীর পুড়ে গেছে। এটা কী বলেন?

লাবুস ক্ষীণ গলায় বলল, আগুনের একটা ঝলকানি দেখেছি, আর কিছু না।

সতীশ কবিরাজ বললেন, আগুন কই যে আগুনের ঝলকানি দেখবেন?

মাওলানা ইদরিসের ধারণা হয়, তার পাপে লাবুসের এই সমস্যা হয়েছে। তিনি একই বাড়িতে থেকে ছবির পর ছবি আঁকছেন, এরকম তো হবেই।

এক সন্ধ্যাবেলা তিনি তাঁর সব ছবি ছিঁড়ে ফেলে আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

স্থান বোম্বে (মুম্বাই) শহর। জায়গার নাম মালাবার হিল। রাজপ্রাসাদের মতো এক বাড়ি। আরব সাগরের তীরে আড়াই একর জমিতে অপূর্ব এই প্রাসাদের ডিজাইন করেছেন ব্রিটিশ স্থপতি ক্লদ ব্যাটনি। প্রাসাদটির মালিক মুসলিম লীগের সভাপতি মোহম্মদ আলি জিন্নাহ। এই প্রাসাদে আজ একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এসেছেন। তাঁর নাম মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধি। গান্ধিজির মুখ বিষণ্ন। মুসলিম লীগের ডাকে ডাইরেক্ট অ্যাকশান কর্মসূচি পালিত হয়েছে (১৬ জুলাই ১৯৪৬), দাঙ্গা শুরু হয়েছে। কোলকাতার দাঙ্গায় সাত হাজার মুসলমান এবং তিন হাজার হিন্দু নিহত হয়েছে। দাঙ্গা পুরো ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে।

তাঁরা দু'জন প্রাসাদের লবিতে বসেছেন। এখান থেকে আরব সাগরের ঢেউ দেখা যায়। গান্ধিজি সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাদেরকে কিছুক্ষণ আগে লেবু চা দেয়া হয়েছে। দু'জনের কেউ সেই চা স্পর্শ করেন নি। মোহম্মদ আলি জিন্নাহর হাতে সিগারেট। তিনি একের পর এক সিগারেট ধরিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সামনে দামি অ্যাসট্রে আছে, তারপরেও তিনি সিগারেটের ছাই ফেলছেন এইমাত্র আনা চায়ের কাপে। তাকে খুবই অস্থির লাগছে। লবিতে তাঁর কন্যা দিনা এসেছিল গান্ধিজিকে সালাম জানাতে। মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মেয়ের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলেছেন, এখন বিরক্ত করবে না। দিনা অপ্রস্তুত হয়ে দ্রুত চলে গেছে।

দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে ইংরেজিতে। গান্ধিজি স্বভাবসুলভ নরম স্বরে কথা বলছেন। মোহম্মদ আলি জিন্নাহ স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ স্বরে কথা বলছেন।

গান্ধিজির মুখ হাসিহাসি, কিন্তু জিন্নাহর মুখে হাসি নেই। তাদের কথাবার্তা নিম্নরূপ।

গান্ধিজি : আপনি কি চান যে আমাদের মাতৃভূমি ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যাক ?

জিন্নাহ : আমি যে এটা কখনো চাই নি এবং এখনো চাচ্ছি না তা আপনি জানেন। রাজনীতিবিদদের একটি অস্ত্র 'মিথ্যা'। আমি এই অস্ত্র ব্যবহার করি না।

গান্ধিজি : ডাইরেক্ট অ্যাকশান কি আমাদের সেই দিকে নিয়ে যাচ্ছে না ?

জিন্নাহ : হ্যাঁ যাচ্ছে। তার জন্যে দায়ী কংগ্রেস। আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলাম (লক্ষ্ণৌ চুক্তি) সেই চুক্তি থেকে কংগ্রেস কি সরে যায় নি ?

গান্ধিজি : (চুপ করে আছেন। দৃষ্টি সাগরের ঢেউয়ের দিকে)

জিন্নাহ : কংগ্রেস এখন কী করছে ? মুসলিম লীগকে একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে স্বীকার না করে খেলাফত আন্দোলনকে স্বীকার করছে।

গান্ধিজি : মাতৃভূমি ভাঙার দুঃখ আমি নিতে পারব না। আমি এবং আপনি কি এটা বন্ধ করতে পারি না ?

জিন্নাহ : না, পারেন না। পণ্ডিত নেহেরু কিন্তু এই ভাগাভাগি চাচ্ছেন।

গান্ধিজি : আপনি ভুল করছেন। ভারত বিভক্তি কারোই কাম্য নয়। নেহেরুর তো কখনোই না। *

---

* ভুল গান্ধিজি করেছিলেন। নেহেরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কংগ্রেসকে রাজি করান যেন ভারত দু'টি দেশে ভাগ হয়। ভারতের নতুন ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটন ভারত বিভক্তির পরিকল্পনা শুরু করেন। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় মৃত্যুর দিনরাত্রি।

বান্ধবপুর লঞ্চঘাটে এমএল আড়িয়াল খাঁ লঞ্চ ভিড়েছে। ছয়জন যাত্রী ডেকে চাদর বিছিয়ে তাস খেলতে খেলতে আসছিল। তাদের তাসখেলা শেষ হয় নি। লঞ্চ ভিড়ার অনেকক্ষণ পরেও তারা খেলা নিয়ে মত্ত রইল। যাত্রীদের বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে, এদের তাড়া নেই। এদের সঙ্গে মালামালও নেই। লঞ্চের কেবিন বয় বলল, আপনারা নামবেন না? তাদের একজন উদাস গলায় বলল, নামতেও পারি, আবার নাও নামতে পারি।

তেমন কোনো হাসির কথা না। কিন্তু সবাই হাসছে।

কেবিন বয় বলল, যাবেন কই?

যাব দোজখে।

আবার হাসির শব্দ। এবারের হাসি আরো উচ্চকিত। তবে তার মধ্যে আনন্দ নেই।

ছয়জনের এই দলটি ভাড়া করে এনেছেন ধনু শেখ। এরা দাঙ্গাহাঙ্গামায় অত্যন্ত দক্ষ। তাদের সঙ্গে ধনু শেখের একটাই কথা— মালাউন কমায়ে চলে যাবে। লুটের মাল সবই তোমাদের। স্থানীয় সাহায্য যা করার তিনি করবেন। শোনা যাচ্ছে কোন জায়গা পাকিস্তানে পড়বে তা ঠিক হবে মুসলমানের সংখ্যা দিয়ে। ভোটাভুটি হবার সম্ভাবনা। বান্ধবপুরকে অবশ্যই পাকিস্তানে ঢুকাতে হবে। যে-কোনো ভালো কাজের সঙ্গে সামান্য মন্দ কাজ করতে হয়। স্বাধীন পাকিস্তান বিরাট ভালো কাজ। তার জন্যে কিছু রক্তপাত হতেই পারে। স্বাভাবিকভাবে একটা শিশুর জন্ম দিতে গিয়েও মায়েদের প্রচুর রক্ত দেখতে হয়। সেখানে নতুন দেশের জন্ম হচ্ছে। সহজ কথা তো না।

ধনু শেখ খবর দিয়ে শ্রীনাথকে এনেছেন। মূল্য উদ্দেশ্য গল্পগুজব করা। মানুষ হয়ে জন্মানোর এই এক সমস্যা। গল্প করার সঙ্গী লাগে। ধনু শেখের প্রায়ই মনে হয়, গরু হয়ে জন্মালে ভালো ছিল। ঘাস খেয়ে জীবনটা পার করে দিতে পারতেন। চিন্তা নাই, ভাবনা নাই। জগতের একমাত্র বিষয় সবুজ ঘাস। সকাল

থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘাস খাওয়া। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সেই ঘাস জাবর কাটা। জাবর কাটার সময় মশা বিরক্ত করলে লেজের বাড়ি দিয়ে মশা মারা।

শ্রীনাথ, আছ কেমন ?

আজ্ঞে ভালো আছি।

চারদিকে দাঙ্গা লেগে গেছে, শুনেছ বোধহয় ?

শুনেছি।

বান্ধবপুরে দাঙ্গা নাই, কিছু নাই, ব্যাপারটা কী বলো দেখি ?

শ্রীনাথ বলল, আপনার মতো বিশিষ্টজনরা থাকতে দাঙ্গা কেন হবে ?

ধনু শেখ বললেন, আমি বিশিষ্টজন তোমারে কে বলল ? আমি অবশিষ্টজন। দুই ঠ্যাং-এর মধ্যে একটা চলে গেছে, একটা আছে অবশিষ্ট। এখন বলো আমি অবশিষ্টজন না ?

শ্রীনাথ চুপ করে রইল। ধনু শেখ তাকে কী জন্যে ডাকিয়েছেন সে বুঝতে পারছে না। এই লোক বিনা উদ্দেশ্যে কিছু করবে না।

ধনু শেখ বললেন, শুনলাম তোমরা দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি করেছ। নমশুদ্র, চামার, ঢুলি সব দলে টেনেছ। রামদা সড়কির ব্যবস্থা করেছ। মুসলমান মারা শুরু করবা কবে ? পঞ্জিকা দেখে একটা শুভদিন বের কর। অশুভ দিনে মারামারি শুরু করলা, দেখা গেল ফল হয়েছে খারাপ। নিজেরাই শেষ।

শ্রীনাথ বলল, অনুমতি দেন যাই। আমার শরীরটা ভালো না।

শরীর তো আমারও ভালো না। পচন ধরেছে। শশাংক পালের শরীর যেমন পচে গিয়েছিল আমারও যাচ্ছে। আবার শুনলাম লাবুসের শরীরেও পচন ধরেছে। ভালো কথা মনে পড়েছে। শশাংক পালের ভূতের গল্পটা পুরা শুনা হয় নাই।

'আমি উঠলাম' বলে শ্রীনাথ উঠতে যাওয়ার আগেই ধনু শেখের লোকজন চলে এলো। ধনু শেখ বললেন, তোমরা চলে এসেছ ভালো করেছ। এর নাম শ্রীনাথ। আমার নিজের লোক। কাজকর্ম যা করবা এরে সাথে নিয়া করবা। সে প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ি চিনে। কোন কোন বাড়িতে ডবকা যুবতী আছে তাও জানে। কলিকাতার দাঙ্গায় বহুত মুসলমান মেয়ের সর্বনাশ হয়েছে— শোধ নেয়ার প্রয়োজন আছে।

শ্রীনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। শুধু এইটুকু বুঝছে তার মহাবিপদ।

মুখে বসন্তের দাগওয়ালা একজন গলা নামিয়ে বলল, কাজ কি আজ রাতেই শুরু হবে ?

ধনু শেখ বললেন, আরে না। বিশ্রাম কর। খাওয়াদাওয়া কর। অবস্থা বিবেচনা কর। তবে শ্রীনাথ যেন পালায়া না যায়। তাকে প্রয়োজন আছে।

এরা শ্রীনাথকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাচ্ছে লঞ্চঘাটের দিকে। তারা হাঁটছে দ্রুত। শ্রীনাথ তাদের সঙ্গে তাল মিলাতে পারছে না। শ্রীনাথ বলল, আমাকে কোথায় নিয়ে যান?

বসন্তের দাগওয়ালা লোকটি বলল, শ্বশুরবাড়ি নিয়া যাই। তোমার শ্বশুর সাব কী করব জানো? তোমার বিচি ফালায়া তোমারে খাসি করব।

দলের সবাই হো হো করে হেসে উঠল। তাদের মনে চাপা আনন্দ।

মনিশংকর লাবুসকে দেখতে এসেছেন। তিনি রোজই আসেন। অনেকক্ষণ বসে থাকেন। তাঁকে পুরাপুরি বিভ্রান্ত মনে হয়।

পুকুরঘাটে শীতলপাটি বিছানো। শীতলপাটির ওপর কলাপাতা। লাবুস কলাপাতার ওপর শুয়ে থাকে। তাকে সারাক্ষণ পাখা দিয়ে বাতাস করে হাদিস উদ্দিন। মাওলানা ইদরিস তাঁর মেয়েকে নিয়ে পাশেই থাকেন। তিনি নফল রোজা রাখছেন। এবং মনে মনে কোরান খতম দিচ্ছেন।

লাবুস বেশির ভাগ সময় থাকে ঘোরের মধ্যে। তখন অদ্ভুত অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখে। অপরিচিত নানানজনের সঙ্গে কথা বলে। যেসব ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেছে হুবহু সেই ঘটনাও ঘটতে দেখে। একদিন দেখল পুকুরঘাটে বসে বিভূতি বাবু মুগ্ধ গলায় নিজের বই পড়ে শুনাচ্ছেন। লাবুস এবং হাদিস উদ্দিন পাঠ শুনছে। কী পড়া হচ্ছে তাও লাবুসের মনে আসে। একটি শব্দও এদিক ওদিক হয় না।

> কুড়ুলে বিনোদপুরের বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী রায় সাহেব ভরসারাম কুণ্ডুর একমাত্র কন্যার আজ বিবাহ। বরপক্ষের নিবাস কলকাতা, আজই বেলা তিনটার সময় মোটরে ও রিজার্ভ বাসে কলকাতা থেকে বর ও বরযাত্রীরা এসেছে। অমন ফুল দিয়ে সাজানো মোটরগাড়ি এদেশের লোক কখনো দেখে নি।

একদিন সে তার মা জুলেখাকে দেখল। দোতলা পাকাদালানের একটা বড় ঘরে জুলেখা সতরঞ্চির ওপর বসে। তাঁর সামনে হারমোনিয়াম। একপাশে রূপার পানদানিতে পান। ঘরের এক কোনায় জুলেখার কাছ থেকে বেশ দূরে তবলা এবং তানপুরা নিয়ে একজন বসেছে। একজন বংশীবাদক আছে, সে বসেছে জুলেখার

পাশে। জুলেখা গান করছে এবং বৃদ্ধ এক শেরওয়ানি পরা মানুষ গান শুনছেন। গানের কথা—

কেবা কার পর, কে কার আপন,
কালশয্যা পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে
দেখি পরস্পরে অসার আশার স্বপন।

হঠাৎ গান থেমে যায়। হৈচৈ-এর শব্দ শোনা যায়। একদল মানুষ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। ভাঙচুরের শব্দ। আর্তনাদ। কালো ধোঁয়া। লাবুসের সামনে সব অস্পষ্ট হয়ে যায়।

লাবুস প্রায়ই বাচ্চা একটা মেয়েকে তার চারপাশে ঘুরতে দেখে। মেয়েটার মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল। গোল মুখ। চোখ বড় বড়। মেয়েটা সব সময় খেলছে। কখনো তার হাতে সুতা, কখনো কাপড়ের টুকরা। লাবুস তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। মেয়েটা খেলায় এতই মগ্ন থাকে যে বেশির ভাগ সময়ই লাবুসের প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

নাম কী গো তোমার?

ভুলে গেছি।

মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়। তার নাম ভুলে না।

আমি ভুলে গেছি।

তুমি এই বাড়িতে থাক?

হুঁ। মাটির নিচে গুপ্তঘরে থাকি।

কতদিন ধরে থাক?

অনেক দিন। অনেক অনেক দিন। কতদিন ভুলে গেছি। আমি সব ভুলে গেছি।

তোমার বাবা মা, এদের কথা মনে আছে?

ভুলে গেছি। আমি আর কথা বলব না।

মেয়েটা উঠে চলে যায়। আবারো আসে। লাবুসের আশেপাশেই বসে খেলায় মগ্ন হয়ে যায়।

মনিশংকর বললেন, আজ শরীরটা কেমন বোধ হচ্ছে?

লাবুস বলল, ভালো।

মনিশংকর হতাশ গলায় বললেন, এই কি ভালোর নমুনা? তুমি তো মরতে বসেছ। চলো তোমাকে কলকাতা নিয়ে যাই। বড় বড় ডাক্তাররা তোমাকে দেখুক। দেখে বলুক কী হয়েছে।

লাবুস বলল, আমার কী হয়েছে আমি জানি। কেউ তা বিশ্বাস করবে না। জগৎ বড়ই বিচিত্র।

জগৎ বিচিত্র হোক, যাই হোক, তোমার দরকার চিকিৎসা।

আমার সময় হয়ে গেছে। চিকিৎসায় কিছু হবে না।

তোমার সময় হয়ে গেছে, তুমি বুঝে ফেললা ? তুমি কি ভগবান ? আমি তোমাকে এইভাবে মরতে দেব না।

লাবুস বলল, আমি কাউকে যে কথা কোনোদিন বলি নাই আপনাকে বলতে চাই। মাওলানা সাহেবকে আর হাদিস উদ্দিনকে দূরে যেতে বলেন।

আমাকে বলতে চাও কেন ?

আপনি বিশ্বাসী মানুষ। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন।

মাওলানা এবং হাদিস উদ্দিন উঠে গেল। হাদিস উদ্দিনের খুব শখ ছিল ছোটকর্তার কথাগুলি শোনে। সে ছোটকর্তার বিষয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানে, কাউকে তা বলতে পারছে না। এখন সময় হয়েছে বলার।

লাবুস বলল, আমি চোখের সামনে অনেক কিছু দেখি। ছোটবেলা থেকে দেখতাম। তখন ভাবতাম সবাই আমার মতো দেখে। অনেক পরে জানলাম, সবাই আমার মতো দেখে না।

কী দেখ ?

ভবিষ্যতের ঘটনা দেখি। আমার মা যে আমাদের ছেড়ে খারাপ জায়গায় চলে যাবে— এটা অনেক ছোটবেলায় দেখেছি। আমি মৃত মানুষজনদের দেখি। তাদের কেউ কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে।

কী কথা বলে ?

অনেক কথা। বেশির ভাগ কথার অর্থ আমি বুঝি না। তখন আমার খুব কষ্ট হয়।

লাবুস হাঁপাতে লাগল। মনিশংকর বললেন, এখন আর কথা বলার প্রয়োজন নাই। বিশ্রাম কর।

আপনাকে অতি জরুরি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম। আমি স্পষ্ট দেখেছি, বান্ধবপুর জায়গাটা হিন্দুস্থানের মধ্যে পড়েছে। এখানের বহু মুসলমান মারা যাবে। তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

মনিশংকর বললেন, জ্বরে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে। জ্বরের সময় বিকার উপস্থিত হয়। বিকারের ঘোরে মানুষ অনেক কিছু দেখে। তোমার জ্বর কমুক। শরীর স্বাভাবিক হোক। তখন তোমার কথা শুনব।

লাবুস বলল, আমার শরীর এখন জ্বলে যাচ্ছে। হাদিস উদ্দিনকে বলেন যেন শরীরে পানি ঢালে।

মনিশংকর নিজেই আজলা ভরে পানি লাবুসের শরীরে ঢালতে লাগলেন। লাবুস বিড়বিড় করে বলল, বান্ধবপুরের মহাবিপদ। অনেক মানুষ মারা যাবে। অনেক মানুষ মারা যাবে।

মনিশংকর বললেন, বাবা শান্ত হও।

মসজিদের নতুন ইমাম নিয়ামত হোসেন প্রবহমান পানিতে অজু করেন। বদ্ধপানিতে অজু করার চেয়ে প্রবহমান পানিতে অজুর সোয়াব বেশি। তিনি ঘাটে বসে অজু শেষ করে উঠতে যাবেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। ভাসতে ভাসতে কী যেন এগিয়ে আসছে। ফজরের ওয়াক্ত। আকাশ এখনো অন্ধকার। পরিষ্কার কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু নদীর পানি চকচক করছে। নিয়ামত হোসেন ভাসমান বস্তুটির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন। একসময় তিনি বিড়বিড় করে বললেন, গাফুরুর রহিম, এটা কী?

নদীর পানিতে চিৎ হয়ে ভাসছে শ্রীনাথ। নিয়ামত হোসেন কাউকে কিছু না বলে মসজিদে গেলেন। টিউবকলের পানিতে আবার অজু করলেন। ফজরের নামাজ আদায় করলেন। মসজিদে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় নামাজি কেউ নেই। ফজরের নামাজে কখনোই লোক হয় না। নামাজ শেষ করে তিনি ধনু শেখের বাড়িতে গেলেন। ঘুমন্ত ধনু শেখের ঘুম ভাঙালেন। নদীতে কী দেখে এসেছেন বললেন। বর্ণনার সময় নিয়ামত হোসেনের গলা কাঁপতে লাগল।

ধনু শেখ বললেন, এটা বলার জন্যে তুমি আমার ঘুম ভাঙায়েছ? শ্রীনাথের মৃত্যুর খবর ঘুম ভাঙায়ে আমাকে দিবার কী আছে? শ্রীনাথ কি আমার ভায়রা ভাই? মরছে গেছে ফুরাইছে। সবাই মারা যাবে। আমিও যাব তুমিও যাবে।

নিয়ামত হোসেন বললেন, কালরাতে শ্রীনাথ বাবুকে আমি দেখেছি।

কোথায় দেখেছ?

এশার নামাজ পড়ে ফিরতেছি, হঠাৎ দেখি হাত ধরে তাকে টেনে লঞ্চে নিয়ে তুলতেছে। আপনার লোকজন তুলতেছে।

আমার লোকজনটা কে?

লঞ্চে করে এরা এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করেছে।

ধনু শেখ বললেন, তুমি কি বলতে চাও আমি শ্রীনাথকে খুন করায়েছি?

নিয়ামত হোসেন বললেন, জি-না।

ধনু শেখ বললেন, তাহলে আমাকে এই ঘটনা বলার মানে কী?

গোস্তাকি হয়েছে।

নিয়ামত শোন, বেশি বেশি বুঝার চেষ্টা নিবা না এবং বেশি বেশি দেখবা না। কম দেখা ভালো। কম বুঝাও ভালো।

জি আচ্ছা।

হিন্দুরা সব মুসলমান মেরে শেষ করে ফেলতেছে, এইটা জানো?

জানি না।

দাঙ্গার খবর পড় নাই? কলিকাতায় কী হয়েছে? বিহারে কী হয়েছে? মুসলমান সব শেষ। আর এদিকে পা পিছলায়ে পানিতে পড়ে মালাউন একটা মারা গেছে, আর তুমি হয়ে গেছ বেচাইন। বুরবাক কোথাকার। যাও সামনে থেকে। একটা কথা মনে রাখবা, তুমি কিছুই দেখ নাই। বুঝেছ?

জি।

আগামীকাল জুম্মাবার না?

জি।

জুম্মার নামাজের পরে তুমি সুন্দর কইরা ওয়াজ করবা। তুমি বলবা সব মুসলমানের দায়িত্ব নিজেদের রক্ষা করা। পরিবার রক্ষা করা এবং পাকিস্তান হাসেলের জন্য কাজ করা। বলতে পারবা?

পারব।

তার জন্যে প্রয়োজনে রক্তপাত করতে হবে। শহীদ হতে হবে। বলতে পারবা না?

পারব।

মিনমিন কর বলতেছ কেন? জোর গলায় বলো। গলায় জোর নাই? তুমি কি মেন্দামারা মুসলমান? শরীর তো বানায়েছ মহিষের মতো। অনেক কথা বলে ফেলেছি, এখন সামনে থেকে যাও। তুমি আমার সকালের ঘুম নষ্ট করেছ। বুরবাক কোথাকার।

নিয়ামত হোসেন ঘর থেকে বের হলেন। এখন তার লঞ্চের টিকেট ঘরে যাবার কথা, তা না করে তিনি মসজিদে গেলেন। দু'রাকাত নফল নামাজ পড়লেন। কিছুক্ষণ কোরান পাঠের চেষ্টা করলেন। মন বসল না। তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে টিকেট ঘরে গেলেন।

টিকেট ঘর থেকে দেখা যায় অনেক লোকজন নদীর পাড়ে ভিড় করেছে। শ্রীনাথকে ডাঙ্গায় তোলা হচ্ছে। বল হরি, হরি বল ধ্বনি উঠছে। নিয়ামত হোসেন আবার টিকেট ঘর থেকে বের হলেন। তিনি গেলেন মনিশংকরের কাছে। মাথা নিচু করে ফিসফিস করে কথা বললেন। তাঁর বেশির ভাগ কথাই অস্পষ্ট।

মনিশংকর বললেন, কাল জুম্মার নামাজের পরে দাঙ্গা শুরু হবে। কী বলেন আপনি ?

নিয়ামত হোসেন বললেন, এই জন্যে বাইরে থেকে লোক আসছে।

লোক কে এনেছে ? ধনু শেখ ?

নিয়ামত হোসেন জবাব দিলেন না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর বড়ই ভয় লাগছে।

আজ জুম্মাবার।

ধনু শেখ আগে জুম্মার নামাজে আসতেন। ঠ্যাং কাটা যাবার পর আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। বসে বসে নামাজ পড়ার মানে হয় না। সবাই যেন করে তাকায়। তবে আজ তিনি জুম্মার নামাজে এসেছেন। তাঁর লোকজন কেউ আসে নি। তারা লঞ্চে অপেক্ষা করছে। তাদেরকে বলা হয়েছে জুম্মার নামাজ শেষ হবার পর তিনি যখন বাড়ি ফিরবেন তখন আসল কাজ শুরু হবে।

আজ জুম্মার নামাজে ভালো জমায়েত হয়েছে। অনেক অপরিচিত মানুষও দেখা যাচ্ছে। মাওলানা ইদরিস এসেছেন। তিনি ইমাম নিয়ামত হোসেনের পাশেই বসেছেন।

নামাজ শেষে খুতবা পাঠের পর ইমাম নিয়ামত হোসেন বললেন, হাফেজ মাওলানা ইদরিস আপনাদের কিছু বলবেন।

মাওলানা ইদরিস উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, চারদিকে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর আসতেছে। এই বিষয়ে সামান্য কিছু বলব। আমার বেয়াদবি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্পাক সুরা হুজুরাত-এর তের নম্বর আয়াতে বলেছেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে বড় সাবধানী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।" এর বেশি আমার আর কিছুই বলার নাই। মূল আয়াতটা আমি আপনাদের আরবিতে পাঠ করে শুনাব। তার আগে ছোট্ট একটা ঘোষণা আছে— আপনারা জানেন লাবুস খুবই অসুস্থ। তার জন্যে আমি দরুদে শেফা পাঠ শুরু করেছি। যেন আল্লাহ্পাক তার রোগযন্ত্রণার অবসান করেন। আপনারা তার জন্যে দোয়ায় সামিল হবেন। লাবুস তার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি দান করেছে। দানপত্রে আজই বাদ জুম্মা সে দস্তখত করবে। আপনারা সবাই সাক্ষী। তার দানপত্র মতে এই অঞ্চলের মানুষের কল্যাণে

তার সবকিছু ব্যয় হবে। স্কুল, কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয়। আপনারা সবাই বলেন, মারহাবা। অন্তর থেকে বলেন।

সবাই মারহাবা বলল। ধনু শেখও বললেন।

এরপর দোয়া পাঠ হলো এবং ইমাম নিয়ামত হোসেন আল্লাহপাকের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন বান্ধবপুরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা না হয়।

ধনু শেখ বাড়ি ফিরছেন। হিসাবমতো তাঁর লোকজনের কর্মকাণ্ড শুরু হবার কথা। তা হচ্ছে না, কারণ লঞ্চঘাটে নমশুদ্রদের একটা বিশাল দল লাঠি, সড়কি, রামদা নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের সঙ্গে আছেন মনিশংকর। তাঁর নির্দেশে এমএল আড়িয়াল খাঁ লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে। লঞ্চের কেবিনে ধনু শেখের লোকজন বসা। তারা হতভম্ব।

মনিশংকর ধনু শেখের বাড়িতে এসেছেন। ঘরে ঢুকেছেন একা। তাঁর লোকজন সব বাইরে।

ধনু শেখ বললেন, আমার কাছে কী চান?

মনিশংকর বললেন, কিছু চাই না। খবর কি জানেন?

কী খবর?

দেশ ভাগাভাগির সব ঠিকঠাক হয়েছে। সীমানা নির্ধারণ হয়েছে। বান্ধবপুরে বড়গাঙ বরাবর সীমানা। আপনি পড়েছেন হিন্দুস্থানে।

ধনু শেখ তাকিয়ে আছেন।

আমার বাড়িতে ব্যাটারিতে রেডিও বাজে। খবর শুনে আপনাকে বললাম। যাই, নমস্কার।

হিন্দু বাড়িতে শাঁখ বাজছে। ঘণ্টা বাজছে। বড়ই আনন্দময় সময়।

রাত অনেক। আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠেছে।

ফকফকা জোছনা।

লাবুস পুকুরপাড়ে পাটির ওপর শুয়ে আছে। সে একা, আর কেউ নেই। সবাইকে সে কিছুক্ষণ আগে সরিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে একা থাকতে ইচ্ছা করে। আজ যেমন করছে। লাবুসের শরীর খুবই খারাপ করেছে। জ্বলুনি অনেক বেড়েছে। তারপরেও জোছনা দেখতে ভালো লাগছে। এই সুন্দর চাঁদের আলো সে আর বেশিদিন দেখবে না। নিস্তব্ধ রাতে ঝিঁঝিপোকার ডাক শুনবে না। হঠাৎ লেবু ফুলের ঘ্রাণে শরীর মন অবশ হবে না। ভাবতেই কী অদ্ভুত লাগে। দীর্ঘদিন পর হঠাৎ আজ তার মা'কে দেখতে ইচ্ছা হলো।

বাবা জহির!

লাবুস চমকে তাকালো। এটা কি কোনো ভ্রান্তি? মন চাইছে বলে সে মায়ের গলা শুনতে পাচ্ছে? সারা শরীর চাদরে ঢাকা একজন মহিলা পুসকুনির সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ নামলেন।

বাবা, তোমার কী হয়েছে?

লাবুস জবাব দিল না। মহিলা বললেন, বাবা, তোমার কপালে একটু হাত রাখব?

লাবুস বলল, রাখ।

জুলেখা লাবুসের কপাল স্পর্শ করে ফুঁপিয়ে উঠল। বাবাগো, তোমার কী হয়েছে? আমার বাবার সোনার অঙ্গ কীভাবে জ্বলে গেছে?

লাবুস বলল, মা, যন্ত্রণায় অনেকদিন ঘুমাতে পারি না। একটু ঘুম পাড়ায়ে দাও।

ছোটবেলায় গুনগুন করতে করতে জুলেখা দুষ্ট জহিরকে ঘুম পাড়াত। আশ্চর্য, একটা সুরও মনে আসছে না।

মীরা বারান্দায় এসেছিল। সে পুকুরঘাটের দিকে তাকাল এবং দৌড়ে ঘাটের কাছে এসে দাঁড়াল। রিনরিনে গলায় বলল, তুমি কে?

জুলেখা তাকাল।

ছোট মীরা বলল, তুমি কি আমার আর লাবুসের মা?

জুলেখা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। তাঁর মাথায় সুর এসেছে— আমার দুষ্ট ঘুমায়রে। আমার ন্যাওলা ঘুমায়রে। আমার ভুটু ঘুমায়রে।

মওলানা ইদরিস ঘর থেকে বের হয়েছেন, হাদিস উদ্দিন বের হয়েছে।

পুকুরঘাট থেকে যে সুরধ্বনি বের হয়ে আসছে তার জন্ম এই পৃথিবীতে নয়, অন্য কোনোখানে।

[দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত]

বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত পঁয়ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। *আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, শ্যামল ছায়া, নয় নম্বর বিপদ সংকেত...* ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। তাঁর বেশ কটি উপন্যাস ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। একটি উপন্যাস 'গৌরীপুর জংশন' সাতটি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে এই উপন্যাসের ইংরেজি, জার্মান, হিন্দি ও ফার্সি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দনকানন 'নুহাশ পল্লী'তে।